বারাকপুরের
সেকাল একাল

প্রথম খণ্ড

সম্পাদনা : কানাইপদ রায়

বহুমুখী পাট কৃষি গবেষণার আরম্ভ

সুপারিশ অনুযায়ী আর এস ফিনলোর নেতৃত্বে বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের অধীনে, পাটের উন্নতির জন্য গবেষণা শুরু হলো ১৯০৪ সাল থেকে; তিনিই হলেন প্রথম ফাইবার একসপার্ট। ফিনলোর সহকর্মীদের মধ্যে বিশিষ্ট নাম রায়সাহেব এন সি বসু, আই এইচ বার্কিল, টি এন রায়, অমৃতলাল মুখার্জি, জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন, কে সি ব্যানার্জি ও এফ জে এফ শ'। তাঁদের গবেষণার ফলে ১৯১৫ সালে (মতভেদে ১৯১৬) প্রথম উন্নত প্রজাতির তোষাপাট 'চিনসুরা গ্রীণ' বা সি জি প্রতিষ্ঠিত হলো। চার বছরের মধ্যেই ১৯১৯ সালে 'ডি ১৫৪' নামে হোয়াইট বা গুটি পাটের প্রথম উন্নত প্রজাতি আত্মপ্রকাশ করলো।

ফিনলোর অবসর নেবার পর প্রধানতঃ এন সি বসুর নেতৃত্বে বহুমুখী ও ফলপ্রসূ গবেষণা অব্যাহত ছিল ১৯৩৯ পর্যন্ত। উন্নীত প্রজাতি দু'টিকে কৃষকের ঘরে পৌঁছে দেবার কৃতিত্ব ছিল তাঁরই। তাঁরই অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইলাবন্ত ব্যানার্জি পাটগাছের ক্রোমোসোম সংখ্যা নির্ণয় করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন; সেটা ১৯৩২ সালের কথা।

কৃষি গবেষণার দ্বিতীয় পর্যায়

বিলেত থেকে ১৯২৮ সালে এলেন 'রয়াল কমিশন'। ভারতের কৃষির সার্বিক উন্নতি কোন পথে হরেকমিশনের বিচার্য বিষয় ছিল তারই পথনির্দেশ করা। অন্যান্য বিচার্য বিষয় ছাড়া অর্থকরী ফসল পাটের উন্নতির জন্য উক্ত কমিশন সুপারিশ করলেন একটি শক্তিশালী স্থায়ী 'ইন্ডিয়ান সেনটেরাল জুট কমিটি' গঠন করতে হবে এবং ঐ কমিটি কৃষি, টেকনলজি ও মার্কেটিং সম্পর্কে গবেষণার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হবে। যা হয়ে থাকে তাই হলো; কমিটির সুপারিশ ধামাচাপা হয়ে রইল। ১৯৩৫ সালে ভাইসরয় হয়ে এলেন লর্ড



প্রথম প্রকাশ :
১৫ অগস্ট, ১৯৯৯

কানাইপদ রায় কর্তৃক প্রকাশিত
সম্পাদক 'নগর পেরিয়ে', ঘটকপাড়া
পোঃ- বারাকপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা

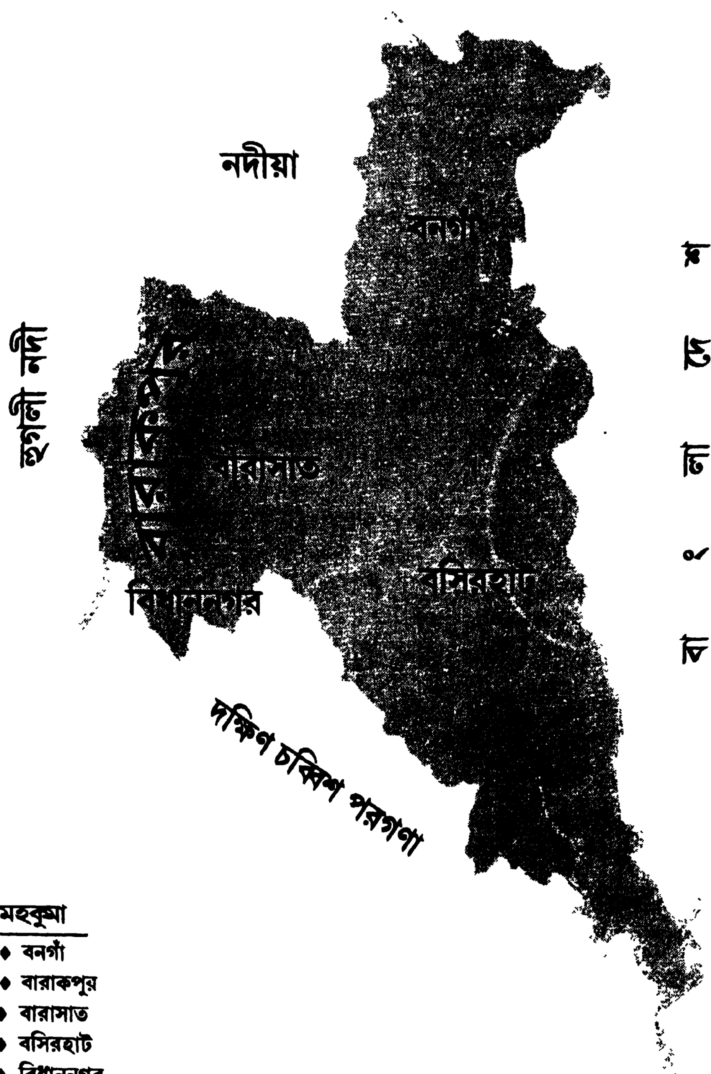
প্রচ্ছদ চিত্র : বারাকপুর রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয

প্রচ্ছদ চিত্রশিল্পী : রঘুনন্দন দে

ডিটিপি কম্পোজ ও মুদ্রণ
লেজারপ্লাস, ২০ নোনাডাঙ্গা রোড, শেওড়াফুলি, হুগলী
দূরভাষ : ৬৩২-৫১৭৯

প্রাপ্তিস্থান . দে বুক স্টোর্স
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট্, কলকাতা-৭০০০৭৩

বি ষ য় সূ চি



জেলা উত্তর ২৪পরগণা

"যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত হয়ে বও।
ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত, কথা কও, কথা কও।।"



সম্পাদকের কলমে

অতীত কথা বলবে বর্তমানের কাছে বসে। আর সে কথা যদি হয় বারাকপুরের—সেই লাটসাহেবের বাগান; বিখ্যাত ঘোড়দৌড়; ঘোড়ায় টানা বাস; চিড়িয়াখানা—তাহলে তো মনের মধ্যে একটা আগ্রহ পল্লবিত হবেই। **বারাকপুর মহকুমার** অতীত আর বর্তমানের কথা শোনাবার ভাবনা থেকেই 'নগর পেরিয়ে' নামে ছোট কাগজের উদ্যোগে **'বারাকপুরের সেকাল একাল'** গ্রন্থ প্রকাশের তাগিদ।

আজ থেকে পাঁচশো বছরের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত পিছনের দিকে এগোতে পেরেছি বারাকপুরের অতীত সন্ধানে। এই সময়কালের মধ্যে বারাকপুরের মাটিতে ঘটে গেছে কত না উত্থান পতন। ইংরেজ দেখিয়েছে ভারী বুটের আস্ফালন। সহ্য করেনি সে আস্ফালন একজন—মঙ্গলপাণ্ডে। মঙ্গলপাণ্ডের অসি আর রাষ্ট্রগুরুর মসি বারাকপুরের চারিত্র্যলক্ষণে যুক্ত করেছে এক ভিন্নমাত্রা। ছিন্নমূল কত না মানুষকে আশ্রয় করে দিয়েছে বারাকপুর। দু'বাংলার মানুষকে নিয়ে গড়ে উঠেছে এক মিশ্র সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতির অংশীদার ভিন প্রদেশের মানুষেরাও।

হুগলীর তীর ধরে গড়ে উঠেছে অসংখ্য কলকারখানা। সেই সব কলকারখানায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা

শ্রমিকের পীঠস্থান। এখান থেকেই ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম শ্রমিকদের জন্য পত্রিকা 'শ্রমজীবী' প্রকাশ পায়। অসংখ্য ব্যক্তিত্ব আর পত্র পত্রিকায় সমৃদ্ধ এ অঞ্চল। তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে শুনেছি কত না কথা, কাহিনী আর কিংবদন্তী। কালপ্রবাহে আরো কত কথা হারিয়ে গেছে কে জানে! সে সব যদি ধরে রাখা যেত, গড়ে উঠত এ অঞ্চলের এক ভিন্ন ইতিহাস। 'নগর পেরিয়ে' পত্রিকার উদ্যোগে তথ্য, পরিসংখ্যান, মননশীল প্রবন্ধ, পুরোনো বাসিন্দাদের স্মৃতিকথা, পুরোনো দলিল ও মানচিত্র এসবের সাহায্যে বারাকপুরের সেকাল একালের সন্ধান চলছে নিষ্ঠার সঙ্গে।

বৈশিষ্ট্য

- বারাকপুর থেকে উদ্যোগী হয়ে এ ধরনের গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ঘটল।
- বারাকপুরের কথা সামগ্রিকভাবে তুলে ধরার পাশাপাশি এখানকার উল্লেখযোগ্য জনপদগুলির মধ্য একটিকে নির্বাচন করে বিশেষভাবে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই খণ্ডের বিশেষ জনপদ হল—মণিরামপুর। প্রতিটি খণ্ডেই একটি/একাধিক প্রাচীন জনপদকে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হবে। সে কারণে গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ছবিগুলিতে মণিরামপুর অঞ্চল প্রাধান্য পেয়েছে।
- এ অঞ্চলে জনশ্রুতি আছে মহাপ্রভু নিমাই'র নাম থেকে 'নিমাইতীর্থ ঘাট' নামকরণ হয়েছে। তথ্য দিয়ে বিচার করে দেখা হয়েছে সেই জনশ্রুতির বাস্তব ভিত্তি।
- এই গ্রন্থে সমাজতাত্ত্বিক ও সমাজ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আর সমাজ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিছু ঘটনার মূল্যায়ণ করা হয়েছে। এই সমাজ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিপূর্ণতা পাবে শেষ খণ্ডে।

বানান প্রসঙ্গে

সেনাদের ব্যারাক থেকে 'বারাকপুর' নামকরণ হয়নি, সেকারণে এই গ্রন্থে 'ব্যারাকপুর' বানান লেখা হয়েছে 'বারাকপুর'। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে রেফ-এর পর ব্যঞ্জনদ্বিত্ব (র্য্য) বর্জন করা হয়েছে। কিন্তু স্মরণিকা/অন্যভাবে সংগৃহীত লেখার ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও এই নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়ের সম্পাদক অধ্যাপক সুপ্রিয় মুন্সী একটি দুষ্প্রাপ্য ছবি

প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. দীপক সেনগুপ্ত মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ স্মারক সংগ্রহালয় থেকে একটি দলিলের অনুলিপি, রাষ্ট্রগুরুর ব্যবহৃত চেয়ারের ছবি প্রভৃতি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করার অনুমতি দিয়েছেন। সাহিত্যিক চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে ব্লোকের নকশাটি সংগৃহীত হয়েছে। কিছু পত্র-পত্রিকা, দৈনিক সংবাদপত্র, গ্রন্থ প্রকাশ ও তথ্য সংগ্রহের আবেদনকে প্রচারে এনেছেন। 'নগর পেরিয়ে' পত্রিকায় প্রথম থেকে লিখে আসছেন ড. শিখা দত্ত, শংকর আচার্য, নারায়ণচন্দ্র সাহা প্রমুখ। অরুণ দাস, নন্দদুলাল রায়চৌধুরী বিভিন্ন সময়ে পত্রিকার প্রচ্ছদ অলংকরণে সাহায্য করেছেন। পরবর্তীকালে নিয়মিতভাবে লিখছেন শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়, যিনি বিভিন্নভাবে গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্য করেছেন। সাহিত্যিক আনন্দপ্রসাদ রায় পত্রিকাকে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লেখা সংগ্রহ করা, প্রুফ্ দেখা, এসব ছাড়াও বিস্তর পরিশ্রম করে এই গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্য করেছেন। বিজ্ঞাপনদাতারাও সাহায্য করেছেন। লেজারপ্লাসের শ্যামসুন্দর বেরার তত্ত্বাবধানে, সুমন্ত গোস্বামী প্রমুখ সহকর্মীরা অক্ষর বিন্যাসে সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

আশা রাখি, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতায় নির্মিত এ গ্রন্থ অনুসন্ধিৎসু পাঠককে অনুরণিত করবে। পরিশেষে জানাই, যাঁদের লেখণীতে সমৃদ্ধ হল এই গ্রন্থ, যাবতীয় কৃতিত্ব তাঁদেরই।

বারাকপুর, ১৫ অগস্ট, ১৯৯৯

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বারাকপুরের সেকাল একাল প্রথম খণ্ডের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল এবং অবশ্যই অর্থকষ্ট সহ্য করে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যেভাবে গ্রন্থটিকে গবেষণাধর্মী সৃষ্টি আখ্যা দিয়ে পর্যালোচনা করেছে, তাতে দায়িত্বের মাত্রা যে বৃদ্ধি পেয়েছে তা বলাই বাহুল্য। এই সংস্করণে প্রথম সংস্করণের কিছু তথ্য সরিয়ে রাখা হয়েছে অন্য প্রাসঙ্গিক খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। যুক্ত হয়েছে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়। প্রচ্ছদ চিত্র পরিবর্তিত হয়েছে। প্রুফ্ দেখে সাহায্য করেছেন স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে। তথ্য সরবরাহ করার ক্ষেত্রে অনেকের উদাসীনতা পীড়া দিয়েছে। এই অল্প সময়ে গ্রন্থটি যে পাঠকের সমাদর লাভ করতে সমর্থ হয়েছে, সেজন্য কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

১০ নভেম্বর ২০০১

শ্রমিকের পীঠস্থান। এখান থেকেই ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম শ্রমিকদের জন্য পত্রিকা 'শ্রমজীবী' প্রকাশ পায়। অসংখ্য ব্যক্তিত্ব আর পত্র পত্রিকায় সমৃদ্ধ এ অঞ্চল। তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে শুনেছি কত না কথা, কাহিনী আর কিংবদন্তী। কালপ্রবাহে আরো কত কথা হারিয়ে গেছে কে জানে! সে সব যদি ধরে রাখা যেত, গড়ে উঠত এ অঞ্চলের এক ভিন্ন ইতিহাস। 'নগর পেরিয়ে' পত্রিকার উদ্যোগে তথ্য, পরিসংখ্যান, মননশীল প্রবন্ধ, পুরোনো বাসিন্দাদের স্মৃতিকথা, পুরোনো দলিল ও মানচিত্র এসবের সাহায্যে বারাকপুরের সেকাল একালের সন্ধান চলছে নিষ্ঠার সঙ্গে।

বৈশিষ্ট্য

- বারাকপুর থেকে উদ্যোগী হয়ে এ ধরনের গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ঘটল।
- বারাকপুরের কথা সামগ্রিকভাবে তুলে ধরার পাশাপাশি এখানকার উল্লেখযোগ্য জনপদগুলির মধ্য একটিকে নির্বাচন করে বিশেষভাবে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই খণ্ডের বিশেষ জনপদ হল—মণিরামপুর। প্রতিটি খণ্ডেই একটি/একাধিক প্রাচীন জনপদকে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হবে। সে কারণে গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ছবিগুলিতে মণিরামপুর অঞ্চল প্রাধান্য পেয়েছে।
- এ অঞ্চলে জনশ্রুতি আছে মহাপ্রভু নিমাই'র নাম থেকে 'নিমাইতীর্থ ঘাট' নামকরণ হয়েছে। তথ্য দিয়ে বিচার করে দেখা হয়েছে সেই জনশ্রুতির বাস্তব ভিত্তি।
- এই গ্রন্থে সমাজতাত্ত্বিক ও সমাজ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আর সমাজ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিছু ঘটনার মূল্যায়ণ করা হয়েছে। এই সমাজ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিপূর্ণতা পাবে শেষ খণ্ডে।

বানান প্রসঙ্গে

সেনাদের ব্যারাক থেকে 'বারাকপুর' নামকরণ হয়নি, সেকারণে এই গ্রন্থে 'ব্যারাকপুর' বানান লেখা হয়েছে 'বারাকপুর'। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে রেফ-এর পর ব্যঞ্জনদ্বিত্ব (র্য্য) বর্জন করা হয়েছে। কিন্তু স্মরণিকা/অন্যভাবে সংগৃহীত লেখার ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও এই নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়ের সম্পাদক অধ্যাপক সুপ্রিয় মুন্সী একটি দুষ্প্রাপ্য ছবি

প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. দীপক সেনগুপ্ত মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ স্মারক সংগ্রহালয় থেকে একটি দলিলের অনুলিপি, রাষ্ট্রগুরুর ব্যবহৃত চেয়ারের ছবি প্রভৃতি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করার অনুমতি দিয়েছেন। সাহিত্যিক চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে ব্লোকের নকশাটি সংগৃহীত হয়েছে। কিছু পত্র-পত্রিকা, দৈনিক সংবাদপত্র, গ্রন্থ প্রকাশ ও তথ্য সংগ্রহের আবেদনকে প্রচারে এনেছেন। 'নগর পেরিয়ে' পত্রিকায় প্রথম থেকে লিখে আসছেন ড. শিখা দত্ত, শংকর আচার্য, নারায়ণচন্দ্র সাহা প্রমুখ। অরুণ দাস, নন্দদুলাল রায়চৌধুরী বিভিন্ন সময়ে পত্রিকার প্রচ্ছদ অলংকরণে সাহায্য করেছেন। পরবর্তীকালে নিয়মিতভাবে লিখছেন শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়, যিনি বিভিন্নভাবে গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্য করেছেন। সাহিত্যিক আনন্দপ্রসাদ রায় পত্রিকাকে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লেখা সংগ্রহ করা, প্রুফ্ দেখা, এসব ছাড়াও বিস্তর পরিশ্রম করে এই গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্য করেছেন। বিজ্ঞাপনদাতারাও সাহায্য করেছেন। লেজারপ্লাসের শ্যামসুন্দর বেরার তত্ত্বাবধানে, সুমন্ত গোস্বামী প্রমুখ সহকর্মীরা অক্ষর বিন্যাসে সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

আশা রাখি, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতায় নির্মিত এ গ্রন্থ অনুসন্ধিৎসু পাঠককে অনুরণিত করবে। পরিশেষে জানাই, যাঁদের লেখণীতে সমৃদ্ধ হল এই গ্রন্থ, যাবতীয় কৃতিত্ব তাঁদেরই।

বারাকপুর, ১৫ অগস্ট, ১৯৯৯

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বারাকপুরের সেকাল একাল প্রথম খণ্ডের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল এবং অবশ্যই অর্থকষ্ট সহ্য করে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যেভাবে গ্রন্থটিকে গবেষণাধর্মী সৃষ্টি আখ্যা দিয়ে পর্যালোচনা করেছে, তাতে দায়িত্বের মাত্রা যে বৃদ্ধি পেয়েছে তা বলাই বাহুল্য। এই সংস্করণে প্রথম সংস্করণের কিছু তথ্য সরিয়ে রাখা হয়েছে অন্য প্রাসঙ্গিক খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। যুক্ত হয়েছে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়। প্রচ্ছদ চিত্র পরিবর্তিত হয়েছে। প্রুফ্ দেখে সাহায্য করেছেন স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে। তথ্য সরবরাহ করার ক্ষেত্রে অনেকের উদাসীনতা পীড়া দিয়েছে। এই অল্প সময়ে গ্রন্থটি যে পাঠকের সমাদর লাভ করতে সমর্থ হয়েছে, সেজন্য কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

১০ নভেম্বর ২০০১



ভারতীয় জাদুঘরের ডিরেক্টর ড. শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী বারাকপুর গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়ে ১৫ অগস্ট ১৯৯৯ তারিখে 'বারাকপুরের সেকাল একাল' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করছেন। পাশে সম্পাদক অধ্যাপক কানাইপদ রায়।



প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র বারাকপুর গান্ধী সংগ্রহালয়ে ১০ ডিসেম্বর ২০০০ তারিখে কানাইপদ রায় সম্পাদিত 'বারাকপুরের সেকাল একাল' (২য় খণ্ড) আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করছেন। ছবি : অরুণ দাস



প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদা শংকর রায় তাঁর নিজ বাড়িতে কানাইপদ রায় লিখিত 'উত্তর চব্বিশ পরগণার সেকাল একাল' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থটি অনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করছেন ২১ জানুয়ারি ২০০১ তারিখে। ছবি রঘুনন্দন দে



'নগর পেরিয়ে' পত্রিকার আলোচনা সভায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য বিজ্ঞানী শ্রী মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী।



প্রথম অধ্যায়

বারাকপুরের উৎস সন্ধানে

—কানাই পদ রায়

■ জেলা ২৪ পরগণার ভাঙ্গাগড়া, বারাকপুরের পটপরিবর্তন

বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' (১৪৯৫ খ্রীঃ) এবং আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' (১৫৯৬-৯৭ খ্রীঃ) রচিত না হওয়া পর্যন্ত ২৪-পরগণা সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন বিবরণ জানা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। 'মনসা বিজয়' কাব্যে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনা থেকে গঙ্গাতীরবর্তী ২৪ পরগণা অঞ্চলের বেশ কিছু জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, তোডরমল্ল কিভাবে সুবে বাংলাকে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য ১৯টি সরকার এবং ৬৮২ টি মহালে ভাগ করেন। ২৪ পরগণা অঞ্চল ছিল সরকার সাতগাঁও'র অধীন। সরকার সাতগাঁও দক্ষিণে সাগরদ্বীপের কাছে হাতিয়াগড় (পরগণা ডায়মন্ড হারবার থেকে সমুদ্র পর্যন্ত), উত্তরে পলাশীর উপরভাগ, পূর্বে যশোহরের কপোতাক্ষ নদ এবং পশ্চিমে হুগলীর বেশ কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। তখন অবশ্য এই সব অঞ্চল '২৪ পরগণা' নামে পরিচিত ছিল না।

পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদৌল্লার পরাজয় ঘটার পর ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর মীরজাফর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে ২৪টি পরগণা উপঢৌকন দেয়। এই সব পরগণার মধ্যে কলকাতা অন্যতম পরগণা হিসেবে পরিগণিত ছিল। কিছুকাল বাদে ২৪ পরগণা থেকে কলকাতা আলাদা হয়ে যায়। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী ২৪ পরগণা জেলার প্রশাসনিক দায়িত্ব লাভ করার পর বিভিন্ন সময়ে জেলাকে ভাগ করেছে, আবার যুক্ত করেছে। আর এই ভাঙ্গাগড়ার পটপরিবর্তনে বারাকপুর কখনও মহকুমা হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে, কখনও আবার মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হয় বারাকপুর মহকুমা। নবাবগঞ্জ ছিল একটি মাত্র থানা। বারাকপুর মহকুমার ৪২ বর্গমাইল জুড়ে ৫১ টি গ্রামে বাড়ি ছিল ১৬,০৫৭ টি। মোট জনসংখ্যা ৬৮,৬২৯ জন। এর মধ্যে ৪৭,৭০৯ জন (৬৯.৫ শতাংশ) হিন্দু, ১৯,৬০০ জন (২৮.৬ শতাংশ) মুসলমান, ১,২৮১ জন (১.৯ শতাংশ) খ্রীষ্টান এবং ৩৯ জন অন্য ধর্মাবলম্বী। ১৮৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে এই মহকুমায় একটি

ম্যাজিস্ট্রেট্ কোর্ট, ১৯৫ জন পুলিশ এবং ৩৮ জন চৌকিদার ছিল। (A Statistical Account of Bengal, vol-1–1875, W.W.Hunter)

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে বারাকপুর সহ ৮ টি মহকুমা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ ২৪ পরগণা জেলা গঠিত হয়। কিন্তু ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বারাকপুর মহকুমার বিলোপ ঘটানো হয়। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে আবার সদর (আলিপুর) এবং বারাসাত মহকুমার কিছু অংশ নিয়ে পুনর্গঠিত হয় বারাকপুর মহকুমা। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের আদম সুমারি অনুযায়ী এই মহকুমার আয়তন ছিল ১৯০ বর্গমাইল; মোট জনসংখ্যা ২,৯২,৫২৪ জন।

১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ মার্চ জেলা ২৪ পরগণা দু'টুকরো হয়ে জন্ম নেয় উত্তর ২৪ পরগণা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা। আবার পটপরিবর্তন হল বারাকপুর মহকুমার।

■ NOTIFICATIONS REGARDING

Bifurcation of the district 24-parganas

The Calcutta Gazette, Extraordinary, Tuesday, February 18, 1986. Government of West Bengal, Land and Land Reforms Department : Land Revenue. Notification No. 212-L.R./6M-15/83-17th February, 1986–In exercise of the power conferred by the Bengal District Act of 1836 (21 of 1836), read with the Bengal District Act of 1864 (Ben. Act IV of 1864) and sub-section (2) of Section 7 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), and in cancellation of all previous notifications relating to the area included in the district of 24-Parganas and the boundaries thereof, the Governor is pleased hereby to create, with effect from the 1st day of March 1986, two districts named as North 24-Parganas and South 24-Parganas by dividing the existing district of 24-Parganas, the former having the head-quarters at Barasat and the latter at Alipore.

The Governor is further pleased to direct that with effect from the aforesaid date, the limits of the district of North 24-Parganas shall include the local areas comprised in the subdivisions, and the police stations comprised in each such subdivision as shown in Schedule 'A' and the limits of the district of South 24-Parganas shall include the local areas comprised in the sub-

divisions, and the police stations comprised in each such sub division as shown in Schedule 'B'.

Schedule 'A'

Name of Sub division	Police station
1. Bangaon	Bangaon, Bagdah, Gaighata
2. Basirhat	Swarupnagar, Baduria, Basirhat, Haroa, Minakhan, Hasnabad, Hingalganj, Sandeshkhali.
3. Barasat	Habra, Amdanga, Barasat, Rajarhat, Deganga.
4. Barrackpore	Bijpur, Naihati, Jagaddal, Noapara, Barrackpore, Titagarh, Khardah, Baranagar, Belgharia, Dum Dum, Nimta, Airport, Lake Town, Salt Lake.

Schedule 'B'

1. Sadar	Jadavpur, Kasba, Tiljala, Regent Park, Behala, Metiabruz, Bishnupur, Sonarpur, Budge-Budge, Maheshtala, Baruipur, Joynagar, Bhangore, Canning, Kultali, Basanti, Gosaba,
2. Diamond Harbour	Mograhat, Falta, Mandirbazar, Diamond Harbour, Kulpi, Mathurapur, Patharpratima, Kakdwip, Namkhana, Sagar.

১.১.১৯৯৬ তারিখ থেকে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা নিম্নলিখিত থানা নিয়ে পাঁচটি মহকুমায় বিভক্ত হয়। বিজ্ঞপ্তি নং ঃ 577-PAR (AR) 29.12.1995.

বারাসাত ঃ বারাসাত, রাজারহাট, দেগঙ্গা, হাবড়া, আমডাঙ্গা।

বারাকপুর ঃ বারাকপুর, টিটাগড়, নোয়াপাড়া, নৈহাটি, বিজপুর, জগদ্দল, খড়দহ, বরানগর, বেলঘরিয়া, দমদম, নিমতা এবং এয়ারপোর্ট।

বিধাননগর ঃ বিধাননগর উত্তর, বিধাননগর দক্ষিণ, বিধাননগর পূর্ব এবং লেকটাউন।

বসিরহাট ঃ বসিরহাট, বাদুড়িয়া, স্বরূপনগর, হাড়োয়া, মিনাখাঁ, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ এবং সন্দেশখালি।

বনগাঁ ঃ বনগাঁ, গাইঘাটা, বাগদা এবং গোপালনগর।

u/s. 7(3) of Cr. P.C., 1973 (2 of 1974); and u/s. 2(s) of Cr. P.C., 1973. or u/s. 4(1) (s) of Cr. P.C. of 1898.

Courtesy : W.B. District Gazetters 24 Parganas– 94 Edited by Barun De.

■ বারাকপুরের পূর্বনাম

বারাকপুরের পূর্বনাম 'চাণক'। জনপদ হিসাবে 'চাণক' নাম প্রথম পাওয়া যায় বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত 'মনসা বিজয়' কাব্যগ্রন্থে। বিপ্রদাসের বাড়ী ছিল অবিভক্ত চব্বিশ পরগণার বাদুড়্যা (অন্যমত নাদুড়্যা) বটগ্রামে (বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগণার বাদুড়িয়া)। 'মনসা বিজয়' রচিত হয় ১৪১৭ শকাব্দে। বিপ্রদাসের পুঁথিতেই এই সময়কালের উল্লেখ আছে—

"সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন শাহ গৌড়ের সুলতান।।"

সিন্ধু = ৭ ইন্দু = ১ বেদ = ৪ মহী = ১

'অঙ্কস্য বামাগতি' এই নিয়মে গণনা করলে 'মনসা বিজয়' কাব্যের রচনাকাল ১৪১৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দ। আগে এরকম হেঁয়ালী করে সময় কাল লেখার প্রচলন ছিল। এই কাব্য লেখার সময় হুসেন শাহ ছিলেন গৌড়ের সুলতান।

চাঁদ সদাগরের সিংহলে বাণিজ্যযাত্রাকে উপলক্ষ করে বিপ্রদাস তাঁর 'মনসা বিজয়' রচনা করেন। এই কাব্য গ্রন্থে 'চাণক' সহ গঙ্গা নদীর দু'পাড়ের প্রাচীন জনপদগুলির বিবরণ পাওয়া যায়—

"চাঁপদানি ডাইনে বামেতে ইছাপুর
বাহ বাহ বলি রাজা ডাকিছে প্রচুর।
বামে বাঁকিবাজার[১] বহিয়া যায় রঙ্গে
জমিন বহিয়া রাজা প্রবেশে দিগঙ্গে।[২]
পূজিল নিমাইতীর্থ[৩] করিয়া উত্তম
নিমগাছে দেখে জবা অতি অনুপম।
চাণক[৪] বহিয়া যায় বুড়নিয়ার দেশ
তাহার মেলান বাহে আকনা মাহেশ।"

(ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত এবং এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত)

১. বাঁকিবাজার বর্তমান নবাবগঞ্জ

২. দিগঙ্গ মণিরামপুর অঞ্চল। নবাবগঞ্জের পর থেকে পলতার কিছুটা অংশ এবং নিমাইতীর্থ ঘাটের (যা প্রকৃতপক্ষে গঙ্গার পূর্বতীরের দেপাড়া বা সংলগ্ন ঘাট) কাছাকাছি অঞ্চল জুড়ে দিগঙ্গের অবস্থান। মণিরামপুর একসময় গঙ্গা তীরবর্তী পলতা অভিমুখে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পলতা জলকল সম্প্রসারণের ফলে এর বেশ কিছু অংশ ধিতাড়া সহ

জলকলের সীমানার অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে। বর্তমান মণিরামপুর পূর্বে দিগঙ্গ নামেই পরিচয় বহন করত। ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে 'মণিরামপুর' নামের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। কেউ কেউ বৈদ্যবাটীর একটি অঞ্চলকে পর্তুগীজদের ডাকা নাম অনুযায়ী দীর্ঘঙ্গ অপভ্রংশে দিগঙ্গ বলেছেন। কিন্তু এ কথা গ্রাহ্য হয় না। এ অঞ্চলে পর্তুগীজদের আগমনের পূর্বেই বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ে 'দিগঙ্গ' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

৩. নিমাইতীর্থ — 'মনসা বিজয়'-এর বর্ণনা অনুযায়ী নিমাইতীর্থ গঙ্গার পূর্ব পাড়ের ঘাট। চাঁদ সদাগরের যাত্রাপথ দক্ষিণাভিমুখী। প্রথা অনুযায়ী বাম দিকের তীর ধরেই নৌকা অগ্রসর হয়েছে। প্রাসঙ্গিক বর্ণনাতেও তা স্পষ্ট। পূর্ব পাড়ের দে পাড়া বা সংলগ্ন ঘাট হল নিমাইতীর্থ এবং তা দিগঙ্গের অন্তর্গত।

৪. চাণক — দিগঙ্গ অঞ্চল থেকে 'বুড়নিয়ার দেশ' অর্থাৎ বর্তমান টিটাগড় পর্যন্ত অঞ্চল হল চাণক (বারাকপুর)। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে Van den Brouche[১]-এর নক্‌শায় Tsjannock (চাণক)-এর অবস্থান দেখান হয়েছে "Cangnerre" (কাঁকিনাড়া) এবং "Barrenger" (বরানগর) এদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। এদিক থেকে বিচার করলে বিপ্রদাসের বিবরণের সঙ্গে মিল রয়েছে। অনেকে মনে করেন জব্ চার্ণকের নাম থেকে 'চাণক' নাম হয়েছে। একথা গ্রাহ্য হয় না। জব্ চার্ণক কলকাতায় আসে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ অগস্ট এর আগেই 'মনসা বিজয়', ব্রোকের নক্‌শা, এসবে 'চাণক' নামের উল্লেখ রয়েছে। কবি দীনবন্ধু মিত্র 'সুরধুনী' কাব্যে (১৮৭১) 'চাণক' নাম উল্লেখ করেছেন। সেখানে 'চাণক'ই যে বারাকপুর তা আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে—

"মূলাযোড় ইচ্ছাপুর সশস্ত্র চাণক,[২]
বিরাজে উদ্যান যথা হৃদয়রঞ্জক।"

[১] গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট নক্‌শা দ্রষ্টব্য

[২] ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বারাকপুরে সিপাহী বিদ্রোহের কিছুদিন পরেই 'সুরধুনী' কাব্য লেখা হয়। সেকারণেই চাণককে 'সশস্ত্র চাণক' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

■ বারাকপুর নামকরণ

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর সৈন্যরা এখানে এসে ব্যারাক তৈরী করেন। তার থেকেই এই শহরের নাম 'ব্যারাকপুর' হয়েছে বলে অনেকে দাবী করেন। "Troops were first stationed there in 1772, from which time it has required the name of Barrackpore." – A Statistical Account of Bengal Vol-1 –W.W.Hunter–1875.

'ব্যারাক' থেকে 'বারাকপুর' এ দাবীর মধ্যে প্রমাণাদির অভাব আছে। সতীশ চন্দ্র মিত্র "যশোহর খুলনার ইতিহাস" গ্রন্থে লিখেছেন, 'ইংরাজী Barrack (বারাক) শব্দ হইতে যে বাঙ্গালা এক বারিক শব্দ হইয়াছে তাহাতে সৈন্যবাস বুঝায়। কিন্তু সে শব্দ ষোড়শ শতাব্দীতে এদেশে আসে নাই। ইংরাজ আমলে সুন্দরবনে সৈন্য রাখিয়া সে স্থানের নাম বারাকপুর রাখিবার কথা শুনা যায় নাই। কলিকাতার সন্নিকটে ইংরাজদিগের একটি সৈন্যবাস হয় এবং সে স্থানের নামও বারাকপুর বটে। কিন্তু খুলনা জেলায় যে কয়েক স্থানে বারকপুর গ্রাম আছে, তাহার সহিত ইংরাজ সৈন্যের কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে করি না।"

মোগল আমলে আকবরের রাজত্বকালে সুবে বাংলাকে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য কয়েকটি সরকার ও মহালে বিভক্ত করা হয়। তোড়রমল্ল এইসব বিভাগ সৃষ্টি করেন। এদের মধ্যে একটি হল সরকার সাতগাঁও। নগর সপ্তগ্রাম এই সরকারের রাজধানী ছিল। সরকার সাতগাঁও'র মহালের সংখ্যা ছিল ৫৩। আবুল ফজল রচিত 'আইন-ই-আকবরীতে' দুটি মহালের নাম রয়েছে বারবাকপুর। তার মধ্যে কলকাতার কাছাকাছি এক বারবাকপুরের উল্লেখ রয়েছে। এই বারবাকপুর মহালই হল বারাকপুর। সেক্ষেত্রে বলা যায় ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর সৈন্যরা এসে ব্যারাক তৈরীর অনেক আগেই বারাকপুর স্থানটির নাম পাওয়া যায়।

■ প্রাচীন কাব্যে গঙ্গাতীরবর্তী বারাকপুর অঞ্চল

বিপ্রদাসের 'মনসা বিজয়' (১৪১৭ শকাব্দ = ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দ)

"মুলাজোড়া গাড়ুলিয়া বাহিল সত্তর
পশ্চিমে পাইকপাড়া বাহে ভদ্রেশ্বর।
চাঁপদানি ডাইনে বামেতে ইছাপুর
বাহ বাহ বলি রাজা ডাকিছে প্রচুর
বামে বাঁকি বাজার[১] বহিয়া যায় রঙ্গে
জমিন বহিয়া রাজা প্রবেশে দিগঙ্গে[২]
পুজিল নিমাইতীর্থ করিয়া উত্তম
নিমগাছে দেখে জবা অতি অনুপম।
চাণক[৩] বহিয়া যায় বুড়নিয়ার দেশ

তাহার মেলান বাহে আকনা মাহেশ।
খড়দহে শ্রীপাঠে করিয়া দণ্ডবত
বাহ বাহ বলিয়া রাজা ডাকে অবিরত।
রিষিড়া ডাহিনে বাহে বামে সুখচর
পশ্চিমে হরিযে রাজা বাহে কোন নগর"

(ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত)

১. বাঁকিবাজার	বর্তমান নবাবগঞ্জ।
২. দিগঙ্গ	মণিরামপুর।
৩. চাণক	বারাকপুর।
৪. বুড়নিয়ার দেশ	টিটাগড়

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য
(১৪৬৬ শকাব্দ = ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দ)

"গরিফা বহিআ বায় ভাগীরথী
করতোআ এড়াইয়া পাইল সরস্বতী।
ব্রহ্মাপুত্র পদ্মাবতী যেই ঘাটে মেলা
বুড়া মন্তেশ্বর বায় বানিঞার বালা।
উপনীত হইল গিআ নিমাঞি-তীর্থের ঘাটে
নিমের গাছেতে জথা ওড় ফুল ফোটে।"

(ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য আকাদেমি থেকে প্রকাশিত)

কলিকাতা-কল্পলতা

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "কলিকাতা-কল্পলতা" গ্রন্থে লিখেছেন, "এদেশের একজন প্রাচীন কবি অর্থাৎ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, যিনি কবিকঙ্কণ নামে বিখ্যাত আছেন— তৎরচিত চণ্ডীকাব্যে শ্রীমন্ত সাধুর সিংহল দ্বীতে বণিজ্য প্রস্থান প্রকরণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। যথা ঃ-

"গরির্ফা বাহিয়া সাধু বাহে গোন্দলপাড়া
জগদ্দল এড়াইয়ে গেলেন নপাড়া।।

ব্রহ্মপুত্র পদ্মাবতী সেই ঘাটে মেলা।
ইছাপুর এড়াইল বাণিয়ার বালা।।
উপনীত হইল নিমাই তীর্থ ঘাটে।
নিমের বৃক্ষেতে যথা জবা ফুল ফোটে।।
ত্বরায় চলয়ে তরী তিলেক না রয়।
ডাহিনে মাহেশ বামে খড়দহ কয়।।"

সুরধুনী কাব্য—দীনবন্ধু মিত্র (১৮৭১)

"বামে হালিশহর নগর রসময়,
বিবাহ-বাসরে যথা নৃত্য-গীত হয়।
বসতি করিত রামপ্রসাদ এখানে,
বিমোহিত হয় মন যার মিষ্ট গানে।

ভদ্রজন-বাসস্থান গরিফা নৈহাটী,
ভাটপাড়া, যথা চতুষ্পাঠী—পরিপাটী,
পণ্ডিত মণ্ডলী করে শাস্ত্র আলাপন,
ব্যাকরণ ন্যায় স্মৃতি ষড়্‌দরশন।
এই স্থানে রামধন কথক-রতন
কলকণ্ঠ-কলে কল করিত কলন,
সুললিত পদাবলী, বিরচিত তাঁর,
সকল কথক-সুরে করিছে বিহার।
হলধর চূড়ামণি ন্যায়শাস্ত্রবিৎ,
ন্যায়ের টিপ্‌পী সাধু যাঁহার রচিত।

মুলাযোড়, ইছাপুর, সশস্ত্র চাণক,
বিরাজে উদ্যান[১] যথা হৃদয়রঞ্জক।
গোঁসাই-গোবিন্দ ভরা খড়দহ ধাম,
রসনায় গৌরাঙ্গ নিতাই অবিরাম,
পবিত্র আগোড়পাড়া গিরিজা শোভিত,
গাইতেছে নরনারী দেভিদ সঙ্গীত।

১ উদ্যান — উদ্যান বলতে বারাকপুর লাটসাহেবের উদ্যানকে বোঝান হয়েছে। ছবির মত সুন্দর ছিল সে উদ্যান। এই ছায়া সুনিবিড় স্থানে গড়ে উঠেছিল গভর্ণমেন্ট হাউস, — "This Park of 250 acres, beautifully wooded and artistically laid out is

the feature of Barrackpore''. (Calcutta, Old and new–Cotton.) গভর্ণরজেনারেল লর্ড ক্যানিংয়ের পত্নী এখানকার সবুজঘেরা পরিবেশে চির নিদ্রায় শায়িত আছেন।

■ মণিরামপুরের পূর্বনাম এবং নামকরণ

মণিরামপুর পূর্বে দিগঙ্গ নামে পরিচিত ছিল, সে বিষয়ে পূর্বেই আলোকপাত করেছি। কিন্তু 'দিগঙ্গ' নাম সরে গিয়ে মণিরামপুর এসে পড়ল কবে থেকে? কার নাম থেকে হল মণিরামপুর? আমাদের বারাকপুরের মণিরামপুর ছাড়াও হুগলী জেলার বেগমপুরের কাছে রয়েছে এক মণিরামপুর; আর একটি রয়েছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের যশোহর সদরের উপবিভাগের মধ্যে। এই তিনটে মণিরামপুরের মধ্যে একটা যোগসূত্র পাওয়া যায়। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বাংলাদেশে দাউদ খাঁকে দমন করবার জন্য যে সেনাবাহিনী পাঠান, তার সঙ্গে তোডরমল্লও আসেন। তিনি সুবে বাংলাকে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য কয়েকটি সরকার ও মহালে বিভক্ত করেন। এদের মধ্যে অন্যতম সাতগাঁও'র সরকার। সেই সময় সাতগাঁও'র মধ্যে হুগলী এবং যশোহরের বেশ কিছু অংশ অন্তর্ভূক্ত ছিল। এদিক থেকে দেখলে, বারাকপুরের মণিরামপুর, হুগলীর মণিরামপুর, এবং যশোহরের মণিরামপুরের মধ্যে একটা যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

তোডরমল্ল যখন বাংলায় আসেন তখন সেনাপতি মুনিম খাঁকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। এই মুনিম খাঁ'র নাম থেকে মণিরামপুর নামকরণ হয়েছে। (বারাকপুর সংক্রান্ত পাণ্ডিত্যের অধিকারী শ্রী কানাই লাল ঘোষ মহাশয়ই জানালেন মুনিম খাঁ—এর নাম থেকেই 'মণিরামপুর' নাম হয়েছে।

■ বারাকপুরের সাহিত্য-ভূমি যাঁদের অবদানে উর্বর

(১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে যাঁদের জন্ম)

শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। ভাটপাড়ার কৃতি সন্তান — এম.এ. (স্বর্ণপদক); ডি.লিট. সাম্মানিক (কঃ বিঃ); ডি. লিট. সাম্মানিক (ব. বি); দেশিকোত্তম (বিশ্বভারতী); এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক Bicentenary fellow-ship প্রদান; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক তাঁকে আজীবন সদস্য পদ প্রদান; মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু সম্মানের অধিকারী ছিলেন শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ। ১৯৬৮ খ্রীঃ তিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পান। কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা

করেছেন। বহু সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা। বঙ্গবাসী, মাসিক বসুমতী, ভারতবর্ষ, হিমাদ্রী প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি লিখতেন। তিনি অনেক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়াও বাংলা ভাষায় প্রায় দু'শ প্রবন্ধ লিখেছেন। একশত বছরের অধিক কাল তিনি জীবিত ছিলেন।

মোহিতলাল মজুমদার

১৮৮৮ খ্রীঃ ২৬ অক্টোবর কাঁচড়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। সুকবি মোহিতলালকে আধুনিকতার পুরোধা মনে করা হয়। ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। রবীন্দ্রনাথের দেহাতিরিক্ত প্রেমের ধারণার পরিবর্তে তিনি প্রচার করেন দেহবাদ—'ভুলেছি আত্মার কথা, মানি শুধু দেহের সীমানা'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেছেন। ছন্দ চতুর্দশী (১৯৪৪), স্বপন পশারী (১৯২২), তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। কবিতাকে তিনি রবীন্দ্র প্রভাব থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১৮৮২ খ্রীঃ ১২ ফেব্রুয়ারি নিমতায় জন্ম গ্রহণ করেন। ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সবিতা'। তিনি অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ 'নোবেল' পাবার পর শান্তিনিকেতনের সংবর্ধনা সভায় যে 'অভিনন্দনপত্র' পাঠ করা হয়েছিল, তার খসড়া তিনিই প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি শোষিত মানুষের কথাও তুলে ধরেছেন তাঁর কাব্যে—

'জীবন বিকায়ে ধনের দুয়ারে খাটিয়া খাটিয়া মরে,
কলঙ্কহীন শ্রমের অন্নে জঠর নাহি ভরে।
হেথায় কুবের ফুলিছে ফাঁপিছে—ফুলিছে টাকার থলি,
চিবুকের তলে বাড়ছে তাহার দ্বিতীয় পাকস্থলী।'

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার ধ্বনিচিত্র ভুলবার নয়—

'চারদিক নিঃসাড়/ঘোর্ ঘোর্ রাত্রি,
ছিপ্খান তিনদাঁড়/ চার জন্ যাত্রী।'

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৬৩ খ্রীঃ ২০ ডিসেম্বর ভাগলপুরে জন্মগ্রহণ করলেও নৈহাটির কাছে হালিশহরেই তিনি বাড়ি করে বসবাস করেন। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। বসুমতী, বঙ্গবাসী, বাঙালী প্রভৃতি বহু পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রান্সিস গ্লাডউইন কর্তৃক ইংরেজি থেকে বাংলায় 'আইন-ই-আকবরী' অনুবাদ করেন। বঙ্গ

সমাজ সম্পর্কে বিচিত্র তথ্যের উল্লেখ আছে এই বইয়ে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

১৮৬৩ খ্রীঃ ১২ এপ্রিল খড়দহে জন্মগ্রহণ করেন। বারাকপুর গভর্ণমেন্ট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করার পর তিনি রসায়ণে এম. এ. পাশ করে জেনারেল এ্যাসেমব্লীজ কলেজে (বর্তমান স্কটিশচার্চ কলেজ) অধ্যাপক নিযুক্ত হন। নাট্যকার হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ ২০ নভেম্বর ক্লাসিক থিয়েটারে 'আলিবাবা' মঞ্চস্থ হবার পর তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে।পরবর্তীকালে শিক্ষকতা ছেড়ে পুরোপুরি নাটকে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বহু নাটক লিখেছেন—ফুলশয্যা, বঙ্গে রাঠোর, রঘুবীর, সাবিত্রী, মন্দাকিনী উল্লেখযোগ্য। তিনি গল্প, কবিতা, উপন্যাসও লিখেছেন। 'অলৌকিক রহস্য' নামে একটি মাসিক পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করতেন।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৬৩ খ্রীঃ ১৫ ফেব্রুয়ারী দক্ষিণেশ্বরে জন্মগ্রহণ করেন। 'কাশী'কে নিয়ে লেখা তাঁর হাস্যরসাত্মক কবিতা 'কাশীর কিঞ্চিৎ' সাহিত্যে বেশ সোরগোল তুলেছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা—চীনযাত্রী, কোষ্ঠীর ফলাফল, রত্নাকর প্রভৃতি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক লাভ করেন। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

১৮৫৮ খ্রীঃ ১৮ আগস্ট পাণিহাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। মহিলা কবি। তাঁর কৈশোরের লেখা একটি কবিতা পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রশংসা করেছিলেন। সিন্ধুগাথা, ভারতকুসুম, অশ্রুকণা প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

১৮৫৩ খ্রীঃ ৬ ডিসেম্বর নৈহাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রথমে নাম ছিল শরৎ নাথ। একবার খুব অসুস্থ হলে হর অর্থাৎ শিবের কাছে মানত করে তার অসুখ সেরে যায়। বাড়ীর লোক তখন তাঁর নাম রাখে 'হরপ্রসাদ'। এম. এ পরীক্ষায় পাশ করার পর সংস্কৃত কলেজ থেকে তিনি 'শাস্ত্রী' উপাধি পান। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট. উপাধি প্রদান করে। নেপাল থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার তাঁর জীবনের একটা বড় কীর্তি। বৌদ্ধগান ও দোঁহা, কাঞ্চনমালা, সচিত্র রামায়ণ প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

১৮৪৮ খ্রীঃ ১০ নভেম্বর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করলেও বারাকপুর মণিরামপুরের বাসস্থান ছিল তার কাছে কর্ম প্রেরণার এক বিরাট উৎস। শেষ ট্রেন ধরেও তিনি ফিরে আসতেন বারাকপুরের বাড়িতে। গান্ধীজি দু'বার এই বাড়ীতে এসেছেন। অসুস্থ সুরেন্দ্রনাথকে এখানে দেখতে এসে তিনি বলেছিলেন, তিনি 'তীর্থযাত্রা'য় এসেছেন। গান্ধীজী সুরেন্দ্রনাথকে বারাকপুরের 'মহাজ্ঞানী' বলে Young India-তে উল্লেখ করেছেন। 'বেঙ্গলী' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ— 'A Nation in Making'.

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে (৬ শ্রাবণ, ১২৫৪) জগদ্দলের কাছে রাহুতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। W.W.Hunter'র বাংলা গেজেটিয়ারে কিছুদিন কাজ করেছিলেন। হাস্যরসাত্মক রচনায় তাঁর খ্যাতি ছিল। কঙ্কাবতী, ডমরুচরিত প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। ভারতীয় যাদুঘরের সহকারী কিউরেটর হয়েছিলেন। বাংলায় বিজ্ঞানের উপর পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেছিলেন।

শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বরানগরের কৃতি সন্তান। 'ভারত শ্রমজীবী' নামে একটি পত্রিকা তিনি প্রকাশ করেন ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এটিই ভারতের প্রথম শ্রমজীবী মানুষদের জন্য পত্রিকা। তিনি বরানগরে শ্রমজীবী সংঘ গঠন করেছিলেন। তাঁর কন্যা বনলতা দেবীর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে সাহিত্যের ক্ষেত্রে। তাঁর স্ত্রী রাজকুমারী দেবী প্রথম ব্রাহ্মণ মহিলা যিনি বিলাত গিয়েছিলেন। বিধবা বিবাহ আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

শম্ভুচন্দ্র মুখার্জী

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বরানগরে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু পেট্রিয়ট্ পত্রিকার সম্পাদনা ছাড়াও আরো অনেক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। ১৮ বছর বয়সে সিপাহী বিদ্রোহের উপর তাঁর লেখা প্রশংসা অর্জন করেছিল। উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী, এ্যালান হিউম প্রমুখ তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৩৮ খ্রীঃ ২৬ জুন নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের প্রথম স্নাতক। আধুনিক পাশ্চাত্য স্টাইলে লেখা

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'। ১৮৭২ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে তিনি মাসিক 'বঙ্গ দর্শন' প্রকাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের চেহারার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন, "বঙ্কিমবাবুর খড়্গ নাশা, তাঁহার চাপা ঠোঁটে, তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভারি একটা প্রবলতার লক্ষণ ছিল। বক্ষের উপর দুই হাত বদ্ধ করিয়া তিনি যেন সকলের নিকট হইতে পৃথক হইয়া চলিয়াছিলেন, কাহারও সঙ্গে যেন তাঁর কিছুমাত্র গা ঘেঁষাঘেঁষি ছিল না।" 'দেবী চৌধুরানী', 'কপালকুণ্ডলা' 'মৃণালিনী','বিষবৃক্ষ' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে নৈহাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ। তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনী 'পালামৌ' বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। তিনি কিছুদিনের জন্য 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা করেছিলেন।

দীনবন্ধু মিত্র

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে (পুত্র ললিত চন্দ্র মিত্রের মতে ১২৩৬ বঙ্গাব্দে, আর বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ১২৩৮ বঙ্গাব্দে) দীনবন্ধু মিত্র কাঁচড়াপাড়ার কাছে চৌবেড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এটি ছিল আগে নদীয়া জেলার অন্তর্গত। পরবর্তীকালে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। ডাকবিভাগের কর্মচারী ছিলেন। 'নীলদর্পন' নাটক তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে। ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধন হয়েছিল 'নীলদর্পন' নাটক দিয়ে। 'সধবার একদশী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রভৃতি নাটক ছাড়াও তিনি দুটি কাব্য প্রকাশ করেছিলেন—'সুরধুনী কাব্য' এবং 'দ্বাদশ কবিতা'।

ঈশ্বর গুপ্ত

১৮১২ খ্রীষ্টাদে (২৫ ফাল্গুন, ১২১৮) কাঁচড়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'সংবাদ প্রভাকর' যা ছিল প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে ১৮৩৯ খ্রীঃ প্রথম বাংলা দৈনিক কাগজে রূপান্তরিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, " নিত্যনৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা এসকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়। আজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌষপার্বণ, আজ মিশনারি, কাল উমেদারি, এসকল যে সাহিত্যের অধীন সাহিত্যের সামগ্রী, তাহা প্রভাকরই দেখাইয়াছিল" তাঁর দেওয়া কলকাতার বর্ণনা—

'রেতে মশা দিনে মাছি
এই তাড়য়ে কলকেতায় আছি।'

ঈশ্বরগুপ্তের একটি ছড়া প্রায় শোনা যেত—

'কে বলে ঈশ্বরগুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর,
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।'

১৮৫৭'র সিপাহীবিদ্রোহকে নিয়ে তিনি ব্যঙ্গাত্মক ছড়া লিখেছেন। নানা সাহেবকে ব্যঙ্গ করে তিনি লিখেছেন—

'নানাপাপে পটু নানা নাকি গুণে, না, না।
অধর্মের অন্ধকারে হইয়াছে কানা।।
ভালদোষে ভাল তুমি ঘটালে প্রমাদ.
আগেতে দেখেছ ঘুঘু, শেষে দেখ ফাঁদ।।'

বিধবা বিবাহ সম্পর্কে তাঁর ব্যাঙ্গাত্মক ছড়ার কয়েকটি লাইন—

'বাধিয়াছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল।।'

রামকমল সেন

১৭৮৩ খ্রীঃ ১৫ মার্চ নৈহাটির গরিফাতে জন্ম। কেশব চন্দ্র সেনের পিতামহ সুপণ্ডিত ছিলেন। ইংরাজী বাংলা অভিধান (১৮৩৪), 'বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত' প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন রক্ষণশীল ব্যক্তিত্ব। হিন্দু কলেজের পরিচালন সমিতির সদস্য থাকাকালীন ডিরোজিওকে বরখাস্ত করতে অগ্রণী হয়েছিলেন। রামকমল জীবনের শুরুতে এশিয়াটিক সোসাইটিতে ৮ টাকা মাইনেতে কাজ করতেন। পরবর্তীকালে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান হয়ে প্রভূত অর্থ রোজগার করেন। রামকমলের মধ্যম পুত্র প্যারীমোহনের মধ্যমপুত্র হলেন কেশবচন্দ্র সেন।

সাধক রামপ্রসাদ

১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে, কারো মতে ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে হালিশহরে রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শাক্তকবি। এক ধনী ব্যক্তির সেরেস্তায় হিসাব রাখার কাজ করতেন। কিন্তু হিসাবের পরিবর্তে খাতায় লিখে রাখতেন শ্যামা সংগীত—

'আমায় দাওমা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী'।।

এই গান পড়ে তাঁর মনিব তাঁকে চাকরী থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা রামপ্রসাদকে বজরায় তুলে নিয়ে তাঁর গান শুনেছিলেন। নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে সভাকবি করা ছাড়াও ১০০ বিঘা জমি দান করেন এবং 'কবিরঞ্জন' উপাধি দেন।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র

১৭০৬/০৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র বর্ধমান রাজের অধীন ভরশুট পরগণার পেঁড়া

গ্রামে (বর্তমান হাওড়া জেলায়) জন্মগ্রহণ করলেও শ্যামনগরের কাছে মূলাজোড় বাড়ি করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেখানেই বসবাস করেছেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'অন্নদামঙ্গল' এবং 'বিদ্যাসুন্দর'। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে তিনি 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেন। সেই সুবাদে তিনি হলেন 'রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র'। তাঁর রচনায় সরল বাক্যের সুন্দর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়—

সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ।/আনিয়াছি আধসের খাইতে সন্দেশ।।
আটপণে আধসের আনিয়াছি চিনি।/অন্যলোকে ভূয়া দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।।

কৃষ্ণরাম দাস

নিমতা। কবি কৃষ্ণরাম দাস ২০ বছর বয়সে (১৬৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দ) 'কালিকামঙ্গল' রচনা করেন। এই কাব্যে নিজের পরিচয় দিয়ে লিখেছেন,

'সেই গ্রামের মধ্যে বাস / নাম ভগবতী দাস/ কায়স্থ কুলেতে উৎপত্তি।/তাহার তনয় হই/নিজ পরিচয় কই/বয়ঃক্রোম বৎসর বিংশতি।।'

কৃষ্ণরাম 'কালিকামঙ্গল' ছাড়াও রচনা করেন— 'রায়মঙ্গল', 'ষষ্ঠীমঙ্গল', 'শীতলামঙ্গল' এবং 'কমলামঙ্গল'। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদকে 'বিদ্যাসুন্দর' লিখতে প্রেরণা জুগিয়েছিল কৃষ্ণরামের 'কালিকামঙ্গল'।

নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চু

নৈহাটি। ১৮৩৫ খ্রীঃ জন্ম। পিতা রামকমল ন্যায়রত্ন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হয়েছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য 'ন্যায়চঞ্চু' উপাধি লাভ করেন। এছাড়া 'তর্করত্ন' উপাধিও পেয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁকে বিভিন্ন সময়ে সাহায্য করেছেন।

বলদেব পালিত

জন্ম ১৮৩৫ খ্রীঃ। কবি বলদেব পালিতের পিতা বিশ্বনাথ হালিশহরের কোনও এক গ্রামে বসবাস করতেন। সারাজীবন কেরানীর কাজ করেও বলদেব কাব্য রচনা থেকে বিরত হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর একটি কাব্যকে 'শারীরিক প্রবৃত্তির উদ্দীপক' বললেও তাঁর কাব্যের প্রশংসা করেছেন। কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ৫। তাঁর কাব্যের কয়েকটি চরণ ঃ

"নাচাইয়া লতা পাতা, দক্ষিণ বাতাস
সরোবরে কুমুদীরে করি আলিঙ্গন,
বলেতে খুলিয়া তব অবগুণ্ঠ বাস,
উড়ায়ে অলকাবলি করিছে চুম্বন।

তোমার নিকটে যদি প্রকাশিয়া বল,
পবন চুম্বিতে পারে বদন মণ্ডল,
তবে কেন আমি এত তোষামোদ করি।
বঞ্চিত ও কোমলাঙ্গ পরশে সুন্দরি?"

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়

জন্ম ২৪-৩-১৮৫০ তারিখে শ্যামনগরের কাছে রাহুতায়। বিশ্বকোষের দ্বিতীয় ভাগের কিছু অংশ সম্পদনা করার পর নগেন্দ্রনাথ বসুকে এর স্বত্ব সমর্পণ করেন। 'জন্মভূমি', 'আর্যদর্শন', 'সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি পত্রিকায় লিখতেন। শিক্ষকতা সূত্রে বীরভূমে এসেছিলেন লাঘোষা গ্রামে। মৃত্যুর আগেই তিনি সমাধিস্থান নির্দেশ করে গিয়েছিলেন। হিন্দুর নিয়ম অনুসারে তাঁকে দাহ করা হয়নি। রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশ্বকোষ সম্পাদনার ক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে আছে।

হরিনাথ দে

আড়িয়াদহ। জন্ম ১২.৮.১৮৭৭ খ্রীঃ। বহুভাষাবিদ্ হরিনাথ দে ইম্‌পিরিয়াল এডুকেশন সার্ভিস-এর প্রথম ভারতীয় সদস্য। ২০টি ইউরোপীয় এবং ১৪টি ভারতীয় ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। মাত্র ২২ বছর বয়সে ঢাকা সরকারি কলেজে অধ্যাপনার পর কিছুদিন প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করেন। তারপর হুগলী কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করার পর ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরীর (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থাগার) প্রথম ভারতীয় গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। চীনা ভাষা থেকে নাগার্জুনের 'মাধ্যমিক দর্শন', তিব্বতী ভাষায় রচিত 'ডুয়াঙের লজিক' প্রভৃতির ইংরাজি অনুবাদ বৌদ্ধদর্শনের আদি ইতিহাসের প্রামাণিক নিদর্শন হিসেবে 'নির্বাণব্যাখ্যানশাস্ত্রম্' ও 'লঙ্কাবতারসূত্র' সম্পাদনা করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বনলতা দেবী

বরাহনগরের শ্রমিকদরদী নেতা শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা বনলতা দেবী। তিনি সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। জন্ম ১৮৮০ খ্রীঃ ২০ ডিসেম্বর বরাহনগরে। তিনি 'অন্তঃপুর' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশনা ও সম্পাদনা করতেন। তাঁর লেখা চার লাইন কবিতা প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হতো। 'বনজ' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

হালিশহর। জন্ম নভেম্বর ১৮৮২ খ্রীঃ। ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিদ্যারত্ন উপাধি লাভ করেছিলেন। কলকাতা কলেজ স্কোয়ারের মহাবোধী সোসাইটি ভবনের নির্মাণ পরিকল্পনা তিনিই করেন।

ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আগরপাড়া। জন্ম ১.১০.১৮৯৭ খ্রীঃ। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ তাঁকে 'ভারতীরঞ্জন' উপাধি প্রদান করেন। দোভাষী হিসেবে গান্ধীজীর সঙ্গে পূর্ববঙ্গ সফর করেছিলেন ১৯২৫ খ্রীঃ। দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন।

বিনয়তোষ ভট্টাচার্য

নৈহাটির মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুত্র বিনয়তোষ ভট্টাচার্য ১৯২৪ খ্রীঃ বরোদা রাজ্যের সংস্কৃত গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকরূপে কাজ করেছেন। 'রাজ্যরত্ন' ও 'জ্ঞানজ্যোতি' উপাধি লাভ করেন বরোদা রাজের কাছ থেকে। বৌদ্ধ ধর্মের উপর গ্রন্থ লেখা ছাড়াও অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থও সম্পাদনা করেন।

তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় (১৮৫৪-১৯৩৪)

১৮৫৪ সালে ২৪ পরগণার হালিশহর বারুইপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়। 'প্রভাতী' সংবাদপত্রে সাংবাদিকতা করেছেন। কিছুদিন 'বসুমতী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক, তারপর 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি হল 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' হতে প্রকাশিত 'রামপ্রসাদ গ্রন্থাবলী'র সম্পাদনা, এছাড়াও লিখেছেন নাটক 'শশীপ্রভা'।

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ

হালিশহর-কুমারহট্টে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮২৫ সালে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজে পড়াকালীন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তর্কবাগীশ মহাশয়ের কাছে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পাঠ নিয়েছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ— 'সেতু সংগ্রহ', 'খোস গল্পসার'।

লেখক পরিচিতি : অধ্যাপক।

Cangnerre
(কাঁকিনাড়া)

Tsjannock
(চাণক
বর্তমান বারাকপুর)

Barrenger
(বরানগর)

ফান্ ডেন্ ব্রোকের নক্শা (১৬৬০খ্রীঃ) (↓) নির্দেশক স্থানগুলি আরোপিত

বারাকপুর মহকুমার পত্র-পত্রিকা পরিচয়

১৯০০ খ্রীঃ পূর্বে প্রকাশিত

আয়ুর্ব্বেদ দর্পণঃ (মাসিক), জুন ১৮৪০—চাণক নিবাসী শ্রী নারায়ণ রায় চিকিৎসা বিষয়ক এই পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। ১৮৫২ খ্রীঃ এই পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশিত হয়ে ওই বছরই লুপ্ত হয়৭ ☐ **আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা** (সাপ্তাহিক), জানুয়ারি ১৮৬৩—হাবড়ার সিভিল সার্জন ডাঃ রবার্ট বার্ডের সাহায্যে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। বংশবাটী নিবাসী দ্বারকানাথ দাস সম্পাদক ছিলেন৭ ☐ **হালিসহর পত্রিকা**— ১ বৈশাখ ১২৭৮ বঙ্গাব্দে হালিশহর থেকে প্রকাশিত (মাসিক) সম্পাদক জানকীনাথ গাঙ্গুলী। ১ম বছর মাসিক, ২য় বছর পাক্ষিক এবং ৩য় বছরে সাপ্তাহিক হিসাব প্রকাশিত হয়েছিল। ☐ **হিতমিহির** (সাপ্তাহিক) ১২৭৭ বঙ্গাব্দে খড়দহ থেকে প্রকাশিত। পত্রিকাটির মূল্য ছিল ১ পয়সা। ☐ **বরাহনগর বার্ত্তাবহ** (পাক্ষিক), জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮। প্রায় চারমাস চলবার পর বন্ধ হয়ে যায়। পরে আবার প্রকাশিত হয়েছিল। ☐ **আর্য্যাবর্ত্তরীতিবোধিকা** (মাসিক), আশ্বিন ১২৭৮। এটি সম্পাদনা করেন সাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। এটি একটি ধর্ম বিষয়ক পত্রিকা। ☐ **বঙ্গদর্শন** (মাসিক), বৈশাখ ১২৭৯। ১২৭৯-১২৮২ (১ম-৪র্থ খণ্ড) সম্পাদনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্গদর্শনের পঞ্চম -নবম খণ্ডপর্যন্ত সম্পাদনা করেন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১২৯০, কার্তিক-মাঘ, সম্পাদনা করেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। ☐ **মধুকরী**, ভাটপাড়া থেকে প্রকাশিত। ১৮৬৯-৭০-এ সম্পাদক ছিলেন হৃষীকেশ শাস্ত্রী। ☐ **বরাহনগর সমাচার** (পাক্ষিক), ১৮৭৩ খ্রীঃ বরানগর থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ☐ **বিজ্ঞানবিকাশ** (পাক্ষিক), ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০ বঙ্গাব্দে খড়দহ থেকে প্রকাশিত। বাংলা ও ইংরাজিতে প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। ☐ **কাঁচরাপাড়া প্রকাশিকা** (মাসিক), ১ অগ্রহায়ণ ১২৮০ বঙ্গাব্দে কাঁচরাপাড়া থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক ছিলেন দেবেন্দ্রকুমার রায়। ☐ **ভ্রমর** (মাসিক), বৈশাখ ১২৮১। এটি সম্পাদনা করেন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১২৮২ তে বন্ধ হবার পর কিছুদিন প্রকাশ পেয়ে পুনরায় বন্ধ হয়ে যায়। ☐ **ভারত শ্রমজীবী** (মাসিক), বৈশাখ ১২৮১ বঙ্গাব্দে বরানগর থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ☐ **হিন্দু বিলাসী** (মাসিক), ৪ শ্রাবণ ১২৮১ বঙ্গাব্দে কাঁঠালপাড়া থেকে প্রকাশিত। প্রকাশক ছিলেন প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। ☐ **বিচারক** (সাপ্তাহিক), হালিশহর পত্রিকার লেখকেরাই এই পত্রিকায় লিখতেন। হালিশহর পত্রিকার লেখকদের প্রচেষ্টায় এটি প্রকাশিত হত। এটি

ইংরাজি-বাংলা দ্বিভাষিক পত্রিকা। □ **হিন্দু ললনা** (পাক্ষিক), মাঘ ১২৮৪ বঙ্গাব্দে নবাবগঞ্জ থেকে প্রকাশিত মহিলা পরিচালিত পত্রিকা। □ **হালিশহর প্রকাশিকা** (সাপ্তাহিক), ১২৮৮ বঙ্গাব্দ। নবীনচন্দ্র মিত্র কলকাতা থেকে প্রকাশ করতেন। □ **কৃষি পদ্ধতি** (মাসিক), অগ্রহায়ণ ১২৯০ বরাহনগর থেকে প্রকাশিত কৃষি বিষয়ক পত্রিকা। সম্পাদক উমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। □ **প্রচার** (মাসিক), শ্রাবণ ১২৯১। বঙ্কিমচন্দ্র এটি প্রকাশ করেন। ক্ষুদ্র পত্রিকা। চার বছর মত প্রচারিত হয়েছিল। □ **আর্য্য প্রতিভা** (সাপ্তাহিক), বৈশাখ ১২৯৩ ঃ হালিশহর থেকে প্রকাশিত। □ **অরুন্ধতি** (মাসিক), শ্রাবণ ১৩০২ বরাহনগর থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক রজনীকান্ত কাব্যতীর্থ। □ **অন্তঃপুর** (মাসিক), মাঘ ১৩০৪। বরাহনগর থেকে প্রকাশিত। সম্পাদনা করেন বনলতাদেবী। মহিলা পরিচালিত পত্রিকা। □ **সংসার তত্ত্ব** (মাসিক), ১৮৯৯ খ্রীঃ বরাহনগর থেকে প্রকাশিত। সম্পাদনা করেন হেমচন্দ্র মৈত্র। □ **অলৌকিক রহস্য** ঃ খড়দহ থেকে প্রকাশিত (মাসিক)। এটি সম্পাদনা করতেন ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। □ **হিতৈষিণী** (মাসিক), অগ্রহায়ণ ১৩০৭। বরানগর থেকে প্রকাশিত। এর সম্পাদক ছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে প্রকাশিত

নাম	সম্পাদক	স্থান
সাংস্কৃতিক সমধ্বন	ডাঃ বিমলকান্তি রায়	খড়দহ
সপ্তাশ্ব	দিলীপকুমার বসাক	খড়দহ
বঁইচি	রঞ্জীব চক্রবর্তী (একটি সংখ্যায় অভিজিৎ লাহিড়ি)	খড়দহ
পথ	সুবীর মুখোপাধ্যায়	খড়দহ
সিন্ধুসারস	তন্ময় রুদ্র	খড়দহ
স্বরান্তর	দ্বিজেন্দ্র ভৌমিক অরূপরতন হালদার	খড়দহ
বয়ঃসন্ধি	তথাগতমুখোপাধ্যায়	খড়দহ
দুমদাম এবং ২৫শে বৈশাখ	শমীন্দ্র ভৌমিক	খড়দহ
মোহনা	দুলেন্দ্র ভৌমিক	খড়দহ
চেতনা	শচীন্দ্রনাথ মজুমদার	খড়দহ
ঋত্বিক	অসীম পাল	খড়দহ
নগরোপান্তে	তাপস মুখোপাধ্যায়	খড়দহ
প্রজ্ঞানগর	অমিতাভ ভট্টাচার্য	খড়দহ
আন্তর্জাতিক ছোটগল্প	সুখেন্দু ভট্টাচার্য	খড়দহ
তৃষ্ণা	শমিত কর্মকার	কাঁচড়াপাড়া

	রমেশ গোস্বামী	
ধ্যাস	মৃণালেন্দু দাস	কাঁচড়াপাড়া
বাতিঘর	সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	কাঁচড়াপাড়া
দেবশিশু	অজয় মজুমদার	হাজিনগর
ছোটগল্প ঃ নবনিরীক্ষা*	অশোকরঞ্জন সেনগুপ্ত	নৈহাটি
কৌশিক	শরণ্য দত্ত	নৈহাটি
লেখা দিয়ে রেখাপাত	বিশ্বেন্দু চক্রবর্তী	নৈহাটি
অন্বেষণ	মনোরঞ্জন মজুমদার	নৈহাটি
অবমানব	সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	নৈহাটি
অন্বেষণ	মনোরঞ্জন মজুমদার	নৈহাটি
মহাজন	ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়	নৈহাটি
*(প্রকাশনায়)	সমরেশ বসু	
	সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	
	সোমনাথ ভট্টাচার্য	
	সমীরণ দাশগুপ্ত	
আজকাল	বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী	নৈহাটি
কয়েকটি কণ্ঠস্বর	সুমিত তালুকদার	নৈহাটি
মহাজন	ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়	নৈহাটি
রচিষ্ণু	পিনাকী দাশগুপ্ত	নৈহাটি
	নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত	
খুশির ডিঙা	প্রীতিভূষণ চাকী	নৈহাটি
অশনি সংকেত	কিশোরকুমার সাহা	নৈহাটি
উত্তর-দক্ষিণের প্রতিফলন	কুশাঙ্কুর সাহা	নৈহাটি
বার্তালিপি	নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	নৈহাটি
অক্ষক্রিয়া		ভাটপাড়া
আজ বসন্ত	সুখময় পাল	ভাটপাড়া
সমাহার	সুনীল মুখোপাধ্যায়	ভাটপাড়া
ছোট কাগজ	সুনীল আচার্য	ফিঙ্গাপাড়া
ক্যামেলিয়া	শান্তনুকুমার	ভাটপাড়া
সাধনা	মধুসূদন রায়	ভাটপাড়া
	(পরে সমরেশ বসু)	
বিজ্ঞানদূত	গোবিন্দ যাদব	সদরবাজার
বিনিময়	সুকুমার দত্ত	আনন্দপুরী
পাতঞ্জল যোগ	রাজকুমার মুস্তাফি	মণিরামপুর

মহাদেব	ভোলাগিরি আশ্রম	মণিরামপুর
নগর পেরিয়ে	কানাইপদ রায়	মণিরামপুর
আকাশগঙ্গা	শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়	মণিরামপুর
প্রবীণ আলেখ্য	সুকুমার চক্রবর্তী প্রভাতকুমার বসু শরৎচন্দ্র নন্দ	মণিরামপুর
সাহিত্যালোক	অরিন্দম ঘোষ	তালপুকুর
কণ্ঠ	আশিস শিকদার	তালপুকুর
বারাকপুর সাগ্নিক	প্রতীক রায়	নোনাচন্দনপুকুর
ঈহা	অর্চন সমাজদার প্রকাশিত	নোনাচন্দনপুকুর
শ্রীপর্ণ	দেবেন বিশ্বাস ও অসিত দত্ত	কালিয়ানিবাস
ইকিড়মিকিড়	দেবাশিস বসু	পাতুলিয়া
সন্ধানী	নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	বারাকপুর
একক	স্বপন ঘোষ	বারাকপুর
রূপক	বিক্রমজিৎ সেন	বারাকপুর
কলাম	রাজদ্বীপ ভট্টাচার্য	বারাকপুর
কস্তুরী	জয়ন্তকুমার সাহা	বারাকপুর
কলি ও কমল	অনিরুদ্ধ দাস	বারাকপুর
তত্ত্বমসি	স্বামী নিত্যানন্দ	বারাকপুর
গান্ধী সংবাদ	ড. সুপ্রিয় মুন্সী	বারাকপুর রিভারসাইড
বকমবকম	বিপ্রতীপ দে	সোদপুর
আলোকধারা	চম্পক দেবনাথ	সোদপুর
অবেক্ষণ	রাধু গোস্বামী	সোদপুর
নীলিমা	সেখ সদরউদ্দিন	সোদপুর
আগামী প্রজন্ম	হারাধন ভট্টাচার্য	পাণিহাটি
আবার এলাম	স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়	পাণিহাটি
আজকের সংলাপ	রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় সঞ্জয় অধিকারী	আগরপাড়া
অরণি	অনির্বাণ ঘোষ প্রতীম কোয়াল	আগরপাড়া
ইস্ক্রা	প্রগতি মাইতি	আগরপাড়া
আলোচনা চক্র	চিরঞ্জীব শূর	বেলঘরিয়া
চিত্রক	পার্থপ্রিয় বসু	দমদম পার্ক

লোকায়ত	দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়	দমদম
সূর্যোদয়ের পথে	অঞ্জলি দাস	আড়িয়াদহ
বলাকা	ধনঞ্জয় ঘোষাল	আড়িয়াদহ
এই সহস্রধারা	শংকর রায়	বরানগর
বাক	সুজয় ভট্টাচার্য	বরানগর
উপাংশু	শ্যামলকুমার বিশ্বাস	শ্যামনগর
তৃণাঙ্কুর	গৌরাঙ্গদেব চক্রবর্তী	শ্যামনগর
পাললিক	শামলকুমার বিশ্বাস	শ্যামনগর
উপলব্ধি কথা	কেশবরঞ্জন দে	শ্যামনগর
অবয়ব	রঞ্জিত মালো	শ্যামনগর
ক্রন্দসী	সনৎ বসু	বেলঘরিয়া
দীপাবলী	কৃষ্ণদাস সরকার	হালিশহর
ঋতুপত্র	সমীরণ দাশগুপ্ত	হালিশহর
এখন সংস্কৃতি	বাঁধন সেনগুপ্ত	হালিশহর
পূর্বী	কল্পনা সেন	হালিশহর
অধুনা সাহিত্য	ঋষিকেশ মুখোপাধ্যায়	হালিশহর

ইছাপুর-নবাবগঞ্জ অঞ্চলের পত্র-পত্রিকা

প্রতিচ্ছবি—ভোলা ঘোষ ও পরেশ চক্রবর্তী; টাউনক্লাব— অমর চৌধুরি; সূর্যবীজ—কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী ও অসীম ত্রিবেদি; শহরতলী—নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়; পদাতিক— শ্যামল সাহা; নচিকেতা—উৎপল ত্রিবেদি; নিরীক্ষণ—জয়দেব ভট্টাচার্য; আবহ—রঞ্জিত বণিক, বৈশাখী—উৎপল সরকার; পটভূমি—হিমাংশু দে ও রনজিৎ বণিক, আগামী—জ্যোতিপ্রকাশ সাহা; কুহেলিকা—সুব্রত চট্টোপাধ্যায়; নবাবী—উৎপল সরকার; বিশে একুশে—দীপক জোয়ারদার; মাসিক বিচিত্রা— প্রশান্ত সেনগুপ্ত ও অমর রায়; পথিক— উৎপল ত্রিবেদি; অন্যকলম—-হিমাংশু দে; অন্যভূমি—উৎপল সরকার; কবিতার কাগজ—এককড়ি ভট্টাচার্য।

নিমতার পত্র-পত্রিকা

অতএব ভাবনা—শংকর সরকার; অনুভব—অরুণ ব্যানার্জি; উত্তরণ—অনিমেষ চক্রবর্তী; একা—অধীর ভদ্র; দেবতা বারোমাস—সুভাষ সরকার; কালপত্রী—অমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; তূণীর—অসীম বসাক; বালার্ক—সুধীন বসু; দৃক—অপূর্ব কর, একটুকু—অরুণাভ ভট্টাচার্য; চই চই—জয়ন্ত শূর; মেঘবর্ণ; মেঘমল্লার—শম্ভুনাথ রায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

মণিরামপুর

মণিরামপুরের কথা

উত্তরদিক থেকে বয়ে আসা গঙ্গা 'হুগলী নদী' নাম নিয়ে মণিরামপুরের পশ্চিমদিক স্পর্শ করে, পূর্ব দিকে সামান্য বাঁক নিয়ে দক্ষিণ বরাবর সমুদ্রের দিকে ছুটে চলেছে। হুগলীর জল সোহাগভরে ঘিরে রেখেছে মণিরামপুরকে। জোয়ারের জলে মণিরামপুর গর্বে মাথা তুলে দাঁড়ায়। গর্ব করার কারণ অবশ্যই আছে। এই নদীর তীর ধরে মহাপ্রভু নিমাই ছত্রভোগ হয়ে নীলাচলে গেছেন; চাঁদ সওদাগর গেছেন বাণিজ্য যাত্রায়; ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠবাগ্মী রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ মণিরামপুরকে করে গেছেন তীর্থক্ষেত্র। রাষ্ট্রগুরুর মসি যেমন এই অঞ্চলকে দিয়েছে একমাত্রা, মঙ্গল পাণ্ডের অসি পাশেই ইতিহাস সৃষ্টি করে যুক্ত করেছে ভিন্নমাত্রা। মণিরামপুরকে পূর্ব দিকে স্পর্শ করে আছে মঙ্গল পাণ্ডের ছাউনী শহর।

একবার মণিরামপুরে যে আসে সে আর অন্যত্র যেতে চায় না। স্বাভাবিকভাবেই বসবাসযোগ্য জমি আসছে কমে। জমির দাম বাড়ছে হু হু করে।

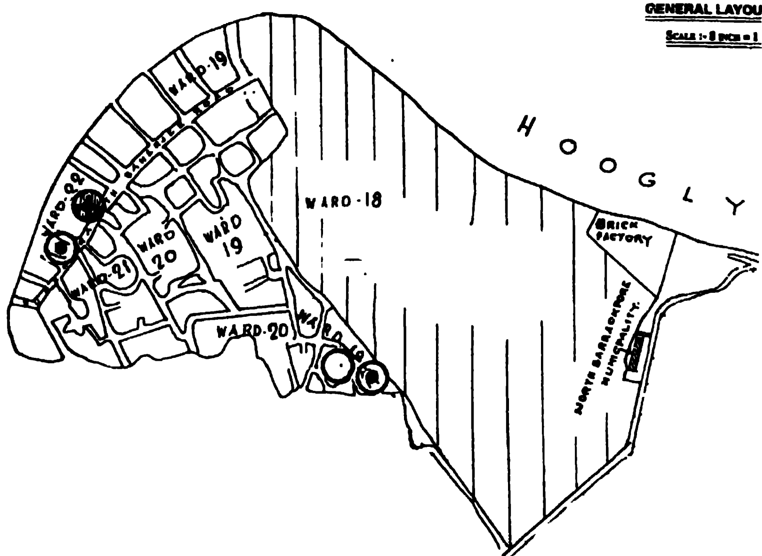


দু'পয়সার ফেরীঘাট। ছবি : অরুণ দাস

গড়ে উঠেছে মিশ্র সংস্কৃতি। বহু পুরানো বাসিন্দা রয়েছে এ অঞ্চলে যদিও নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তাঁরা ব্যাপ্ত। প্রায় ২৫ হাজার লোক বাস করে এ অঞ্চলে। কিন্তু তাদের জন্য নেই কোন স্থায়ী মঞ্চ। এখানে একটা সিনেমা হল, তাও বন্ধ। এত মানুষের বসবাস, তবুও 'নগর পেরিয়ে' ছাড়া কোন সাহিত্য পত্রিকা এখান থেকে প্রকাশ পাচ্ছে না।

দেড় দশকের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে এখানে। পরিবহনে অটো এবং ভটভটি এনেছে নতুন মাত্রা। মুহুর্মুহু চলছে অটো ভটভটি দ্রুত পারাপার করছে যাত্রীদের। ফেরী ঘাটে চালু হয়েছে টিকিট ব্যবস্থা। ফ্যাশনের জোয়ার এসেছে যুবক-যুবতীদের মধ্যে। রাজনৈতিক কর্মীরা নিজেদের জমি তৈরি করতে ব্যস্ত। মণিরামপুরের নাম কিন্তু রয়েছে শান্ত জনপদ হিসাবে। এখানে রাজনীতির তীব্রতা থাকলেও, নেই রাজনৈতিক উগ্রতা।

মণিরামপুরের মানচিত্র



মণিরামপুরের ওয়ার্ড হলো ১৮-২২
সৌজন্য : উত্তর বারাকপুর পুরসভা বুলেটিন।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ এক ঋজু ব্যক্তিত্ব

—কানাইলাল ঘোষ

বারাকপুর চাণকের উত্তরে বাঁকীবাজার, দক্ষিণে জমিদার প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের কাটা খড়দহ খাল পর্যন্ত, পশ্চিমে ভাগীরথী, পূর্বে বর্ত্তী ও নাউই নদী। এই অঞ্চলের মধ্যেই দিগঙ্গ একটি বিশেষ অঞ্চল। এই অঞ্চলে ভারত বিখ্যাত রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে আই সি এস সিভিলিয়ান ছিলেন, কিন্তু ইংরাজ সিভিলিয়ানরা লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও ইংরেজ বিদ্বেষ মানসিকতা রয়েছে। তাই তারা ছলে বলে কৌশলে রাষ্ট্রগুরুকে আই সি এস ক্যাডার থেকে বহিষ্কার করে। তখন তিনি স্থির করলেন বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টারী পড়াশোনা করে আইন ব্যবসায় নামবেন এবং বিলেত যাত্রা করেন। ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য যে আবেদন করেন, ব্রিটিশ সরকার সেই আবেদনকে খারিজ করে দেন— যাকে আই সি এস ক্যাডার থেকে অপসারিত করা হয়েছে, তাকে ব্যারিস্টারি পড়তে দেওয়া হবে না। ফলে সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে ব্রিটিশ বিদ্বেষী অগ্নি প্রজ্বলিত হল। তিনি জাহাজযোগে যখন ভারতে প্রত্যাবর্তন করছেন, বিশাল জাহাজকে মোচার খোলার মত ভাসতে দেখে তিনি ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনাকে অনুভব করলেন। একটি জাহাজকে মোচার খোলের মত নাচতে দেখে মনে হল— কেন তিনি সমগ্র ভারতকে জাগরিত করতে পারবেন না? তখনই সুরেন্দ্রনাথ জাহাজে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, "I shall take part in the public affairs." তারই সুযোগ এসে গেল, কলকাতা থেকে বারাকপুরে এসে।



রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সৌজন্য : 'এ নেশন ইন্ মেকিং' (১৯২৫)

ইংরেজ বণিক, বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীরজাফর ও কয়েকটি জমিদার গোষ্ঠীর চক্রান্তে ভারত বিদেশী ইংরেজদের পদানত হয় ১৭৫৭ জুন মাসে। ঠিক এর শতবর্ষ বাদে ১৮৫৭-র ২৯মার্চ সিপাহী বিপ্লবের অগ্নিশিখা বারাকপুরে উদ্‌গিরণ করেন মঙ্গল পাণ্ডে। তারপর সারা ভারতে ছড়িয়া পড়ে। সেইসময় ভারতব্যাপী এক বিরাট ক্ষত সৃষ্টি করেছিল এবং সাময়িকভাবে ইংরেজ এই বিপ্লবকে স্তব্ধ করেছিল, কিন্তু ক্ষতের জ্বালা কমেনি; পরন্তু ভারতের বিভিন্ন প্রান্তরে খণ্ড-বিক্ষিপ্তভাবে অগ্নি উদ্‌গিরণ হচ্ছিল। পরাধীন অসহায় মানুষের মৃতস্তুপের মধ্যে অর্দ্ধমৃত হস্তপদ ছিন্ন মানুষের ভগ্নপ্রাণ ক্ষতের জ্বালায় ভারতব্যাপী বিশাল যুদ্ধক্ষেত্রের প্রান্তরে প্রান্তরে ক্ষীণ আর্তকণ্ঠ ব্যতীত সবই প্রায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল —এ সকলই সুরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়াল না। সুরেন্দ্রনাথ বীরবিক্রমে যাত্রা শুরু করলেন। নানাস্থানে প্রকাশ্য জনসভা করে তুলে ধরলেন— জাতীয় ঐক্য, ইতিহাসের শিক্ষা, ম্যাৎসনীর জীবনী, শ্রীচৈতন্যের মানবতা ও দেশাত্মবোধ প্রভৃতি।

তাঁর প্রতিটি জনসভায় বিপুল সংখ্যক শিক্ষিতজনের এবং ছাত্রদের বিশাল সমাবেশ ঘটতে লাগল। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ভাবলেন—

- পারস্পরিক যোগাযোগ ও সংগঠন কার্যের সুবিধার জন্যে একটি গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিমূলক সভার একান্ত প্রয়োজন।
- ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েসনের মত ভারতবাসীর জন্য সর্বভারতীয় একটি প্রতিনিধিসভা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

১৮৭৬, ২৬জুলাই ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েসনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের ব্যবস্থা স্থির হল। প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখে এ্যালবার্ট হলে অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আট'শ নিমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন। সুরেন্দ্রনাথের সভায় যোগ দিতে মাত্র দু'মিনিট দেরী হয়ে যায়। এতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েসনের উপস্থিত সদস্যগণ কঠোর সমালোচনায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন।

এইদিন বেলা এগারোটায় কলিকাতা তালতলা গৃহে সুরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র মারা যান। একদিকে জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যু, অপরদিকে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েসনের উদ্বোধন। মৃত পুত্রকে নিমতলার শ্মশানে চিতায় প্রজ্জ্বলিত রেখে জাতিগঠনের কর্তব্য কর্মে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সুরেন্দ্রনাথ সমস্ত সমালোচনাকে ছিন্ন করে যথা সময়ে উদ্বোধন অনুষ্ঠান আনন্দ মোহন বসুর সহায়তায় সম্পূর্ণ করেন। সভার আট'শ প্রতিনিধি সহ কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ জানতে পারলেন না সুরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র তখনও নিমতলার শ্মশান চিতায় প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে। পরের দিন প্রভাতী সংবাদপত্র মারফৎ পুত্রের মৃত্যু, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েসনের সংবাদ প্রচারিত হলে সমস্ত প্রতিনিধি সহ সমগ্র দেশবাসী বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিল।

মহাবৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বলেছিলেন—The contribution of Surendranath Banerjee, the crownning achievement of a national leader—who entered the unknown and the untrodden politics to work for the freedom of India when it was not even in the air.''

সুরেন্দ্রনাথের জীবনকাহিনী কৌতুহলোদ্দীপক উপন্যাস সদৃশ এবং অনন্য সাধারণ একটি সংগ্রামী জীবন। তাঁর বাস্তবধর্মীতা উপন্যাসের জীবনাদর্শকেও অতিক্রম করে গিয়েছে। দুর্গম, সমস্যা জর্জরিত পরিবেশের মধ্যে তাঁর চিন্তাশক্তির অপূর্ব বিকাশ ও স্ফুরণ এবং সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করবার অদ্ভুত ক্ষমতা চিন্তারও অনধিগম্য। প্রতিটি কর্মে আত্মনিয়োগের জন্য প্রয়োগ ব্যবস্থা, কলা-কুশলতা, অসীম ধৈর্য এবং কঠোর পরিশ্রম তাঁর জীবনকে সর্বকালের আদর্শ জীবনে রূপায়িত করেছিল। তিনি পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন কিন্তু সেই পরাজয়ের গ্লানি তাঁকে ব্যথিত কিংবা অভিভূত করতে পারেনি, পরন্তু কর্মশক্তিকে দূর্বার করছিল। উপনিষদের মহাবাণীকে স্মরণ করিয়ে দেয়— ''দুর্বলের দ্বারা আত্মলাভ হয় না''।

১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ ২৬ বৎসরের যুবক মঙ্গলপাণ্ডের নেতৃত্বে বারাকপুরেই সর্ব প্রথম সিপাহী বিপ্লব শুরু হয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে; ১৮৬৫ সালের রাজনারায়ণ বোসের ''স্বাদেশিকতার সভা প্রতিষ্ঠা; ১৮৬৭ সালের ১২ এপ্রিল হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা;
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে সঞ্জীবনী সভার প্রতিষ্ঠা; ফরাসী বিপ্লবের বজ্রকঠোর কণ্ঠস্বর; আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মপ্রচেষ্টা; ম্যাটসিনি, গ্যারিবোল্ডির নেতৃত্বে ইতালীর স্বাধীনতা লাভ; বাঙ্গালীর মনে এক স্বাধীন মহা ভারতের মহাস্বপ্নের সঞ্চার করল। সমগ্র জাতিকে উদ্বেলিত করে তুলল।

এরূপ এক থমথমে দুর্যোগপূর্ণ রাজনৈতিক পটভূমিকায় জাতির শ্রেষ্ঠতম কর্ণধাররূপে সুরেন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটে। বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি জাতিকে পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বরাজ লাভের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করে জাতীয় ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

প্রাদেশিক গণ্ডি ছাড়িয়ে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও কর্মকাণ্ডকে একসূত্রে গেঁথে তুলবার চেষ্টা, ভারতে সর্বপ্রথম সুরেন্দ্রনাথেই সৃষ্টি করেন। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েসন প্রকৃতপক্ষে সেই চেষ্টার সূত্রপাত।

১৮৭৭-এর জানুয়ারী মাসে সুরেন্দ্রনাথ নূতন এক আলোকের সন্ধান লাভ করেন। তিনি ''হিন্দু পেট্রিয়ট''-এর সংবাদদাতারূপে দিল্লীর দরবারে যোগদান করেন। দিল্লীর দরবারে ভারতের বিভিন্ন স্থানের রাজন্যবর্গকে সম্মিলিত হবার অধিকার থাকে, তবে ভারতের অগণিত জনগনের কিম্বা তাদের প্রতিনিধিদের

পক্ষেই বা কেন একত্র সম্মিলিত হওয়া সম্ভবপর হবে না?—সুরেন্দ্রনাথের বুকের মধ্যে দুরন্ত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ আছাড় খেয়ে ফিরতে লাগল। তার সুযোগ এসে উপস্থিত হল।

লর্ড সলস্‌বেরি আই সি এস পরীক্ষার বয়সসীমা ২১ থেকে ২৯ করেন। একে কেন্দ্র করে তিনি একক যাত্রা শুরু করেন কলিকাতা লক্ষ্ণৌ, লাহোর, দিল্লী, বোম্বাই, ট্রিবেনড্রাম (বর্তমান তিরুঅনন্তপুরম্) প্রভৃতি স্থানে। মাদ্রাজ, নাগপুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে একটির পর একটি প্রতিবাদ সভায় তাঁদের অগ্নিময়ী ভাষণ দিতে থাকেন—সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ঝড় উঠল। তাঁর ভাষণ মৃতপ্রায় জাতির চেতনায় প্রবল রক্ত প্রবাহের সৃষ্টি করে তিনি সমগ্র জাতিকে সুদৃঢ় ও কর্মঠ সৈনিক ব্যূহে পরিণত করেন। সলস্‌বেরির চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

সুরেন্দ্রনাথের জয়ে দেশ এক নতুন আশায় জাগরিত হয়ে উঠল। সমগ্র ভারতবাসীর উৎসাহ, কর্মচাঞ্চল্য এবং দেশাত্মবোধকে লক্ষ্য করে সর্বপ্রথম ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি সংগঠনের প্রয়াসকে সম্মুখে রেখে—"বেঙ্গলী" সংবাদপত্রে সম্পাদক হিসাবে একটি প্রস্তাব প্রকাশ করেন।

১৮৮৩, ২এপ্রিল হাইকোর্টের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন। তাকে কেন্দ্র করে হাইকোর্টে বিচারের দিন কয়েক সহস্র বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমাবেশ ঘটে। তার সঙ্গে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রায় দশ হাজার ছাত্রের সমাবেশ ঘটেছিল। তাদের ধাক্কাধাক্কিতে কিছু ভাঙচুরও হয়। সুরেন্দ্রনাথেকে তালতলার গৃহ থেকে হাইকোর্টে আনবার জন্য কামারহাটী থেকে একটি রোলস রয়েজ গাড়ী সংগ্রহ করে বহু ঘোরা পথে হাইকোর্টের পশ্চাতের দরজা দিয়া কোর্টে আনা হয়। এই সময় হাইকোর্টের সমস্ত অলিন্দ, বারান্দা প্রচণ্ডভীড়ে উপচে পড়ে। পথ চলা দায় হয়েছিল। বিচারে সুরেন্দ্রনাথের দু'মাস কারাদণ্ড হয়। এই সংবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্ররা এতই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন যে রাগের চোটে কয়েকটি দরজা-জানালা ভেঙ্গে দেয়। বিচারের পর সুরেন্দ্রনাথকে একই গাড়ীতে বিভিন্ন ঘোরা পথে হরিণবাড়ি জেলে (অধুনা নাম প্রেসিডেন্সি জেল) পৌঁছে দেওয়া হয়। সুরেন্দ্রনাথের মুক্তির দিনেও খুব সকালে সেই একই গাড়ীতে বহু ঘোরা পথে ঘুরে তালতলার গৃহে পৌঁছে দেওয়া হয়।

সেদিন সকাল থেকে প্রতিটি রাজপথে প্রচণ্ড ভিড়ের চাপে যানবাহন চলাচল ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৮৮৩, কারগার থেকে মুক্ত হয়েই তিনি সর্বভারতীয় ন্যাশন্যাল কনফারেন্স আহ্বান করেন, এরপূর্বে তিনি প্রাদেশিক ন্যাশনাল কনফারেন্স কমিটিগুলির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংগঠিত করেন। কলিকাতা এ্যালবার্ট হলে ২৯, ৩০, ৩১ ডিসেম্বর ১৮৮৩ সর্বভারতীয় ন্যাশনাল কনফারেন্সের মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী ভাষণে আনন্দমোহন বসু একটি নতুন ইটের উপর আর একটি ইট রেখে বলেন—

"It was the first stage towards a national parliament"

এই সম্মেলনের পরই পুনরায় সুরেন্দ্রনাথের যাত্রা শুরু হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি হিসাবে সমগ্র ভারত প্রদক্ষিণ ও প্রচার তৎসহ সংগঠনের কাজটিও তিনি সম্পূর্ণ করেন।

একদিকে সুরেন্দ্রনাথের ভারতের দিকে দিকে জয়যাত্রা, অপরদিকে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে বিভিন্ন প্রবন্ধ দ্বারা সমগ্র দেশবাসীকে সচেতন করে তুলছিলেন। রজনীকান্তের 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'; কেশবচন্দ্রের 'রাষ্ট্রবাণী'; স্বামী বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' প্রভৃতি গ্রন্থাদি দেশাত্মবোধকে সুদৃঢ় পটভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠের মধ্যে সুপ্ত বৈপ্লবিক আন্দোলনের ধারায় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বিপ্লবীদের গড়ে তুললেন। মাতৃমন্ত্রে তাদের দীক্ষিত করলেন— কণ্ঠে দিলেন মহাবীজ—"বন্দেমাতরম্"

অমোঘ এই মন্ত্রের নাদ ভারতের প্রান্তরে প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হল সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে। এই মহামন্ত্রে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল ভারতের অতীত ইতিহাস, মানচিত্র, ভূগোল, ভূতত্ত্ব বিদ্যা, এক কথায়, অতীত গৌরবোজ্জ্বল উত্তাল তরঙ্গে বিদেশি ইংরাজ শাসক হাবুডুবু খেতে লাগল। দীর্ঘ আন্দোলন, কারাবরণ ফাঁসীর মঞ্চে জীবন দান, বন্দুকের গুলিতে মায়ের বুকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ— নারীপুরুষ নির্বিশেষে সর্বস্বত্যাগের মন্ত্রে অগ্নিময়ী হয়েছিল। ইংরেজের ডিভাইড এ্যান্ড রুলের বিশ্বব্যাপী বিরাট সাম্রাজ্য ফাটাফাটা হয়ে গেল। ইংরেজের মতিভ্রমে ভারতকে বিভক্ত করে ১৯৪৭ সালের ১৫আগস্ট ভারত থেকে বিদায় নিতে হল।

১৮৪৮, ১০ নভেম্বর যে জীবনের সূচনা হয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল ১৯২৫, ৬ আগস্ট। ভারত ইতিহাসের অমূল্য অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটল বারাকপুরের মাটিতে।

বহু নেতার আগমনে ভিড়ে ভিড়ে ছয়লাপ। গৃহ সম্মুখে গঙ্গারকূলে তাঁর শেষকৃত্য স্থান নির্দিষ্ট হয়। বেদ পাঠ হচ্ছে, চিতায় শায়িত মৃতদেহ। পুত্র ভবশঙ্কর অগ্নি সংযোগের জন্য প্রস্তুত, ভিড়ের মধ্য দিয়ে মরদেহের পাদমূলে দাঁড়িয়ে তাকে স্পর্শ করে উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলাম— "সুরেন্দ্রনাথ আপনি দেশের জন্য সর্বস্বত্যাগ করেছিলেন—আমি আপনাকে স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞাগ্রহণ করছি আমৃত্যু দেশের জন্য এই দেহ উৎসর্গ করলাম।"

পরের দিন প্রভাতি সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকায় 'কিশোরের প্রতিজ্ঞা' নামে সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রকাশিত হল।

সুরেন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণকে কেন্দ্র করে মহাবৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বলেছিলেন—"He was the Pilgrim of Freedom battle, what Ashoke and Akbar dreamt, the Indian National Congress

achieved thrcugh Surendranath.''

১৯২৫, ৬মে বুধবার হঠাৎ মহাত্মা গান্ধী ভারতের জ্ঞানবৃদ্ধ রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে দর্শন করতে বারাকপুরে সুরেন্দ্রনাথের গৃহে আগমন করেন। তদনুযায়ী গান্ধীজী "ইয়ং ইণ্ডিয়ায়" লিখেছিলেন—

'আমি বারাকপুরে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম, আমি শুনেছিলাম তিনি অসুস্থ। বয়সের সঙ্গে লৌহদৃঢ় শরীর ভেঙে পড়েছে। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত হয়েছিলাম। যদিও তিনি আমার কতকগুলি কার্য অনুমোদন করেন না, তবু নব্য বাংলার অন্যতম গঠনকর্তা এবং ভারতের রাজনীতির অন্যতম পালয়িতারূপে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা এতটুকুও হ্রাস পায়নি। এককালে শিক্ষিত ভারতবাসী তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন। এতএব এই কারণে আনন্দের সঙ্গে আমি বারাকপুরে তীর্থযাত্রা করেছিলাম। গঙ্গারতীরে সুরেন্দ্রনাথের প্রাসাদোপম অট্টালিকাখানি অতি মনোহর, চারিদিকের দৃশ্যও অতি সুন্দর। চারিদিক নিস্তব্ধ। জনাকীর্ণ কলকাতা শহরের কর্মব্যস্ততা থেকে প্রত্যহ এই মনোরম স্থানে অবসর ও বিশ্রাম গ্রহণ যে কত তৃপ্তিপ্রদ তা সহজেই বোঝা যায়।'

লেখক পরিচিতি ঃ বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, বারাকপুর সংক্রান্ত তথ্য-সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব

মণিরামপুর, রাষ্ট্রগুরু ও মহাত্মা গান্ধী

—সুপ্রিয় মুন্সী

মণিরামপুর বর্তমানে বারাকপুর শহরের একটি প্রধান অংশ ও জনপদ, এককালে যার নিজস্ব ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল, যার মধ্যে অন্যতম ভারতীয় জাতীয়তার পিতৃপ্রতিম সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধাত্রী হওয়া, দেশবাসী যাঁকে কৃতজ্ঞ চিত্তে 'রাষ্ট্রগুরু' বলে বরণ করে নিয়েছে। মণিরামপুরের আরও একটি কৃতিত্ব আছে—একদিন এই জনপদ রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিগত যোগসূত্র হয়ে উঠেছিল।

একজন রাষ্ট্রগুরু, অপরজন জাতির পিতা। দুজনেই ভারতপথিক। কেবল ভারতীয় ভাবধারা, সংস্কৃতি উভয়কেই পুষ্ট করেনি, ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা, পরাধীনতাজনিত গ্লানি ও কষ্ট উভয়কেই গভীরভাবে বিচলিত করেছিল ও উভয়েই নিজস্ব চিন্তা ও কার্যক্রম অনুযায়ী স্বদেশের মুক্তি ও পুনর্গঠনে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। হয়ত পথ ছিল কিছুটা পৃথক, হয়ত কারও দৃষ্টি ছিল দেশের মধ্যে নিবদ্ধ, কারও ছিল দেশ, কালকে অতিক্রম করে সমগ্র মানবজাতিকে মুক্তির পথ দেখানো। কিন্তু দুজনেই রাজপথ ধরে হেঁটেছিলেন প্রচণ্ড সাহস নিয়ে, কর্তব্য কর্ম যা স্থির করেছেন তার থেকে টলানো যায়নি তাঁদের, ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা সেই কাজে বাধা হয়নি কোনদিন এবং আরব্ধ কার্য সম্পাদনেই যাঁরা ক্ষান্ত হননি। আবার নতুন চিন্তা, কার্যক্রমে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন এবং এই প্রক্রিয়ায় কেউ উপাধি পেয়েছেন 'Surrender not Bannerjee' বলে, কেউ হয়ে উঠেছেন 'মহাত্মা'। তবু পার্থক্য থেকে গেছে একটি জায়গায়—একজন চিরাচরিত পথে হেঁটেছেন, অন্যজনের অভিনবত্ব বিস্ময়কর।

মণিরামপুরে অসুস্থ রাষ্ট্রগুরুকে দেখতে আসার অনেক পূর্বেই অবশ্য সুরেন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর পরিচয় কংগ্রেসের আঙিনায়। কারণ সুরেন্দ্রনাথ যখন মূলতঃ ভারতের অভ্যন্তরে 'স্বদেশী' কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত, গান্ধীজী তখন সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বদেশবাসীগণের মর্যাদা স্থাপনে সংগ্রামে জড়িত এবং কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনেই তাঁদের দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে ও গান্ধীজী তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্দোলনের প্রয়োজনে তদানিন্তন অন্যান্য নেতৃবর্গের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের সমর্থন ও জনমত সংগঠনে তাঁর সাহায্য চেয়েছেন। গান্ধীজীর পুরোপুরিভাবে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই 'বঙ্গভঙ্গ' রোধ করে সুরেন্দ্রনাথ মুকুটহীন রাজা, যদিও অরবিন্দ ঘোষ

(পরবর্তী পর্যায়ে শ্রী অরবিন্দ), লোকমান্য তিলক প্রভৃতি তাঁর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছেন ও নিজেদের চরমপন্থীরূপে চিহ্নিত করেছেন, কারণ সরাসরি ইংরাজদের ভারতত্যাগ বা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছিলেন তাঁরা। সুরেন্দ্রনাথ মহামতি গোখলে প্রভৃতির সহায়তায় তখন ক্রমশঃ স্বাধিকারের প্রশ্নে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রায় আত্মজীবনী 'A Nation in Making'-এ গান্ধীজীর 'Passive Resistance' বা 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ'-এর কথা লিখেছেন সংগ্রামের একটি নতুন হাতিয়ার হিসাবে, যদিও গান্ধীজী 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ'কে দুর্বলের অস্ত্র বলে গণ্য করে 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলনের সূচনা করেছেন—'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির'— যার মূল বক্তব্য। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে দুজনেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ইংরাজদের স্বপক্ষে 'Recruiting Agents'—হয়ত সুরেন্দ্রনাথ বাংলায়, গান্ধীজী ইংলন্ডে, কারণ হয়ত তাঁরা তখনও ইংরাজ রাজত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ নন, হয়ত তাঁদের মনে হয়েছিল এর দ্বারা দেশবাসী বিদেশি সরকারের কাছ থেকে কিছু বদান্যতা লাভ করতে পারে। উভয়ের উভয়ের প্রতি আকর্ষণের গভীরতা এই সময়েই লক্ষ্য করা যায়। ১৯১৫ সালের ১৫ মার্চ কলিকাতা পুরসভা যখন গান্ধীজীকে আরও একবার সম্বর্ধনা জানালো সেই সভায় সুরেন্দ্রনাথ বললেন যে, "শ্রী গান্ধীর নাম ইতিহাসের পাতায় চিরকালের মত স্থান পাবে।"

পরবর্তী পর্যায়ে সুরেন্দ্রনাথ গান্ধীজীর পথ অনেকটাই ভিন্ন। তবু ঘটনার অগ্রগতির দিকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখেননি সুরেন্দ্রনাথ। ১৯২২ সালে 'অসহযোগ আন্দোলন' যখন তুঙ্গে, চৌরিচৌরার ঘটনায় বিচলিত গান্ধীজী আন্দোলনের রাশ টানায় অনেকের সঙ্গে তিনিও ক্ষুব্ধ। তারপবে গান্ধীজীর কারাবাস ও অসুস্থতার কারণে বছর দুই বাদে মুক্তি।

এরপরে মণিরামপুর। অসুস্থ রাষ্ট্রগুরুকে তাঁর বাড়িতে দেখতে এলেন মহাত্মা ১৯২৫ সালের ৬ মে। অভিভূত সুরেন্দ্রনাথ আবার আসার জন্যে অনুরোধ করলেন গান্ধীজীকে। গান্ধীজীও স্বীকৃত হলেন। তাঁর এই মণিরামপুর যাত্রাকে 'তীর্থযাত্রা' আখ্যা দিয়েছেন গান্ধীজী। তাঁর সম্পাদিত 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকার ১৪ই মে সংখ্যায় রাষ্ট্রগুরুকে 'Sage of Barrakpore' আখ্যা দিয়ে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন মহাত্মা। লিখলেন—"আমি শুনেছিলাম তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ও বয়স তাঁর লৌহ সদৃশ শরীরের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্যে আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলাম.... আমি জানি একটি সময় ছিল যখন ভারতীয় যুব সম্প্রদায় তাঁর কথা আগ্রহ সহকারে শুনতো।..."

গান্ধীজী আরও লিখলেন যে রাষ্ট্রগুরুর বাড়ি অট্টালিকা সদৃশ, গঙ্গার তীরে সুন্দর পরিবেশে অবস্থিত। আর মণিরামপুরের এই বাড়ির আকর্ষণ এতই গভীর যে শেষ ট্রেনেও সুরেন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরে আসেন। তাঁর নব্বই বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচার আকাঙ্ক্ষা ছিল বলে গান্ধীজী উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ এই সাক্ষাতের মাত্র মাস তিনেক বাদেই ৬ আগস্ট, ১৯২৫ তারিখে তাঁর মণিরামপুর বাসভবনে দেহরক্ষা করেন। গান্ধীজী রাষ্ট্রগুরুকে কথা দিয়েছিলেন বলে মণিরামপুর তাঁর পুনর্বার আগমনের সাক্ষী হয় ৭ আগস্ট ১৯২৫ তারিখে। এবার সঙ্গে ছিলেন বন্ধু 'দীনবন্ধু' চার্লি এন্ড্রুজ। ফিরে গিয়ে শোকাহত গান্ধীজী তাঁর ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় ১৩ই আগস্টের সংখ্যায় সুরেন্দ্রনাথকে 'Lion of Bengal' বা 'বাঙ্গলার সিংহ' আখ্যা দিয়ে একটি দীর্ঘ প্রশস্তি লিখলেন। সেটি রাষ্ট্রগুরুর সারা জীবনব্যাপী কর্মযজ্ঞের গভীর প্রশংসনীয় মূল্যায়ণ।

গান্ধীজী এর পরে বারাকপুরে এসেছেন। কিন্তু মণিরামপুরে আর নয়।

লেখক পরিচিতি : কঃ বিঃ, বিদ্যাঃ বিঃ এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সাম্মানিক অধ্যাপক, গবেষক এবং বর্তমানে বারাকপুর গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়ের সম্পাদক

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কিত ১৯০৯ সালের ট্রাস্ট্ দলিলের অনুলিপি

ANNEX -'A'

TRUST DEED.

THIS INDENTURE made this 15 day of January in the year of Christ one thousand nine hundred and nine between Babu Surendranath Banerjee son of Dr. Durga Charan Banerjee, deceased at Manirampur Barrackpor, Brahmin, Land holder of the one part. The Hon'ble Dr. Rash Behari Ghosh son of Jagabandhu Ghosh, deceased of No. 46, Theatre Road, Calcutta, Kayastha, Vakeel, High Court, the Hon'ble Mr. Satyendra Prasad Sinha, son of Siti Kantha Sinha, deceased, Kayastha, Bar-at-law, Babu Baikunthanath Sen, son of Hari Mohan Sen deceased of Saidebad, Barhampur, Dr. Upendranath Mukherjee, son of Satceurie Mukherjee, deceased, of

No. 55, Mirzapur Street, Calcutta, Brahmin, Medical practitioner, Mr. Ashutosh Chaudhuri and Mr. Jogesh Chaudhuri sons of Durgadash Chowdhury, deceased both of Ballygunge, Calcutta, Brahmin, Bar-at-Law, Babu Bhupendranath Basu, son of Ram Ratan Basu, deceased of No.14, Balaram Ghosh's Street, Calcutta, Kayastha, Attorney-at-Law and the said Surendranath Banerjee and Babu Ramendra Sunder Trivedi, son of Gobinda Sunder Trivedi, deceased of No. 8, Madhusudan Gupta's lane, Calcutta, principal of the college, known as the Ripon college hereinafter collectively referred to as the trustee of the other part, whereas the said Surendranath Banerjee is the absolute owner of the educational Institution, known as the Ripon college including the law department and the Ripon School, at present located at No.60, Mirzapur Street in the town of Calcutta and of all the furniture, fittings, laboratory, library and other appurtenances thereof, valued at Rupees twenty thousand and is the present lessee of the said premises, and whereas with the object of placing the said institutions, the on a permanent footing and covering them into public institutions, the proprietor has thought it desirable to divert himself of all private rights of property he has over the said institutions and vesting them in the trustees. Now this Indenture witnesseth that for the purpose of carrying out his intention, the said Surendranath Banerjee doth hereby grant and assign into the Trustees, their heirs, executors, adminstrators and representatives, all that the good will of the educational institution, known as the Ripon School, at present located at No.60, Mirzapur Street and the benefits of the lease under which the said premises are at present held by the proprietor, together with furniture fittings, books, maps, libraries. Laboratories and instruments and all other appurtenances, held and used with the said Institution valued at Rupees twenty thousand together with advance now remaining un-adjusted viz, Rs. five thousand and five hundred made to the land-lord of the said premises and all the right title, interest, claim and demand whatsoever to him the proprietor in and to the same, to hold the same upto and to the use of the trustees so that the same may

effectively vest in the trustees and they do stand seized and possessed there of upon the following trusts, viz. upon trust to collect fees from students and to pay the rents, rates, taxes and other outwoing payable in respect thereof and carry on the said institutions in such manner and under such conditions and for such purposes as to the said trustee may seem meet and for the purposes aforesaid to incur such expenditure as they may deem proper and to hold and invest the surplus and apply the same in such way as the trustee think desirable and the trustees shall have the power from time to time to appoint one of themselves or someone engaged on the staff of the college with or without remuneration at the discretion of the trustees to guide and supervise subject to the control of the trustees the work of the said college and school and the trustees shall also have the power from time to time to remove such officer and appointed some other in his place and it is hereby agreed and declared that the trustees will have the benefit of the advance of the said premises No.60, Mirzapur Street, and to set off the rent against such advance in the .... the proprietor is entitled to .lo, And the trustees shall have full power to amalgamate the said college or school or associate them in any particular branches of study therein with any other college or school in or near calcutta and carry on the work of education as a joint college or school with such other college or in Association therewith and at their discretion to withdraw from such amalgamation or discover such assosiation. And it is further declared that the trustees will have the sole financial control and management of the said institutions and will exercise all the power and privileges which as owners of the property they can legitimately exercise and it is herby expressly declared that on the death or retirement of Babu Ramendra Sundar Trivedi the present principal his successor in office as the principal of the said institution shall be in trustee in his place, and further that on the death or retirement Babu Surendranath Banerjee it shall be lawful for him by deed to appoint his successor and the successor to appointed and the person for the time being representing the office

of trustee now held by the proprietor will have the power of appointment. And it is hereby further declared that on the death, retirement or incapacity to act of any of the other trustees or his going abroad for more than trustee in the place of the trustee so dying or retiring becoming incapable to act or going to reside abroad as aforesaid and upon every such appointment the trust premises shall become vested in the new trustees and every such new trustee shall have all the powers and authorities of the trustees in whose place he shall be substituted.

In witness where of the said parties to these presents have hereunto set and subscribe their respective hands and seals the day signed, sealed and delivered, and year first above written.

Signed, sealed and delivered

Sd/- Surendranath Banerjee.
Sd/- Satyendra Prasanna Sinha.
Sd/- Upendranath Mukherjee.
Sd/- Jogesh Chandra Chaudhuri

Sd/- Rashbehari Ghosh.
Sd/-Baikuntha Nath Sen.
Sd/- Asutosh Chowdhury.
Sd/-Bhupendranath Basu.
Sd/-Ramendra Sundar Trivedi.

Attested true copy

Registered

In Book...............1

Volume................41

page.......................49-54

Being No..............1199

For 1909.

Sd/- J.M. Banerjee
Deputy Secy. 19.2.1909
Board of Trustees.

সৌজন্য ঃ মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ সংগ্রহালয়

বিড়ম্বিত অথচ গৌরবান্বিত সুরেন্দ্রনাথ

আনন্দপ্রসাদ রায়

৩ মার্চ, ১৮৬৮ সাল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংল্যাণ্ড যাত্রার দিন। তিনি সেখানে গিয়ে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আই. সি. এস.) পরীক্ষায় বসবেন। এ বিষয়ে অন্যতম প্রস্তাবক ও উদ্যোগী ছিলেন তাঁরই শিক্ষক অধ্যক্ষ জন সাইম। একই উদ্দেশ্যে আর দুই সহযোগী বন্ধু হলেন রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত। সেকালে ভারতীয়দের সমুদ্র পাড়ি দেওয়ায় সমাজচ্যুতির বিড়ম্বনা ছিল—ছিল ব্যয়ভার বহনের প্রতিবন্ধকতাও। সে সময় সবে ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরেছেন মনোমোহন ঘোষ। যাত্রার আগের রাতে তিন বন্ধুই উঠেছিলেন শ্রী ঘোষের বাড়িতে। ভোরবেলা চাঁদপাল ঘাট থেকে তাঁরা স্টীমারে চড়লেন। শেষপর্বে সুরেন্দ্রনাথের বিদেশযাত্রার কথা তাঁর মাকে জানানো হলে তিনি সে সংবাদে মূর্ছা যান। পিতা দুর্গাচরণও সজল নয়নে পুত্রকে চাঁদপাল ঘাট থেকে বিদায় জানান। পাঁচটি সপ্তাহ কাটে স্টীমারে। লণ্ডনে উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। ১৮৬৯ সালে তাঁরা আই সি এস পরীক্ষায় সফলকাম হলেন।

এবার বিড়ম্বনা দেখা দিল সুরেন্দ্রনাথের বয়স নিয়ে। তখন প্রতিযোগীদের বয়স ১৯ বছরের বেশি ও ২১ বছরের কম থাকার নিয়ম বলবৎ ছিল। কিন্তু সফলকাম প্রতিযোগীদের তালিকা থেকে সুরেন্দ্রনাথের নাম তারা বাদ দেন—তাঁর নাকি ২১ বছর বয়স অতিক্রান্ত হয়েছে—এই অজুহাত। ১৮৬৩ সালের ম্যাট্রিকুলেশনের সার্টিফিকেটে তাঁর বয়স ১৬ বছর দেখানো হয়েছিল। কোন কোন ভারতীয়ের সন্তান যে দিন থেকে মাতৃগর্ভে আসে সেদিন থেকে তার বয়স ধরা হয়। কিন্তু ইংরেজদের নিয়ম অনুসারে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার দিন থেকে বয়সের হিসাব করা হয়। সেই হিসেবে ম্যাট্রিকুলেশনে তাঁর বয়স হওয়া উচিত ১৫ বছর। সুরেন্দ্রনাথ তখন এর প্রতিকারকল্পে 'কুইন্স বেঞ্চ'-এ আবেদন করেন। দু-জন বিখ্যাত আইনবিদ্ মিঃ জে ডি বেল ও মিঃ তারকনাথ পালিতকে নিযুক্ত করেন। শেষপর্যন্ত আই সি এস-এ মনোনীত নামের তালিকায় তাঁর নাম স্থান পায়। এটা সম্ভবপর হয়েছিল তাঁর দৃঢ় ও অনমনীয় মানসিকতার জন্য। এই পরম আনন্দমুহূর্তে তাঁর কাছে চরম বিয়োগান্ত সংবাদ আসে যে তাঁর পিতা ১৮৭০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গত হয়েছেন। কে ভেবেছিল ১৮৬৮ সালের ৩ মার্চের দেখাই যে তাঁর শেষ পিতৃদর্শন হবে! ১৮৭১ সালের আগস্ট মাসে তাঁরা ভারতের মাটিয়ে পা রাখলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

পর এঁরাই আই সি এস-এ দ্বিতীয় সফলকামী দল। সেদিন ভারতে এঁদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থাপকদের মধ্যে ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত মহামানুষজন।

এবার কর্মজীবনে প্রবেশ করেই এক বিড়ম্বনার শিকার হলেন। শ্রীহট্টের ম্যাজিস্ট্রেট তখন এইচ সি সাদারল্যাণ্ড। তাঁর অধীনে একজন ভারতীয় সুরেন্দ্রনাথ সহকারী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পান। মিঃ সাদারল্যাণ্ড একজন ভারতীয় সহকর্মীর ও একজন ইংরেজ সহকর্মীর সম সুযোগসুবিধা ভোগ সহ্য করতে পারছিলেন না। সুরেন্দ্রনাথ বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, কিন্তু অন্য একজন ইংরেজ সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট পোয়াসফোর্ড ব্যর্থকাম হলেন। এতেও সাদারল্যাণ্ড ক্ষুব্ধ। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। সুযোগও ধরা দিল। যুধিষ্ঠির নামে এক চুরির অপরাধীকে পেশকারের কথার ফেরার বলে ঘোষণাপত্রে সুরেন্দ্রনাথ সহি করেন; যদিও সে ফেরার হয়নি। এই প্রয়োগগত বিচ্যুতির অপরাধের অভিযোগ আনেন ম্যাজিস্ট্রেট সাদারল্যাণ্ড এবং তাঁকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। এখানে মনে রাখা দরকার অফিসারদের ছোটখাটো অনেক ব্যাপারেই পেশকারদের উপর নির্ভর করতেই হয়।

সচেতন, তীক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন, উৎসাহী, প্রখর ও অগ্নিবৎ সুরেন্দ্রনাথ আত্মসমর্পণ কাকে বলে জানতেন না। তাইতো তাকে বলা হোত 'মিঃ সারেণ্ডার নট।'' পরে ইউরোপীয়ান অফিসারই এই বিচারকে 'শয়তানী বিচার' বলে আখ্যাত করেন। যে ইংরেজ সরকার তাঁকে সিভিল সার্ভিস থেকে বরখাস্ত করেছিল, সেই সরকারই আট বছর অবৈতনিক প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট এবং জাস্টিস অব দি পীস হিসেবে নিযুক্ত করেন।

এক বিড়ম্বনা কাটিয়ে উঠতে না উঠতে আরেক বিড়ম্বনা এসে তাঁকে আলিঙ্গন করে। তিনি ''মিড্ল টেম্পল''-এ আইন পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ১৮৭৫ সালে ব্যারিস্টার হবেন। ঠিক সে সময় বাদ সাধলেন আদালতের লোকেরা। তারা সিভিল সার্ভিস থেকে বিতাড়িত হওয়া ব্যক্তিকে ব্যারিস্টার হিসেবে গ্রহণ করতে আপত্তি জানালেন। এই সময় রামগোপাল সান্যাল তাঁর 'A General Biography of Bengal Celebrities' গ্রন্থে সুরেন্দ্রনাথের আই সি এস থেকে বরখাস্ত হওয়াকে এইভাবে লিখলেন, '' ... unfortunate for the government, and fortunate for the country.'' আর সি ওয়াই চিন্তামনি তাঁর 'Indian Politics Since Mutiny' গ্রন্থে উল্লেখ করলেন, 'while the state lost, the country gained.'

এবার দেখব সুরেন্দ্রনাথের সংবাদপত্রের সম্পাদক হিসাবে বিড়ম্বনা ও খ্যাতির দিক। ১৮৭৯ সালে সুরেন্দ্রনাথ 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদক হলেন। সম্পাদক হিসেবে স্বাধীন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক নব ধারার সৃষ্টি করেন। তাঁর হাতে পত্রিকাটি ১৯০৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। একটি ঘটনা ঃ কলকাতা

হাইকোর্টের বিচারক মিঃ নরিস একটা হিন্দু দেবমূর্তি শালগ্রাম শিলা আদালতে হাজির করতে নির্দেশ দেন। এ জাতীয় আদেশ নজিরবিহীন। দেবমূর্তি এতই পবিত্র যে তাকে আদালতে আনয়নের প্রশ্নই অবান্তর। সুরেন্দ্রনাথ সম্পাদকীয় নিবন্ধে মন্তব্য করেন যে মিঃ নরিস দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারক হবার আযোগ্য। সাথে সাথে সুরেন্দ্রনাথকে আদালত অবমাননার দায়ে সোপার্দ করা হয়। ফলত মানহানির মামলা। ডব্লু সি ব্যানার্জির পরামর্শক্রমে সুরেন্দ্রনাথের ক্ষমা চাওয়া সত্ত্বেও পাঁচজন বিচারপতির একটা ফুল বেঞ্চতাঁকে দু মাসের কারাবাসের আদেশ দেন। তিনি ১৮৮৩ সালের ৫ মে থেকে ৪ জুলাই প্রেসিডেন্সি জেলে কাটান। ব্রিটিশদের কাগজ স্টেটসম্যানও এই শাস্তির বিরুদ্ধে কলম ধরেছিল। যোগেশচন্দ্র বাগলের 'History of Indian Association' গ্রন্থে আনন্দমোহন বসুর (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারির) মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ "বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তত একটা সান্ত্বনা ছিল—তাঁর দুর্ভাগ্য বিভিন্ন ভারতীয় জাতির মধ্যে ঐক্যভাব, যার জন্য তিনি কাজ করে যাচ্ছিলেন তা বেশ উল্লেখযোগ্যভাবে জাগরিত করল এবং তা বৃথা হল না।" ১৮৮৩ সালের ৪ জুলাই সুরেন্দ্রনাথের কারাগার ছাড়া পাবার দিনে জেল চত্বরে তাঁকে বিজয় সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে যে বিপুল সমাগম ঘটবে তাতে আইন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা আঁচ করে কর্তৃপক্ষ ভোর চারটের সময় তাঁকে জাগিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে করে সকাল হবার আগেই 'বেঙ্গলী' অফিসে পৌঁছে দেয়। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সুরেন্দ্রনাথের কারাবাসের জন্যে দেশবাসী যে দাগা পেয়েছিল তাতে ব্যাপক ও গভীর জাতীয় ঐক্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ডঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ বলেন, "একজন সাংবাদিক হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ 'বেঙ্গলী' কাগজকে চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পাদনা করেন। ... সম্পাদক হিসেবে তিনি তাঁর বৃত্তি, পদ এবং সম্মানকে অনেক উঁচুতে তুলে ধরলেন। ..." মার্গারিটা বার্ণস 'ইণ্ডিয়ান প্রেস'-এ উল্লেখ করেন, "বেঙ্গলী কলমে ভারতীয় মতামত ভাষা পেয়েছিল, এটি সম্পাদনা করেন প্রতিভাবান সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি; যাঁকে অন্য অনেক কীর্তির মধ্যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতার জন্য স্মরণ করা হয়।"

১৮৭৫ সাল। সুরেন্দ্রনাথের জীবনে বড় দুঃসময়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেট্রেপলিটন ইনস্টিটিউশন-এ (১৮৭৫-১৮৮০) ইংরেজি ভাষার অধ্যাপকের কাজ দিয়ে সাহায্য করেন। মাস মাইনে ২০০ টাকা। ত্রিপুরার রাজা তাঁকে মাসে ৭০০ টাকার বেতনে ইংরেজি সেক্রেটারি নিয়োগ করতে চাইলেন। তিনি তা ধন্যবাদের সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। ১৮৮০ থেকে ১৮৮৫ পর্যন্ত তিনি ফ্রি চার্চ কলেজে (বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ) ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। এর সাথে ১৮৮২ সালে প্রেসিডেন্সি ইনস্টিটিউশন-এ পড়ান। এই স্কুলই ডিগ্রি কলেজের (রিপন কলেজ) মর্যাদা পায়—বর্তমানে যার নাম সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। তিনি ১৮৮৫ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত এই কলেজের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৮৭৫ থেকে ১৯১৩

পর্যন্ত ৩৭ বছর সুরেন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে শিক্ষকতা করেন। তাঁর বাণীই ছিল, "আমি ছাত্রদের ভালবাসি।" তিনি আরও বলেন, "আমি আমার শক্তি অনুযায়ী সমস্ত রকম উপায়ে তরুণদের জনচেতনা এবং দেশপ্রেমের আবেগ জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করতাম—যার ফলে তাদের নিজেরও মঙ্গল এবং মাতৃভূমিরও মঙ্গল হয়।" (এ নেশন ইন মেকিং)

১৮৭৬ সালের ২৬ জুলাই ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রচেষ্টায় সুরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগিদ্বয় হলেন আনন্দমোহন বসু ও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী। সুরেন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানের হয়ে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ভ্রমণ করেন এবং এই ভ্রমণ ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রথম সর্বভারতীয় চেষ্টা। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের বক্তব্য স্মরণীয়, "This Propaganda tour of Surendranath constituted a definite landmark in the history of India's Political regeneration. For the first time there emerges the idea of India as a political unit." (সুরেন্দ্রনাথের এই প্রচার অভিযান ভারতের রাজনৈতিক পুনর্গঠনের একটি নিশ্চিত সীমারেখা বলে নির্দেশিত। এই প্রথম একটা রাজনৈতিক ঐক্য হিসেবে ভারতীয় ধারণার আবির্ভাব)।

সুরেন্দ্রনাথ বুদ্ধিতে এত ধারালো, ধারণায় এত সূক্ষ্ম, বাগ্মিতায় এত প্ররোচক, ভাবনায় এত সার্বজনীন, দেশপ্রীতির আগ্রহে এত সচেতন ছিলেন যে জনসাধারণ তাঁকে 'বাংলার মুকুটহীন সম্রাট' বলতে দ্বিধান্বিত হত না। তাঁর মৃত্যুর পর 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকা (সেপ্টেম্বর/১৯২৫), মন্তব্য করে, "ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের লক্ষ্য সম্পর্কে ভারতবর্ষের আর কোন রাজনৈতিক নেতা এত বেশি বলেননি, লেখেন নি।" মাতৃভূমির সেবা করাকে তিনি মনে করতেন, "সবচেয়ে বড় ধর্ম।" গান্ধীজি স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে মন্তব্যে বলেন, "আধুনিক ভারতকে যারা রূপ দিয়েছেন তাঁদের একজন।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'লোকনায়ক' আখ্যায় আখ্যাত করেন। আর সর্ব সাধারণের কাছে তো তিনি 'রাষ্ট্রগুরু'। তাঁর পুত্রের মৃত্যুর পর সেই শোকের মধ্যেও তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভায় বক্তৃতা দেন। ১৯১১ সালের ২৩ ডিসেম্বর তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়, কিন্তু তিনি ২৬ ডিসেম্বর কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেন এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। দুবার কংগ্রেসের সভাপতি হন—১৮৯৫ সালে পুণায় ও ১৯০২ সালে আহমেদাবাদে।

'নবভারতস্রষ্টা ঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়' গ্রন্থে সুনীল কুমার বসু মন্তব্য করেন ঃ "সুরেন্দ্রনাথের চরিত্রে কোন কলুষতা ছিল না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দয়ালু এবং হৃদয়বান ছিলেন। নিজের ছিল গভীর ধর্মবিশ্বাস, আর অন্যের জন্য ছিল মানবিক সহানুভূতি।...... যদিও তিনি বিলিতি সংস্কৃতি এবং সভ্যতার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তবুও তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আচারে-ব্যবহারে পোষাকে

ভারতীয় ছিলেন। তিনি সময়নিষ্ঠ ছিলেন। বেশি বয়সেও তিনি নিয়মিত ব্যায়াম করেছেন। বীরত্বে, মহান চরিত্রে, আত্মদানে, প্রচণ্ড স্বদেশী আবেগে, ধর্মপ্রচারের মত আত্মত্যাগে এবং গঠনমূলক ক্ষমতায় তাঁর চাইতে বড় কম লোকই ছিলেন।" (পৃঃ ১৯২, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৪। প্রকাশন বিভাগ ঃ তথ্য ও বেতার মন্ত্রক, ভারত সরকার)।

এই সুরেন্দ্রনাথই কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের ও কলকাতা করপোরেশনের সক্রিয় সদস্য হয়েছিলেন, হয়েছিলেন উঃ বারাকপুর পৌরসভার পৌরপিতা। জাতীয় জাগরণে ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা, হিন্দু-মুসলমানকে ঐক্যে উৎসাহিত করা, নীচু তলায় মানুষকে আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করা, স্বায়ত্ত শাসনলাভে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া 'ভারতসভা'র রাষ্ট্রীয় মঞ্চের বাস্তবায়ন করা, কলকাতা করপোরেশনের স্বায়ত্ত শাসন প্রসারণের আইন বিধিবদ্ধকরণে এবং তার ফসল হিসেবে প্রথম নির্বাচনেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে মেয়র হিসেবে পাওয়া, একক জাতীয়তাবাদের গ্রন্থ উপহার দেওয়া, একাদিক্রমে পঞ্চাশ বছর যাবৎ ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে চালানোর বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করা— এ সবের উদ্গাতা স্বয়ং রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাইতো রমেশচন্দ্র দত্ত যথার্থই বলেছিলেন, "সুরেন, ভারতের রাজনীতিতে তোমার সমকক্ষ কেউ আছেন বলে আমার বিশ্বাস হয় না।"

সেই দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতা সৈনিক সুরেন্দ্রনাথ, সম্পাদক ও শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ, সংগঠন ও আইনবিদ তথা বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ ১৮৪৮ সালের ১০ নভেম্বর কলকাতায় তালতলা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তাঁদের আদিবাড়ি ছিল বারাকপুরের নিকটবর্তীগ্রাম মণিরামপুরে—বর্তমানে সে বাড়িটি ওখানকার মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়কে দেয়া হয়েছে। তাঁর মাতা জগদম্বা দেবী ও পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথ এঁদের দ্বিতীয় সন্তান। ১৯১৫ সালে তাঁর স্মৃতিকথা 'এ নেশন ইন মেকিং' লিখতে শুরু করেন, কিন্তু নানা প্রতিকূলতায় লেখায় প্রতিবন্ধকতা আসে। ১৯২৩ সালে নির্বাচনে স্বরাজ্য দলের বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে সুরেন্দ্রনাথ নির্বাচন-যুদ্ধে পরাজিত হবার পর জনজীবন থেকে অবসর নেন। বারাকপুরের বাড়িতে বসে পুনরায় 'স্মৃতিকথা' লেখায় হাত দেন এবং ১৯২৫ সালে এটি প্রকাশ পায়। আর ১৯২৫ সালের ৬ আগস্ট রাত দেড়টায় তাঁর বিড়ম্বিত অথচ গৌরবদীপ্ত উজ্জ্বল জীবনের অবসান ঘটে। তাঁর মৃত্যুতে 'অমৃতবাজার পত্রিকা লিখেছিল, "The father of Indian Nationalist passes away." এই মহান ব্যক্তিত্বকে আমরা আজ বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে দিতে বসেছি—তাই মনে বড় দুঃখ হয়, বুকে বড় ব্যথা হয়।

লেখক পরিচিতি ঃ প্রতিষ্ঠিত প্রাবন্ধিক

মহাত্মা গান্ধীর লেখনীতে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

[মহাত্মা গান্ধী রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে 'বারাকপুরের মহাজ্ঞানী' এবং 'বাংলার সিংহ' বলে উল্লেখ করেছেন, যদিও তাদের মধ্যে দেখা যেত মতানৈক্য]

Bengal Notes

The Sage of Barrackpore

Young India Edited by ***M.K.Gandhi***

Vol-VII Ahmedabad Thursday May 14 1925 No.-20

I was privileged to visit Sir Surendranath Bannerjea at his residence at Barrackpore. I had heard that he was ailing and the age has told upon his steel frame. I was anxious, therefore, to pay my respects to him. Though he might not approve of some of my activities my regard for him as a maker of Modern Bengal and a Nestor of Indian politics has not suffered any diminution. I remember the time when educated India hung on his lips. It was therefore with great joy that I approached the pilgrimage to Barrackpore. Sir Surendra has a magnificent mansion situated on the river bank among beautiful surroundings. All around there is great quiet. One can understand what a great relief it must have been to him to be able everyday to retire to this pleasant retreat after the daily toil in crowded Calcutta. I expected to see him lying in bed weak and care worn. Instead, I found myself in the presence of a man standing erect from his seat to greet me affectionately and talking to me with the buoyancy of youth. He told me in the course of our conversation that his memory was still as green as ever. He could paint, he told me, the scenes of his childhood. The Reminiscences that have just been published, he wrote during the past nine years. He showed me with justifiable pride the whole of his beautiful

manuscript. It is all written methodically in clear bold hand with a steady pen, Sir Surendranath is now 77 years old, but he has like Pandit Malaviyaji faith in himself. He said, "I have given myself ninety-one years. And I hope to be able to retain my present energy till then. When I inquired what he was reading, he told me he was revising his reminiscences as he expected to publish a second edition inside of a year. He takes a lively interest in everything that passes around him. He has taken from me a promise to meet again before I leave Bengal. 'I must come to you, if you can not find the time to run up to Barrackpore' he said. 'I will not think of putting you to that trouble. I will make time to come again without fail' I replied. Sir Surendranath owes his vitality to his unfailingly regular habits. Nothing could keep him over night in Calcutta. It might almost be said that he never missed his last train for Barrackpore. This regularity. he would say, was as necessary for the service of India as strenuous work itself.

Bengal Notes

The Lion of Bengal

Young India Edited by ***M.K.Gandhi***

Vol-VII Ahmedabad Thursday August 13 1925 No.-33

The death of Sir Surendranath Bannerjee removes from Indian political life one who has left upon it the deep impress of his own personality. What though with new ideals and new hopes within recent times he receded into the background? Our present is the result of our past. Ideals and aspirations of the present day would have been impossible without the invaluable work

done by pioneers like Sir Surendra. Time was when the student world idolized him, when his advice was considered indispensable in all national deliberations, and his elogvence held audiences spell-bound. It is impossible to recall the stirring events of the partition days in Bengal and not to think with gratitude and pride of Sir Surendranath's matchless services in connection with it. It was then that sir Surendranath justly earned from his grateful countrymen the title of "Surrender-not". During the blackest period of the time of partition Sir Surendranath never wavered, never lost hope. He threw himself into the agitation with all his might. His enthusiaism infected the whole of Bengal. His determination to unsettle the 'settle fact' was unshaken. He gave us the necessary training in courage and resolution. He taught us not to fear authority. His work in the Education Department was not less valuable than in the political. Through the Ripon College thousands of young men came under his direct influence and received their liberal education. His regular habits gave him health, vigour, and, what may be called for India, a long life. He retained his mental faculties unimpaired upto the last moment. It required a courage of no small order to resume in his seventy seventh year the editorship of his paper the Bengalee. Indeed he was so confident of his mental vigour & physical capacity, that he said to me, when I has the privilege of meeting him at Barrackpore two months ago, that he expected to live till 91 years, after which he would not wish to live as he would not retain his mental vigour long there after. But fates had decided otherwise. They snatched him away from us without notice. For nobody had expected so sudden a death upto the early hours of the morning of Thursday the 6th instant he betrayed no sign of dissolution. But though he is no longer with us in the body his services to the country will never be forgotten. He will ever be remembered as one of the makers of modern India.

Courtesy Barackpore Gandhi Museum

রাষ্ট্রগুরুর বাড়ি এবং রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউট্

—— স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

■ রাষ্ট্রগুরুর বাড়ি

বারাকপুরে মিস্ত্রিঘাটের মোড় থেকে যে পাকা রাস্তা সোজা মণিরামপুরের দিকে চলে গেছে। এটি ফিশারী গেট পর্যন্ত বিস্তৃত। পোষাকী নাম এস. এন. ব্যানার্জি রোড। রাষ্ট্রগুরুর নামাংকিত। এই রাস্তা ধরে পশ্চিমদিকে ২/৩ মিনিট হাঁটলেই চোখে পড়বে সাহানা সংগীত বিদ্যালয়ের প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড রাস্তার বাঁ দিকে এবং ডানদিকে আছে পি ডব্লু ডি-র সিমেন্টের একটি ফলক। আরও মিনিট ৩/৪ হাঁটলে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে একটা প্রকান্ড বাড়ি সহজেই পথিকের নজর কাড়ে এই রাস্তারই বাঁদিকে। এটি বালিঘাট বাসস্টপ। এলাকায় এই বাড়িটি 'সিভিল ডিফেন্স' নামে সমধিক পরিচিত এবং আদৃত। হ্যাঁ—এই বাড়িটিই রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি।

গঙ্গার পাড় ঘেঁষে প্রায় বিঘে দশেক জমির ওপর এই বাড়িটি অবস্থিত। বাড়িটির চারপাশে ঘিরেই উঁচু পাঁচিল। ভিতরে এক সময় ছিল বিরাট বাগান। বাগানে ছিল কত রকমের ফল ও ফুলের গাছ। বাগানের মাঝখানে পুকুরের বাঁধানো ঘাটটি এখন নজর এড়ায় না। বিরাট এই দোতলা বাড়িটির আকৃতি অনেকটাই ইংরেজি 'L' (এল) অক্ষরের মতই। কাঠের এবং লোহার সিঁড়ি। দক্ষিণ-পশ্চিমে খোলা। ওপরে এবং নীচে প্রশস্ত বারান্দা। বাড়িতে ঢোকার মুখেই প্রকান্ড গেটটি লৌহ নির্মিত। রাষ্ট্রগুরুর এই বাড়িটি সম্পর্কে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী তাঁর বিখ্যাত পত্রিকা 'YOUNG INDIA' (May 14, 1925) সংখ্যায় লিখেছিলেন— 'Sir Surendra has a magnificent mansion situated on the river bank among beautiful surroundings. All around there is great quite. One can understand what a great relief it must have been to him to be able every day to retire to this pleasant retreat after the daily toil in crowded Calcutta.' বাড়িটি 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়' যেন।

এই খোলামেলা প্রাকৃতিক পরিবেশেই রাষ্ট্রগুরুর ছেলেবেলার বেশ কিছুটা সময় কেটেছে। আবার পরিণত বয়সেও এই বাড়িটিই ছিল তাঁর প্রধান আবাসস্থল,

সেই ১৮৮০ সাল থেকে। বাড়িটিতে কোথাও তার স্মৃতিচিহ্ন ধরে রাখা নেই। সুতরাং বাইরে থেকে বোঝাও খুব দুরূহ। এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের অনেকেই জানেন না বাড়ির মালিকের নাম। জানানোর কোন চেষ্টাও নেই। গঙ্গার দিকের পাঁচিলের গায়েই রাষ্ট্রগুরুর চিতাভস্মের উপর শ্বেতপাথরের স্মৃতিফলকে মুদ্রিত আছে তাঁর জন্ম ১৮৪৮ সালের ১০ নভেম্বর এবং মৃত্যু ১৯২৫ সালের ৬ আগষ্ট।

রাষ্ট্রগুরুর 'A Nation in Making' গ্রন্থে এই বাড়িটির সম্পর্কে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিছু কথা। সেই সময় বাংলা দেশে একবার ভয়ংকর ভূমিকম্পে বহু জীবনহানি এবং সম্পত্তিহানি ঘটে। তিনি লিখেছিলেন—'এই সময়টা ছিল মহরমের সময়। মহরমের সময় সেই ভূমিকম্প হয়। আমার বাড়ির ছেলেমেয়েরা সব মহরমের খেলা দেখতে যাচ্ছিল। তাই তারা খোলা জায়গায় ছিল। ফলে তাদের কোন অনিষ্ট হয় নি। আমার স্ত্রী ছিলেন বাড়িতে একা। তিনি তাড়াতাড়ি করে ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে চলে গেলেন। আমার গৃহে একটা ফাটলের সৃষ্টি হয়। কিন্তু কোনও গুরুতর ক্ষতি হয়নি। '

'A Nation in Making' গ্রন্থটি থেকে আরও জানা যায় ১৮৯৮ সালে বারাকপুরে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডঃ সুরেশচন্দ্র সরকারকে তিন জন ইউরোপীয়ান সৈনিক হত্যা করে। বারাকপুর স্টেশনের কাছেই ছিল তাঁর ডিস্‌পেন্সারি। তখন ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন চার্লস অ্যালেন। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রগুরুর ব্যক্তিগত বন্ধু। রাষ্ট্রগুরু লিখেছেন—'মিঃ অ্যালেন আমার বারাকপুরের বাড়িতে আমার সংগে দেখা করতেও গিয়েছেন।' পরে অবশ্য সেই হত্যার ঘটনার জল অনেক দূর গড়িয়েছিল।

ইতিহাসের বহু ঘটনার সাক্ষী হয়ে এই বাড়িটি আজও দাঁড়িয়ে আছে বারাকপুরের মণিরামপুরের বুকেই। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মহান ব্যক্তিত্বের এই আবাসস্থলে, মহাত্মা গান্ধী ছাড়াও আরও কত বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বের পদচিহ্ন আঁকা রয়েছে কে জানে!

সম্প্রতি বাড়িটিতে মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছে রাষ্ট্রগুরু সংগ্রহশালা এবং নেতাজী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

■ রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউট্

গ্রন্থাগারের ভূমিকা মানবসভ্যতার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থাগারে গ্রন্থের মধ্যেই থাকে বিভিন্ন যুগে অসংখ্য মানুষের চিন্তাভাবনার ফসল। প্রাচীনকালে গ্রন্থাগারগুলি, বিদ্বৎসমাজের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। সাধারণ মানুষ গ্রন্থ পাঠের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকতেন। কিন্তু আধুনিককালে গ্রন্থাগারগুলি

সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। 'গ্রন্থাগার' সম্পর্কে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— 'মহাসমুদ্রের শতবৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া পারিত যে, সে ঘুমন্ত শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই গ্রন্থাগারের তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলো কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন তুষারের মধ্যে যেমন কত শত বন্যা বাঁধা পড়িয়া আছে, তেমনি এই পুস্তকাগারের মধ্যে মানব-হৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।'

বারাকপুরে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ নামাঙ্কিত গ্রন্থাগারটি মণিরামপুরে গঙ্গার ধারেই প্রায় কাঠা তিনেক জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। এখানে প্রবেশের মুখেই রাষ্ট্রগুরুর আবক্ষ মূর্তি। দোতলা বাড়ি। এর পোশাকী নাম 'রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউট্'। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত এই মহকুমা গ্রন্থগারটি স্থাপিত হয়েছিল ১৯২৮ সালে এই মণিরামপুরেই অন্যত্র। পরে স্থানান্তরিত হয়ে আসে বর্তমানের যে জমিতে বাড়িটি নির্মিত। সেই জমির কিয়দংশ দান করেন মণিরামপুরস্থ জনৈক যদুনাথ সাধুখাঁ'র বংশধরগণ। এই ভবনটির উদ্বোধন করেছিলেন জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী বেল্লারী সামহা কেশবন। সময়টা ছিল ১৩৬২ সালের ২৮ জ্যৈষ্ঠ।

গ্রন্থাগারের কর্মীসংখ্যা বর্তমানে চারজন। এদের মধ্যে দু'জন গ্রন্থাগারিকও আছেন। এখানে সদস্য হতে গেলে প্রথমেই ফরম কেনার জন্য তিন টাকা এবং ভর্তির জন্য আটত্রিশ টাকা অর্থাৎ মোট একচল্লিশ টাকা দিতে হয়। এছাড়া মাসে মাসে চাঁদা তো আছেই। তথ্যটি জানালেন এই গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকা শ্রীমতি প্রণতি চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীমতি সুগন্ধা মুখোপাধ্যায়। শিশুদের জন্য আছে আলাদা বিভাগ। তবে তাদের সদস্য পদ দেওয়া হয় একেবারেই বিনামূল্যে। এই বিভাগটি কেবলমাত্র প্রতি বুধবার খোলা থাকে। খোলা রাখার সময়টা হলো বিকেল সাড়ে চারটা থেকে ছটা পর্যন্ত। সাধারণভাবে এই গ্রন্থাগারটি খোলা রাখা হয় প্রত্যহ দুপুর একটা থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত। সরকারি ছুটি ছাড়াও মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার এবং প্রতি রবিবার গ্রন্থাগারের সব বিভাগই বন্ধ থাকে।

বাড়িটির দোতলায় আছে একটি অডিটোরিয়াম 'রবীন্দ্র স্মরণী'। এটির দ্বার-উদঘাটন করেছিলেন পণ্ডিতপ্রবর শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয় ৮ চৈত্র ১৩৭০ সালে, যদিও এর শুভ সূচনা হয়েছিল ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮ সাল। নামমাত্র মূল্যে ভাড়া দিতে কোন বাধা নেই, তবে অবশ্যই গ্রন্থাগারের কিছু নিয়মনীতি মেনে নিয়ে। মূলতঃ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীতার কথা ভেবেই এই ব্যবস্থা চালু আছে।

গ্রন্থাগারটিকে দেখভাল করবার জন্য একটি পরিচালন সমিতি আছে। এখানে মোট বইয়ের সংখ্যা ১৮ হাজারের মতো। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, ভ্রমণ ছাড়াও বেশকিছু রেফারেন্স বইও আছে। রেলের সময়সারণী, পঞ্জিকাও পাঠকের প্রয়োজনের কথা ভেবেই রাখা হয়েছে! ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যবই উপযুক্ত মূল্যে জমা রেখে বাড়ির জন্য দেওয়া হয়, তবে রেফারেন্স বই গৃহপাঠ্য নয়। গ্রন্থাগারের একদিকে আছে রিডিংরুম (পড়ার ঘর)। পাঠক মনে করলে এখানে বসে পত্র-পত্রিকা নিয়মিত পড়তে পারেন। কোনও বিধি-নিষেধ নেই। প্রায় সবকটি দৈনিকই (বাংলা-ইরেজি) এখানে রাখা হয়। এছাড়া মাসিক পত্রিকাও বেশ কিছু নিয়মিত রাখা হয়। পাঠকের জন্য বেতার ও দূরদর্শনের ব্যবস্থা আছে। লোডশেডিং হলে আলোর বিকল্প ব্যবস্থা আছে।

গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা প্রায় ছ'শয়ের মতো। আজীবন সদস্য আছেন সাতচল্লিশ জন। বই-পত্রাদি রাখার মতো ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, পরিসরের অভাব ইত্যাদি সমস্যাগুলি বেশ প্রকট। এই গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকা শ্রীমতি প্রণতি চট্টোপাধ্যায়। বর্তমান সম্পাদক সত্যরঞ্জন চ্যাটার্জি।



রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউট। ছবি : রঘুনন্দন দে।

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ইন্‌স্টিটিউট্ এবং সেকালের মণিরামপুর

—— শিবধন মুখোপাধ্যায়

১৯১২ সালে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে ঁশৈলেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, শ্রী নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, ঁঅক্ষয়কুমার মিত্র, সাব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ঁসুরেন্দ্রনাথ ঘোয, ঁঅমূল্য ব্যানার্জী, শ্রীতুলসী ব্যানার্জী, ঁসূর্য্য চক্রবর্তী, ঁনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ঁসুধীরনাথ ভট্টাচার্য, ঁভোলানাথ চক্রবর্তী, ঁসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ঁভোলানাথ নন্দী, ঁশম্ভুনাথ নন্দী প্রমুখ কয়েকজন ব্যক্তির উৎসাহে "বারাকপুর লাইব্রেরীর" সূত্রপাত হয়। —১৯২২ সালে বারাকপুর ইভ্‌নিং ক্লাবের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বারাকপুর লাইব্রেরী তার পাঠাগারের কার্যক্রমের সঙ্গে সমান তালে বিবিধ নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করতে থাকে। সুরেন্দ্রনাথের তিরোধানের পর ১৯২৮ সালে তাঁর স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত হয়ে এই প্রতিষ্ঠানের নব রূপায়ণ হয়। জন্ম হ'ল স্যার সুরেন্দ্রনাথ ইন্‌স্টিটিউটের। সেদিনের পর আজ আমরা দেখতে পাই, সুরেন্দ্রনাথের মণিরামপুর, তার বার্দ্ধক্যের বারাণসী, যে ভূমি তাঁর পবিত্র চিতাভস্ম বহন করেছে, সেই মণিরামপুরে সুরেন্দ্রনাথের নাম সোচ্চারে ঘোষণা করে এসেছে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান, এই "সুরেন্দ্রনাথ পাঠাগার"।

একটি ভাড়া নেওয়া ঘরে, স্থানীয় অধিবাসীদের বদান্যতায় ও উদ্যোক্তাগনের সাগ্রহ চেষ্টায় প্রথম পথ চলতে শুরু করল স্যার সুরেন্দ্রনাথ ইন্‌স্টিটিউট্। শুরুতে এর পাঠাগার বিভাগটি ছাড়াও এর সঙ্গে যুক্ত ছিল একটি নাট্যবিভাগ ও বিবিধ ঘরোয়া খেলাধূলা ও বিনোদন বিভাগ। একটি সামাজিক মিলনকেন্দ্ররূপেই এর প্রথম আত্মপ্রকাশ। পুস্তক, আসবাব ও বিবিধ উপকরণের বেশীর ভাগই সংগৃহীত। পরাধীনতার যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এখনকার মত সরকারী অর্থানুকূল্য আশা করা যেত না। সুতরাং তখন যাঁরা এই ইন্‌স্টিটিউটের প্রদীপটি নিভে যেতে দেননি, নানা সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সবার উপর পাঠাগারটির সুষ্ঠ পরিচালনার মাধ্যমে একে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, তাঁদের সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

অন্তবর্তীকালে পাঠাগারের নিজস্ব গৃহ নির্মাণের চেষ্টা হ'য়ে থাকলেও তা সার্থক রূপ নিতে পারে নি। পাঠাগারের নিজস্ব গৃহ সমস্যা প্রবল হয়ে দেখা দিল যখন গৃহস্বামীর প্রয়োজনে পাঠাগার গৃহটি ছেড়ে দেওয়ার প্রয়োজন হল। সেদিনের পাঠাগার কর্তৃপক্ষের অক্লান্ত চেষ্টায় এবং স্থানীয় সাধুখাঁ গোষ্ঠীর বদান্যতায় বর্তমান

গৃহের স্থানে এক জীর্ণ, পুরাতন ও পরিত্যক্ত গৃহে আশ্রয় পেল।

তার পরের ইতিহাস এক নিরন্তর প্রচেষ্টা, প্রতিজ্ঞা ও দৃঢ় সংগ্রামের। ইন্‌স্টিটিউট্‌ কর্তৃপক্ষের কঠোর পরিশ্রম, স্থানীয় জনসাধারণের যথাসাধ্য দান ও আংশিক সরকারী অর্থ সাহায্যে পুরাতন জীর্ণ গৃহটির স্থানে গড়ে উঠল ইন্‌স্টিটিউটের নূতন গৃহ—একটি প্রশস্ত কক্ষ। এর সঙ্গে যুক্ত হল বিগত রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর প্রতিজ্ঞা "রবীন্দ্র স্মরণী"। পাঠাগারের পরিচালন বিভাগ বিবিধ উদ্যোগের মধ্য দিয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে পাঠাগার গৃহের দ্বিতলে সুরম্য কক্ষ "রবীন্দ্র স্মরণী" নির্মাণ সমাধা করলেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। পাঠাগারটির পরিকল্পিত ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন জাতীয় পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক মাননীয় শ্রীবেল্লারী সামন্না কেশবন মহাশয়। "রবীন্দ্র স্মরণী"র উদ্বোধন করেন পণ্ডিত প্রবর শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহোদয়।

স্বর্গীয় মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় আমাদের আবেদনের প্রত্যুত্তরে সাহায্যের আশ্বাস দিলেও আর্থিক সাহায্য তখনই পাওয়া গেল না! কিন্তু তাঁর নির্দেশনায় সরকারী সহযোগিতার হাত এগিয়ে এল অন্য এক রূপে। সেখানেই শুরু হল এই পাঠাগারের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে এক নব পর্যায়। সরকারী শিক্ষা বিভাগের পরিকল্পনায় আমাদের এই পাঠাগারটি মহকুমা পাঠাগারের মর্যাদা পেল।

কিন্তু এই পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে দাঁড়াল দুটি প্রধান বাধা—দুটি সরকারি শর্ত। পাঠাগার কর্তৃপক্ষকে সংগ্রহ করতে হবে ন্যূনপক্ষে চার কাঠা জমি ও এর অতিরিক্ত ৬,৫০০ টাকা। পাঠাগার কর্তৃপক্ষের কাছে পরিকল্পনাটি এক দিকে যেমন নিয়ে এল নতুন আলোর সংবাদ তেমনই শর্তগুলি হয়ে দাঁড়াল প্রধান বাধা ও দুশ্চিন্তার ক্ষেত্র। কর্তৃপক্ষ অনলস চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন জমি ও অর্থ সংগ্রহের কাজে। অবশেষে পাঠাগার কর্তৃপক্ষের সনির্বন্ধ অনুরোধে প্রবীণ বিদ্যোৎসাহী ও সুরেন্দ্রনাথ কলেজের আইন বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রী সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় পাঠাগার সংলগ্ন তাঁর জমির কিছু অংশ পাঠাগারকে বিক্রয় করতে সম্মত হলেন। সভ্যগণের ও স্থানীয় জনসাধারণের সাক্রিয় সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় অর্থও সংগৃহীত হল। জমি ও অর্থের প্রয়োজনীয় মাত্রা পূর্ণ হওয়ায় প্রতিশ্রুত সরকারী অর্থসাহায্য পাওয়ার পথে আর কোন বাধা রইল না। নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় শুরু হল নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ।

■ সেকালের মণিরামপুর

এক মনোরম পরিবেশে মণিরামপুর গ্রামটি অবস্থিত। এর একদিকে আছে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার পবিত্র স্রোতধারা অর্থাৎ পশ্চিম দিক, উত্তরে আছে পলতা জলকল-কলকাতার জনসাধারণের প্রাণদায়ী জলসরবরাহ হয় যেখান থেকে; দক্ষিণ

এবং পূর্বদিকে আছে বারাকপুর সৈন্যাবাস বা বারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট। ব্রিটিশ শাসনকালে বারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট শহরটিকে কর্তৃপক্ষ একটি সুন্দর ও ত্রুটিহীন পরিচ্ছন্ন শহর হিসাবে গড়ে তুলেছিল। এখানে একটি মার্কেট কমপ্লেক্স ছিল, ছিল পিচ বাধানো রাস্তা, জলের কল এবং বিজলী বাতি। লাগোয়া মণিরামপুর গ্রামটি ছিল নিতান্তই গণ্ডগ্রাম। কাঁচা রাস্তা, বর্ষাকালে অগম্য হত, অন্ধকার রাতে জোনাকিরা আলো দিত, শিয়ালেরা প্রহর ঘোষণা করত নিষ্ঠাভরে প্রতি রাতে।

মণিরামপুরের বেশির ভাগ রাস্তাই ছিল কাঁচা; কিছু রাস্তা খোয়া বিছানো, নর্দমা কাঁচা, বৈদ্যুতিক আলো ছিল না। খাটা পায়খানা, আর আনুষঙ্গিক মলবাহকদের দেখা যেত রোজ সকালে আঢাকা মল ভাণ্ড মাথায় নিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে দুর্গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে, ছিল না জলের কল, রাস্তা দেখাশোনার ব্যবস্থাও। গ্রামের একটি মাত্র রাস্তা ছিল বাঁধানো। সেটি বারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে মণিরামপুরের পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গার ধার বরাবর চলে গিয়ে পলতা জলকল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বাঁধানো বলতে পিচ নয়, রাস্তাটি ছিল পাথর ও খোয়া দিয়ে বাঁধানো।

এই রাস্তারই প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রাসাদোপম বাড়ি বানিয়ে ছিলেন নিজের বসবাসের জন্য। সারা মণিরামপুরে একমাত্র এই বাড়িতে বৈদ্যুতিক আলো ছিল এবং মনে হয় উনি নিজের খরচে এই বৈদ্যুতিক সংযোগ নিয়েছিলেন। তাঁর পৈত্রিক বাড়ি ছিল কলিকাতার পটল ডাঙ্গায়, যেখান থেকে এসে তিনি এখানে বাস করতে থাকেন। গঙ্গার ধারে কয়েক বিঘা জমির উপর এই সুরম্য প্রাসাদের পিছনে একটি সুন্দর ফোয়ারা সমন্বিত ফল ও ফুলের বাগান তিনি সযত্নে বানিয়েছিলেন। বাড়িটির গায়েও ছিল নানা কারুকাজ, তেমনি ছিল তার রঙের বাহার।

এই বাড়ি থেকেই রাষ্ট্রগুরু তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সকল কার্যক্রম পরিচালিত করতেন। তাঁর বিশিষ্ট রাজনৈতিক বন্ধুরা এবং বিখ্যাত নেতারা এই বাড়িতে আসতেন। মহাত্মা গান্ধী এই বাড়িতে এসেছিলেন।

সে সময় মণিরামপুরের লোক সংখ্যা ছিল খুবই অল্প। কয়েকটি বড় বড় পরিবার এখানে বাস করত। তাদের বাসগৃহ সংলগ্ন বড় বড় ফলের বাগিচা ছিল। আম, জাম, তেঁতুল, কাঁঠাল, বেল, কয়েদবেল, ফলসা, গাব, চালতা, নারিকেল ইত্যাদি সুপরিচিত প্রায় সব রকম ফলের এবং নানারকম ফুলেরও গাছের দেখা পাওয়া যেত সে সব বাগানে। গ্রামটি প্রধানতঃ কয়েকটি পাড়ায় বিভক্ত ছিল যেমন—ঘটক পাড়া, গয়লা পাড়া, জেলে পাড়া (বর্তমানে দাস পাড়া), চৌধুরি পাড়া, বেনে পাড়া, মিস্ত্রী ঘাট, সাধুখাঁ পাড়া বা কলু পাড়া, সন্দলপুর, ঘোষ পাড়া, দে পাড়া, ধিতাড়া, আড়গোড়া, কামারপাড়া ইত্যাদি। গঙ্গার স্নানের ঘাটগুলি ঘাট সংলগ্ন বা নিকটবর্তী পাড়ার নামে পরিচিত ছিল। যেমন দে পাড়ার ঘাট,

ঘোষপাড়ার ঘাট, ঘটক পাড়ার ঘাট, দাস পাড়ার ঘাট, মিস্ত্রী ঘাট ইত্যাদি। গ্রামের একেবারে উত্তর সীমানায় এবং পলতা জলকলের দক্ষিণে একটি ফেরী ঘাট বা জন সাধারণের গঙ্গা পারাপারের ঘাট ছিল, যার নাম ছিল নিমাই তীর্থ ফেরী ঘাট। এই ঘাটের অপর পাড়ে বৈদ্যবাটী শহর অবস্থিত। আমরা বাল্যাবধি শুনে আসছি, একদা এই ঘাটে পরমপূজ্যপাদ মহাপ্রভু নিমাই এসেছিলেন। তিনি এই ঘাট দিয়ে গঙ্গা পার হয়ে তারকেশ্বরে শিব দর্শনে গিয়েছিলেন পদব্রজে। সেই থেকে এইঘাটের নাম নিমাই তীর্থ ফেরী ঘাট। নামটি বৈদ্যবাটী ও উত্তর বারাকপুর এই দুটি পৌর সভার নথিতে উল্লিখিত আছে। ফেরী ঘাটটি বর্তমানে ঘোষপাড়া ঘাটে স্থানান্তরিত হয়েছে, দুই পয়সার ঘাট নামে পরিচিত।

১৮৬৮ সালে কলিকাতা করপোরেশন কলিকাতার নাগরিকদের পরিশ্রুত জল সরবরাহের জন্য এখানে গঙ্গার ধারে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে জল শোধনের জন্য একটি জল শোধনাগার স্থাপন করে যা পলতা ওয়াটার ওয়ার্কস নামে পরিচিত। এই জল কল স্থাপনের জন্য সরকার অধিগ্রহণ আইন বলে ধিতাড়া, দে পাড়া, চৌধুরী পাড়া, ঘোষ পাড়া ইত্যাদি পাড়াগুলি ও সংলগ্ন ক্ষেত, বাগান ইত্যাদি অধিগ্রহণ করে এবং এখানকার অধিবাসীরা তাদের জমি ও বাড়ির উপযুক্ত দাম পেয়ে অন্যত্র গিয়ে বসবাস করতে থাকেন।

এই পলতা জলকলের লাগোয়া বড় রাস্তার দুপাশে কয়েক ঘর মুসলমানের বাস আছে। এখানে একটি ছোট মসজিদও আছে। এদের মধ্যে একটি পরিবারের অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল ছিল এবং পরিবারের কর্তাটি বিশেষ ধর্মপ্রাণ ছিলেন। তাঁর নিজস্ব উদ্যোগে সে তাঁর সময়ে এই অঞ্চলে মুসলমান পরবে বিশেষ ধুমধাম হত। বিশেষ করে মহরমের সময় এখানে বাইরে থেকে অনেক তাজিয়া আসত এবং লঠি, ছোরার খেলা হত। এখন অবশ্য কিছুই হয় না।

দু'পয়সা ঘাটের কাছে ৮১ নং বাস টার্মিনাসের কাছে বহুদিন ধরে ধর্মীয় মানুষদের চাহিদা মিটিয়ে আসছে 'হরিসভা'। কিছুদিন বন্ধ থাকার পর এর পুনরুজ্জীবন ঘটেছে।

ঁচন্দ্রমোহন সা প্রতিষ্ঠিত ঁমদনমোহন জিউ ঠাকুর বাড়িতে রাস পূর্ণিমা উপলক্ষে আগে প্রচুর ধুমধাম হত। পূজায় অন্ন ভোগ দেওয়া হত এবং প্রসাদ পেতে প্রচুর জন সমাগম হত। এছাড়া তখনকার দিনের নাম করা যাত্রা দলকে টাকা দিয়ে আনা হত। সঙ্গে স্থানীয় মদন মোহন যাত্রা দল, যা স্থানীয় নাট্যামোদী যুবকদের দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল। এরাও ২/৩ রাত অভিনয় করার সুযোগ পেত। এখন আর অবশ্য তত জাঁকজমক নেই। তবু উৎসব হয়, কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়।

মণিরামপুরের প্রত্যন্ত উত্তর পূর্বদিকে যে পাড়াটি অবস্থিত, তার নাম নয়াপল্লী। এখানে একটি পুলিশ ফাঁড়ি বসানো হয়েছে। সারা মণিরামপুর গ্রামের আর

কোথাও কর্তৃপক্ষ ফাঁড়ি বসানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি।

মণিরামপুরের দক্ষিণাংশের শেষে আড়গোড়া নামে একটি পাড়া ছিল। এটির বৈশিষ্ট্য হল, এখানে প্রায় সব বাড়ির খোলার চাল ছিল এবং এখানে বাস করত প্রধানত মুসলমান সম্প্রদায়, যাদের প্রধান জীবিকা ছিল ঘোড়ার গাড়ি চালান। মনে পড়ে ছোটবেলায় এখানে প্রচুর ঘোড়া ও তার গাড়ি দেখেছি। সে সময়ে এখনকার মত এত সাইকেল রিক্সা, অটো ইত্যাদি এবং বাস ও ট্যাক্সির প্রাচুর্য ছিল না। সাধারণ মানুষের যাতায়াতের অবশ্যই কাছাকাছি কোথাও যেতে হলে প্রধান ভরসা ছিল এই ঘোড়ার গাড়ি। এখন আর সেখানে একটিও ঘোড়া কিম্বা তার গাড়ি দেখা যায় না। এ অঞ্চলে আরো একপ্রকার পশুটানা গাড়ির বহুল প্রচলন ছিল—তাহল গরুর গাড়ি। ভারী এবং বেশি জিনিষপত্র আনা নেওয়া করতে তখন মানুষের প্রধান ভরসা ছিল গরুর গাড়ি। এ ছাড়া গঙ্গায় ছিল আড়াইশো মণী, তিনশো মণী, হাজার মণী বড় বড় নৌকা। পাল উড়িয়ে দাঁড় টেনে এই সব নৌকা দূর দূর অঞ্চলে মাল বহন করে নিয়ে যেত। তখন স্টিমারে টানা গাদা-বোটের বহরও আমরা দেখতাম জোয়ারের সময়। গঙ্গায় তখন জলও ছিল বেশি এখনকার তুলনায়। কোথায় হারিয়ে গেল সেসব দিনগুলো।

লেখক পরিচিতি ঃ উত্তর বারাকপুর পৌরসভার প্রাক্তন পৌরপ্রধান। বর্তমানে ১৯নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর

○ আধ্যাত্মিক চেতনায় মণিরামপুর

(ক) মণিরামপুর কপালেশ্বর

(ক-গ, সংগৃহীত)

■ বিস্মৃতির গর্ভে কপালেশ্বর ঃ

"কোথা হাট কোথা ঘাট
কোথা ঘর কোথা বাট,
মুখর দিনের কলকথা,
অন্তরের বাণী আনে
সর্বাঙ্গে সকল প্রাণে
বৈরাগ্যের স্তব্ধ ব্যাকুলতা।"

কপালেশ্বর আজ এক বিস্মৃত অধ্যায়। আজকের প্রজন্মের অনেকেই কপালেশ্বরের নাম পর্যন্ত শোনেনি। অথচ একটা সময় ছিল যখন বহু মানুষের সমাগম হত এখানে। বহু গুণীজন এখানে রেখে গেছে তাদের স্পর্শ। পলতা জলকল সম্প্রসারিত হয়ে 'কপালেশ্বর' নামটিকে সরিয়ে দিয়েছে অতীতের গর্ভে। পলতা জলকলের ভিতরে কয়লা রাখা জেটীর কাছে যে ভূমিখন্ড, সেই স্থানটিই ছিল কপালেশ্বর। একশ বছর আগে এই স্থানটির বর্ণনা পাই—"স্থানটি তরুলতা সমাচ্ছন্ন, সম্মুখে পূতসলিলা ভাগীরথী,—তপোবনের ন্যায় মনোরম। ভূমির মধ্যভাগে অশ্বত্থ, বট, বিল্ব প্রভৃতি বৃক্ষ মিলিত হইয়া পঞ্চবটী রচনা করিয়া রাখিয়াছিল।"

কপালেশ্বর প্রসঙ্গে শ্রী সুব্রতাপুরী দেবী "দুর্গামা" গ্রন্থে লিখেছেন "কপালেশ্বরের প্রসঙ্গে শ্রীমৎ যতীন্দ্র রামানুজাচার্য মহারাজ প্রবর্তিত "উজ্জীবন" পত্রিকায় (চৈত্র, ১৩৭৪) শ্রীকানাই ঘোষ "রাঢ়বঙ্গের তিন ঠাকুর ও শ্রীধাম খড়দহ" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত ভক্ত কাশীশ্বর পন্ডিতের ভাগিনেয় রুদ্ররাম ব্রহ্মচারীর সাধনায় খড়দহের শ্রীশ্যামসুন্দর জীউ, সাঞীবনের শ্রীনন্দদুলালজীউ এবং শ্রীরামপুরের শ্রীরাধাবল্লভজীউর শ্রীমূর্তিত্রয় ঐ কপালেশ্বরেই জগন্মাতার নির্দেশে দেবভাস্কর দ্বারা নির্মিত হয়। তিনি আরও লিখিয়াছেন, "এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ... যেস্থানে দেবমূর্তিত্রয় নির্মিত হইয়াছিল এবং রুদ্র যেস্থানে জগজ্জননীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করিয়াছিলেন, সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া পরবর্তী সময়ে উক্ত পবিত্র স্থানে, বারাকপুর মণিরামপুরের কপালেশ্বরের সাধক (কপালেশ্বরতলা বর্তমানে পলতা জলকলের মধ্যে অবস্থিত) সাগর আচার্য সস্ত্রীক তথায় আগমন করিয়া জগজ্জননীর উদ্দেশ্যে ঘট স্থাপনা করিয়া মাতৃসাধনায় আত্মনিবেদন করেন। একদিন অতি প্রত্যুষে

আচার্যদেব পুষ্পচয়নের জন্য গমন করিলে এই সময় পণ্যাটি (পণ্যহাটী বা পাণিহাটী) অঞ্চলের এক শাঁখারি আসিয়া আচার্যদেবের স্ত্রীর নিকট তাঁহার কন্যার শাঁখা পরিবার জন্য মূল্য প্রার্থনা করেন। শাঁখারির কথায় তিনি বিস্মিত হন। ইতিমধ্যে আচার্যদেব কুটীরে আগমন করিয়া শাঁখারির নিকট জানিতে পারেন গঙ্গার দহের নিকট তাঁহার কন্যা শাঁখা পরিয়া জলকেলি করিতেছেন। ঘটের মধ্যে টাকা আছে দিতে বলিয়াছেন। আচার্যদেব বিস্ময়বিমূঢ়ের ন্যায় ঘট উপুর করিয়া পাঁচটী মুদ্রা পাইয়া শাঁখারিকে প্রদান করিয়া জড়াইয়া ধরেন ও গঙ্গার দহের নিকট ছুটিয়া যান, কিন্তু কয়েকটি ক্ষুদ্র পদচিহ্ন ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে মা! মা! রবে ভূলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে থাকেন।”

(পৃঃ ৬৬-৬৭, পাদটীকা)

■ কপালেশ্বরের শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ঃ

গৌরীমা মণিরামপুরের কপালেশ্বরে ১৩০১ সালের এক শুভদিনে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই আশ্রম আজ আর নেই। কলকাতা কর্পোরেশনের পলতা জলকলের সম্প্রসারণের জন্য সরকার আশ্রমের এই জমি অধিগ্রহণ করে। সে কারণে ১৩১৮ সালের ১৪ই শ্রাবণ এই আশ্রম উত্তর কলকাতার ১০নং গোয়াবাগান লেনে স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে এই আশ্রম শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্, রাধাকান্ত জীউ ষ্ট্রীট হয়ে ৭/২ বিডন রো-তে স্থানান্তরিত হয়।

গৌরীমা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে বাল্যকালে দীক্ষা লাভ করেন। গৌরীমার পূর্বনাম মৃড়ানী। তার পিতার নাম পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়, মাতার নাম গিরিবালা দেবী। পার্বতীচরণের নিবাস ছিল হাওড়া জেলার শিবপুরে, আর গিরিবালা দেবীর নিবাস ছিল নদীয়া জেলার রাণাঘাটে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর প্রায় দশ বৎসর গৌরীমা বিভিন্ন তীর্থে পর্যটন করেন। একবার দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরে এসে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করতে করতে কালীসাধক রামপ্রসাদের সাধনক্ষেত্রের কাছাকাছি গঙ্গাতীরে একটি স্থান দেখে মুগ্ধ হলেন। সেখানে তিনি কিছুদিন থাকলেন।

(পরবর্তী ঘটনা শ্রীদুর্গাপুরী দেবীর “গৌরীমা” গ্রন্থ থেকে তুলে ধরেছি। পৃঃ ১৪৩-১৪৯)।

“একদিন গঙ্গাতীরে বসিয়া তন্ময় হইয়া চন্ডীপাঠ করিতেছিলেন, গ্রামবাসী অনেকে ‘সন্ন্যাসিনী মাতাজী’র সুমধুর পাঠশ্রবণে মুগ্ধ হইলেন। পাঠ শেষ হইলে জনৈক শ্রোতা—নাম মুচিরাম দাস, জাতিতে তেওর, মাঝিগণের সর্দার,—গৌরীমার সম্মুখে আসিয়া প্রণামান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে মা তুমি, এখানে ব’সে পাঠ কচ্ছ?” গৌরীমা বলিলেন, “আমি মা কালীর মেয়ে।” কথাপ্রসঙ্গে মুচিরাম বলিলেন, “মা, তোমার এখানকার গঙ্গাই এত ভাল লেগেছে, যদি তুমি আমাদের কপালেশ্বরে যাও

ত তোমার আরো বেশী ভাল লাগবে।" মুচিরামের সরল ব্যবহারে তিনি সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার নির্দিষ্ট স্থান দেখিতে চলিলেন।

স্থানটি তরুলতাসমাচ্ছন্ন, সম্মুখে পূতসলিলা ভাগীরথী—তপোবনের ন্যায় মনোরম। ভূমির মধ্যভাগে অশ্বত্থ, বট, বিল্ব প্রভৃতি বৃক্ষ মিলিত হইয়া পঞ্চবটী রচনা করিয়া রাখিয়াছিল। পঞ্চবটী তলে এক পঞ্চানন শিব পূর্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। স্থানটি দেখিয়া গৌরীমা অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। তাঁহার মনে হইল, ইহা পূর্বে কোন সিদ্ধপুরুষের সাধনভূমি ছিল। তিনি বলিতেন, ওখানে জপধ্যান করিয়া অল্পকালের মধ্যেই পরম আনন্দ উপলব্ধি করা যায়।

ঐ স্থানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে উদিত হয় এবং এই সম্পর্কে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে আলোচনা করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ সফল হইতে চলিল বুঝিয়া গৌরীমাকে প্রভূত আশীর্বাদ এবং উৎসাহ দান করিয়া শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "আরম্ভ কর মা, আশ্রমের অশেষ কল্যাণ হবে।"

ক্রমে মুচিরাম, মহানন্দ, শুকদেব, প্রহ্লাদ, পূর্ণচন্দ্র, নিমাই প্রভৃতি অনেক স্থানীয় লোক গৌরমার ভক্ত হইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে সেখানেই স্থায়িভাবে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করেন এবং আশ্রম-প্রতিষ্ঠাকার্যে নানাভাবে সহযোগিতা করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতার দুইজন মহাপ্রাণা মহিলার অর্থসাহায্যে প্রায় আড়াই বিঘা জমি ক্রয় করা হয়।

উক্ত স্থানে ১৩০১ সালে এক শুভদিনে গুরুপত্নীর পবিত্র নামে গৌরীমা "শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম" প্রতিষ্ঠা করেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ এবং কলিকাতা হইতে বহু ভক্ত আসিয়া এই উৎসবে যোগদান করেন। পূজার্চনা, হোম, চণ্ডীপাঠ, কুমারীভোজন, ব্রাহ্মণভোজন, দরিদ্রনারায়ণের সেবা,—সমাগত ভক্তমন্ডলীকে প্রভূত আনন্দ দান করিল। এইরূপে দিবসব্যাপী আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়া মাতৃজাতি-সেবার উদ্দেশ্যে ভারতের জাতীয় আদর্শে এক প্রতিষ্ঠানের সূচনা হইল।

নিতান্ত ক্ষুদ্র আকারে আশ্রমের আরম্ভ। একখানি মাত্র কুটীর,—গোলপাতার চালা, ছ্যাঁচা বেড়ার প্রাচীর, সানের মেঝে। ক্রমশঃ ভক্তসন্তানগণের চেষ্টায় উহার শ্রী বর্ধিত হইতে লাগিল। গ্রামের অতিসাধারণ লোকও নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী গৌরীমার নবপ্রচেষ্টায় সাহায্য করিতেন। কলিকাতার কয়েকজন সন্তানও আশ্রমের সেবায় অগ্রসর হইলেন।

একে একে প্রায় পঁচিশ জন কুমারী, সধবা এবং বিধবা আসিয়া আশ্রমবাসিনী হইলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করিয়া জপধ্যান করিতেন, তাহার পর পাঠাভ্যাস এবং গৃহকর্মে রত হইতেন। ঘরের বারান্দায় এবং গাছতলায় পাঠাভ্যাস চলিত। দ্বিপ্রহরে পল্লীর বালিকারা আসিতেন। আশ্রমে বাস, আহার এবং শিক্ষার বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করা হইত না।

"কিছুকাল পর গৌরমার আমন্ত্রণে মাতাঠাকুরাণী একদিন বারাকপুর-আশ্রমে

শুভপদার্পণ করেন। দীন কুঠীর হইলেও মঙ্গলঘট, পত্রপুষ্প, আলপনা, ভোগারতি ইত্যাদির দ্বারা তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্বর্ধনা করা হয়। গৌরীমা পরম ভক্তিসহকারে মাতৃপূজা করিলেন, স্বরচিত একখানি কীর্তন শুনাইলেন। গঙ্গাতীরবর্তী আশ্রমের আবেষ্ঠন দর্শনে মাতা সারদেশ্বরী প্রসন্না হইলেন।"

যাঁহারা বারাকপুরে আশ্রমের পরিচালনাকার্যে গৌরীমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে তত্রত্য মুচিরাম দাস, গগন জেলে, পূর্ণবাবু দারোগা, চন্দ্রনাথ নিয়োগী, মোহিত মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনন্দিনী এবং কলিকাতার সিদ্ধেশ্বরী দেবী, নলিনচন্দ্র মিত্র, বিপিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং সুরেন্দ্রনাথ সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতাঠাকুরাণীর নামে আশ্রমের নাম করণ হইলেও ভক্তগণ এবং চতুষ্পার্শ্বের অধিবাসীগণ আশ্রমকে কেহ 'দামোদর জীউর মন্দির' এবং কেহ-বা 'যোগিনী-মার কুঠীর' বলিয়াই অভিহিত করিতেন। আশ্রমে দোল, দুর্গোৎসব, জন্মতিথি ইত্যাদি ধর্মানুষ্ঠান হইত এবং তদুপলক্ষে নানাস্থান হইতে কীর্তনের দল আসিত।"

■ মণিরামপুর আশ্রমে বিবেকানন্দের আগমন এবং আশ্রম বিষয়ে তার ভাবনা (শ্রীদুর্গাপুরী দেবীর লেখা 'গৌরীমা' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত) [পৃঃ ১৭২-১৭৪]

"গৌরীমার আশ্রম-প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া স্বামীজী সন্তোষ প্রকাশ করেন। বারাকপুর-আশ্রমে স্বামিজী দুইবার গিয়াছিলেন;—প্রথমবার পশুপতিনাথ বসুর বাটীতে সম্বর্ধনার নিকটবর্তী কোন সময়, দ্বিতীয়বার দার্জিলিং হইতে প্রত্যাগমনের পর। আশ্রমের স্থানটি দেখিয়া স্বামিজী প্রীত হন। আশ্রমের ভবিষ্যত কার্যপরিচালনা বিষয় গৌরীমার সহিত তাঁহার অনেক আলোচনা হয়।

একবার আশ্রমের প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ সেনকে স্বামিজী বলিয়াছিলেন,"হুড় হুড় ক'রে টাকা আসা উচিত ছিল। তখন বললুম গৌরীমাকে, চল আমার সঙ্গে আমেরিকায়। ওরাও বুঝতো আমাদের দেশেও কেমন মেয়ে জন্মায়। একবার ঘুরে এলে টাকার কত সুবিধা হতো। তা উনি গেলেন না, জাত যাবে ব'লে।"

ভগিনী নিবেদিতা এবং আরও দুইটি বিদেশীয়া মহিলাকে স্বামিজী যেদিন গৌরীমার সহিত প্রথম পরিচয় করাইয়া দেন, সেইদিনের কথা বলিয়া স্বামিজী বড়ই আমোদ অনুভব করিতেন, নিবেদিতা তখন বাংলা কিছুই জানে না, গৌরীমাও ওদের ইংরিজি কথা সব বোঝেন না; উভয়ে উভয়কে মনের কথা বোঝাতে উৎসুক। তখন ইসারায় আলাপ চললো। মুখ নড়ে, হাত নড়ে, মাথাও নড়ে, কিন্তু কেউ কারুর ভাষা বোঝে না। সে এক মজার দৃশ্য!"

১৩০৮ সালের শীতকালে একদিন গিরিবালা দেবী, তাঁহার এক দৌহিত্রী এবং গৌরীমা বেলুড় মঠে গিয়াছিল। সংবাদ পাইয়া স্বামিজী একতলায় তাঁহাদিগের নিকট আসিলেন। গিরিবালা এবং তাঁহার দৌহিত্রীর সঙ্গে গল্প করিতে করিতে স্বামিজী বলেন, "দিদিমা, খুকী উচ্চশিক্ষা পেয়ে মেয়েদের সেবা করবে। ওকে আমি বিলেতে পাঠাব।

সব খরচা আমি দেবো। তোমরা কিন্তু আপত্তি তুলো না। গিরিবালা হাসিয়া বলিলেন, "দাদা, দেশে থেকেও তা হ'তে পারে।"

তাহার পর গৌরীমার সঙ্গে আশ্রমের প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। স্বামিজী বলিলেন, "আমার কাজ শেষ হ'য়ে এলো এবার। মেয়েদের কাজ রইলো, আর তুমি রইলে—"

গৌরীমা বাধা দিয়া বলেন, "ষাট্ ষাট্, ওসব অলক্ষুণে কথা বলতে নেই।"

কিয়ৎকাল গম্ভীর থাকিয়া স্বামিজী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ঠাকুরের কথা কি নড়চড় হবার যো আছে, গৌরমা!" আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমরা মায়েরা চাও আমাকে ষেটের বাছা ক'রে চিরকাল ধ'রে রাখতে। তা কি হয়?"

১৩০৯ সালের আষাঢ় মাস। বারাকপুর-আশ্রমে একটি উৎসবের অনুষ্ঠান হইতেছিল, অনেক ভক্তসন্তান সেইদিন সমবেত হইয়াছেন। সন্ধ্যার পর গৌরীমা ঠাকুরের আরতি করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ একটা আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন,"মঠে কি সর্বনাশ হলো রে! নরেন বুঝি ফাঁকি দিলে।"

উপস্থিত সকলের বুক আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। সেইদিনই অপরাহ্নে যাঁহারা স্বচক্ষে স্বামিজীকে মঠে দর্শন করিয়াছেন, বাহিরে বেড়াইতে দেখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা গৌরীমার আশঙ্কা বিশ্বাস করিতে না পারিলেও আড়ষ্ট হইয়া রহিলেন। মায়ের ব্যাকুলতা দেখিয়া ভক্ত মুচিরাম বলিলেন, "মা, তুমি অমন কথা বলো না, আমি এক্ষুনি বেলুড় থেকে খবর নিয়ে আসছি।"

বেলুড় হইতে সংবাদ আসিল, স্বামিজী মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। গৌরীমা বর্তমান আশ্রম-সম্পাদিকাকে সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে বেলুড় অভিমুখে রওনা হইলেন।"

■ শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম প্রসঙ্গে একটি অলৌকিক ঘটনা ঃ
(শ্রী সুব্রতাপুরী দেবীর "দুর্গামা" গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত) [পৃঃ ৬৭-৬৯]

"বারাকপুর আশ্রমের ঘাটে প্রতিবেশী অনেক মহিলা প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করতে আসতেন। স্নানশেষে তাঁরা কলসী অথবা ঘটী ভরে গঙ্গাজল নিতেন, তার কিছুটা ঢালতেন শিবঠাকুরের মাথায়, কিছুটা পঞ্চবটীতলায়, তারপর যোগিনীমার মন্দির প্রণাম করে যে যার ঘরে ফিরে যেতেন।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় দুটি যুবতী বধূ গঙ্গাস্নান করতে এসেছেন। পঞ্চবটীতলা দিয়ে ঘাটে যাবার সময় তাঁদের মধ্যে একজন হঠাৎ অবসন্নভাবে মাটিতে বসে পড়লেন। ভয়ে সঙ্গিনী ছুটে গেলেন গৌরীমার কাছে, বললেন,—ও যোগিনীমা, একটা বৌকে ভূতে পেয়েছে, কি সব বকচে, আপনি শীগগির একবারটি এসে দেখুন।

ঐ রকম কাতর ডাকে যোগিনীমা তখনই বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বৌটিকে দেখে তাঁর মনে হল, মেয়েটা ভর-সন্ধ্যেতে এলোচুলে চলেছিল, ওর ওপর নিশ্চয়ই কারুর অশুভ দৃষ্টি পড়েছে। তিনি সেখানে আগুন জ্বালালেন, তাতে সরষে মরিচ কি কি সব জিনিস ফেললেন। তারপর সেখানে লাঠি দিয়ে সপাং সপাং করে মারতে

লাগলেন। বৌটিকেও কয়েক ঘা দিলেন। কিন্তু কোন সুফল দেখা গেল না। তারপর পঞ্চবটীতলায় বসে তিনি সুমধুর সুরে রামনাম কীর্তন আরম্ভ করলেন। তখন এক ছায়ামূর্তি তাঁর সামনে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করে,—যোগিনীমা, তুমি এসব কি করছ এখানে?

গৌরীমা বলেন,—তুমি কে? কেন বৌটাকে কষ্ট দিচ্ছ?

ছায়ামূর্তি উত্তর দেয়,—দেব না? বৌটার এত বড় আস্পর্ধা, পঞ্চবটীতলায় বসে আমি জপ কচ্ছি, ও অশুদ্ধ কাপড়টা আমার গায়ে লাগিয়ে দিল! কেন আঁচল ওড়াবার আর জায়গা পেলে না ও?

গৌরীমা বুঝলেন, সাধারণ ভূত নয় এ, তাই জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনি কে?

ছায়ামূর্তি বললেন, —আমি মহাবীর, এখানে বসে জপ করি।

গৌরীমা বিনীতভাবে বলেন,—ওর খুবই অন্যায় হয়েছে, বাবা, ওর বুদ্ধি কম, আপনি ক্ষমা করুন।

মহাবীর বলেন,—তুমি বলছ যখন, ক্ষমা করব। কিন্তু তার আগে ও গঙ্গাস্নান করে আসুক, ভিজে কাপড়ে এখানে গড়াগড়ি দিক, নাকে খত্ দিক।

ততক্ষণে এ খবর ছড়িয়ে পড়েছে। বহু নরনারী এসে জমা হয়েছেন। কয়েকজন মহিলা সেই বৌটিকে নিয়ে গিয়ে গঙ্গাস্নান করিয়ে আনলেন। তারপর বৌটি পঞ্চবটীতলায় গড়াগড়ি দিলেন, নাকে খত্ দিলেন। গৌরীমা তখন মহাবীরকে বললেন,—আপনি এবার প্রসন্ন হোন, কিছু গ্রহণ করুন।

মহাবীর,—তোমার ঘরে তো আখের গুড় আছে, তাই দাও কলাপাতায় করে।

গৌরীমা একজনকে বলেন,—শীগ্গির একটা আঙোট কলাপাতা কেটে নিয়ে এসো। আমাকে বললেন,—গুড়ের যে নাগরি আছে ঘরে, গোটা একটা নিয়ে এসো তো, মা। একপালি গঙ্গাজলও আনবে। আর একটা নতুন কুশাসন। সব কিছু এনে আমি অনেকখানি জায়গা গঙ্গাজলে মার্জন করলুম, কলাপাতাখানি গঙ্গাজলে ধুয়ে রাখলুম, আসন পেতে পাশে খাবার জন্য গঙ্গাজল দিলুম। গৌরীমা পাতার ওপর নাগরি থেকে গুড় ঢালতে লাগলেন, আর মহাবীরকে গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন।

সকলেই তখন ভয়েতে আর ভক্তিতে আবিষ্ট। যেন একটা ছম্‌ছম্ ভাব। মহাবীরের কথা আমরা কিছুই শুনতে পাই নি, তাঁকে চোখেও দেখি নি, কিন্তু কলাপাতায় যখন গুড় পড়তে লাগল, তৎক্ষণাৎ তা নিঃশেষ হতে লাগল, এটা চোখে দেখেছি। নাগরির সমস্ত গুড় নিঃশেষ হয়ে গেল। গৌরীমা ভূমিষ্ঠ হয়ে সেই জায়গায় প্রণাম করলেন, উপস্থিত আমরাও সকলে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলুম। মায়ের নির্দেশ সেই বধূ কলাপাতা আর নাগরি গঙ্গায় দিয়ে এলেন। ততক্ষণে তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে।"

সৌজন্য—(১) গৌরীমা—দুর্গাপুরী দেবী (২) দুর্গামা—সুব্রতাপুরী দেবী।

(খ) মণিরামপুর ভক্ত সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ
(১৮৮৩, ১০ই জুন)

ঠাকুর আহারান্তে ছোট খাটটিতে একটু বসিয়াছেন, এখনও বিশ্রাম করিতে অবসর পান নাই। ভক্তদের সমাগম হইতে লাগিল। প্রথমে মণিরামপুর হইতে একদল ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন পি ডব্লিউ ডি-তে কাজ করিতেন, এখন পেনশন পান। একটি ভক্ত তাঁহাদিগকে লইয়া আসিয়াছেন। ক্রমে বেলঘরে হইতে একদল ভক্ত আসিলেন। শ্রীযুক্ত মণি মল্লিক প্রভৃতি ভক্তেরাও ক্রমে আসিলেন।

মণিরামপুরের ভক্তগণ বলিতেছেন, আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "না, না, ও-সব রজোগুণের কথা—উনি এখন ঘুমুবেন!"

* চাণক মণিরামপুর—এই কথা শুনিয়া ঠাকুরের বাল্যসখা শ্রীরামের উদ্দীপন হইয়াছে। ঠাকুর বলিতেছেন, "শ্রীরামের দোকান তোমাদের ওখানে। ও-দেশে শ্রীরাম আমার সঙ্গে পাঠশালায় পড়ত। সেদিন এখানে এসেছিল।"

মণিরামপুরের ভক্তেরা বলিতেছেন, কি উপায়ে ভগবানকে পাওয়া যায়, একটু আমাদের দয়া করে বলুন।

[মণিরামপুরের ভক্তকে শিক্ষা—সাধন-ভজন কর ও ব্যাকুল হও]

শ্রীরামকৃষ্ণ—একটু সাধন-ভজন করতে হয়।

"দুধে মাখন আছে শুধু বললেই হয় না, দুধকে দই পেতে, মন্থন করে মাখন তুলতে হয়। তবে মাঝে মাঝে একটু নির্জন চাই। দিন কতক নির্জনে থেকে ভক্তিলাভ করে, তারপর যেখানে থাক। জুতো পায় দিয়ে কাঁটাবনেও অনায়াসে যাওয়া যায়।

"প্রধান কথা বিশ্বাস। 'যেমন ভাব তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়।' বিশ্বাস হয়ে গেলে আর ভয় নাই।"

মণিরামপুর ভক্ত—আজ্ঞা, গুরু কি প্রয়োজন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—অনেকের প্রয়োজন আছে। তবে গুরুবাক্যে বিশ্বাস করতে হয়। গুরুকে ঈশ্বরজ্ঞান করলে তবে হয়। তাই বৈষ্ণবেরা বলে, গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব।

"তাঁর নাম সর্বদাই করতে হয়। কলিতে নাম-মাহাত্ম্য। অন্নগত প্রাণ, তাই যোগ হয় না। তাঁর নাম করে, হাততালি দিলে পাপপাখি পালিয়ে যায়।

*** চাণক হল বারাকপুরের পূর্বনাম।**

"সৎসঙ্গ সর্বদাই দরকার। গঙ্গার যত কাছে যাবে ততই শীতল হাওয়া পাবে; অগ্নির যত কাছে যাবে ততই উত্তাপ পাবে।

"ঢিমে তেতালা হলে হয় না। যাদের সংসারে ভোগের ইচ্ছা আছে তারা বলে, 'হবে, কখন না কখন ঈশ্বরকে পাবে।'

"আমি কেশব সেনকে বলেছিলাম, ছেলেকে ব্যাকুল দেখলে তার বাপ তিন বৎসর আগেই তার হিস্যে ফেলে দেয়।

"মা রাঁধছে, কোলের ছেলে শুয়ে আছে। মা মুখে চুষি দিয়ে গেছে; যখন চুষি ফেলে চিৎকার করে ছেলে কাঁদে, তখন মা হাঁড়ি নামিয়ে ছেলেকে কোলে করে মাই দেয়। এই সব কথা কেশব সেনকে বলেছিলাম।

"কলিতে বলে, একদিন একরাত কাঁদলে ঈশ্বরদর্শন হয়।

"মনে অভিমান করবে, আর বলবে, 'তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ; দেখা দিতে হবে।'

"সংসারেই থাক, আর যেখানেই থাক—ঈশ্বর মনটি দেখেন। বিষয়াসক্ত মন যেমন ভিজে দেশলাই, যত ঘষো জ্বলে না। একলব্য মাটির দ্রোণ অর্থাৎ নিজের গুরুর মূর্তি সামনে রেখে বাণ শিক্ষা করেছিল।

"এগিয়ে পড়;—কাঠুরে এগিয়ে গিয়ে দেখেছিল, চন্দন কাঠ, রূপার খনি, সোনার খনি, আরও এগিয়ে গিয়ে দেখলে হীরে, মাণিক।"

"যারা অজ্ঞান, তারা যেন মাটির দেওয়ালের ঘরের ভিতর রয়েছে। ভিতরে তেমন আলো নাই, আবার বাহিরের কোন জিনিস দেখতে পাচ্ছে না। জ্ঞান লাভ করে যে সংসারে থাকে সে যেন কাচের ঘরের ভিতর আছে। ভিতরে আলো বাহিরেও আলো। ভিতরের জিনিসও দেখতে পায়, আর বাহিরের জিনিসও দেখতে পায়।"

(ব্রহ্ম ও জগন্মাতা এক)

"এক বই আর কিছু নাই। সেই পরব্রহ্ম 'আমি' যতক্ষণ রেখে দেন, ততক্ষণ দেখান যে, আদ্যাশক্তিরূপে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন।"

"যিনিই ব্রহ্ম তিনিই আদ্যাশক্তি। একজন রাজা বলেছিল যে, আমায় এককথায় জ্ঞান দিতে হবে। যোগী বললে, আচ্ছা তুমি এককথাতেই জ্ঞান পাবে। খানিকক্ষণ পরে রাজার কাছে হঠাৎ একজন যাদুকর এসে উপস্থিত। রাজা দেখলে, সে এসে কেবল দুটো আঙুল ঘুরাচ্ছে, আর বলছে, 'রাজা, এই দেখ, এই দেখ।' রাজা অবাক হয়ে দেখছে। খানিকক্ষণ পরে দেখে দুটো আঙুল একটা আঙুল হয়ে গেছে। যাদুকর একটা আঙুল ঘোরাতে ঘোরাতে বলছে, 'রাজা এই দেখ, রাজা এই দেখ।' অর্থাৎ ব্রহ্ম আর আদ্যাশক্তি প্রথম দুটা বোধ হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে আর দুটা থাকে না। অভেদ! এক! যে একের দুই নাই। অদ্বৈতম্।"

সৌজন্য ঃ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত শ্রীম—কথিত (অখণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা।

(গ) স্বামী অখণ্ডানন্দের "স্মৃতিকথা" থেকে সংকলিত

"ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে স্বামী অখণ্ডানন্দ (শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য) মণিরামপুরে এসেছিলেন। তিনি স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে লিখেছেন—"বৈদিক শিক্ষার অনুকূলে 'বেঙ্গলী' পত্রিকার আন্দোলন করিবার জন্য মণিরামপুরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ি যাই। সুরেনবাবু সে সময়ে তাঁহার বাড়ির সম্মুখেই গঙ্গার ধারে রাস্তার উপরে পায়চারি করিতে ছিলেন। সদর-দরজায় একখানা বেঞ্চিতে বসিয়া আমাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। ভ্রমণ শেষ করিয়া সুরেনবাবু আসিয়া আমাকে বলিলেন, "আমার নিশ্বাস ফেলবারও অবকাশ নেই। আপনি একটু বসুন, আমি এক্ষুণি আসছি।" অল্পক্ষণ পরেই চোগা-চাপকান পরিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি স্বামী বিবেকানন্দ-মঠের?"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি বিখ্যাত স্বদেশহিতৈষী, তাই আপনাকে দেখতে এলাম।" সুরেনবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, একটু একটু চেষ্টা করি।" আমি বলিলাম, "আলমবাজার মঠে আমরা একটি বৈদিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আপনার 'বেঙ্গলী' কাগজে এ বিষয়ে আপনি একটু আন্দোলন করলে বড় ভাল হয়, সেই অনুরোধ করতেই আমি এসেছি।" সুরেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি এখন কোথায় যাবেন?" আমি বলিলাম, "ভাটপাড়ায়—পণ্ডিত মশায়দের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।" তিনি বলিলেন, "এ তো অতি উত্তম কথা। আমি অবশ্যই এর অনুকূলে আন্দোলন ক'রব।"

কথা শেষ হইতে না হইতে একখানি এক-ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। গাড়ি দেখিয়া আমার উদ্দেশে সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আমি বারাকপুর স্টেশনে যাব, আপনি আমার সঙ্গে চলুন। ভাটপাড়ার পথে আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাব।" গাড়িতে উঠিতেই তিনি আমাকে তাঁহার পাশে বসাইলেন। যাইতে যাইতে অনেক কথাই হইল। তিনি বলিলেন, "আপনারাও কংগ্রেসে প্রচার-কাজে যোগদান করুন।" তাঁহার সেই কথার উত্তরে আমি বলিলাম, "আপনাদের কংগ্রেস একটা মনস্ট্রাস্ হুজুগ বলেই আমার মনে হয়। বছরে তিনদিন মাত্র খুব হইচই, ভারী সমারোহ, তারপর সব ঠাণ্ডা। দেশের সর্বত্র কত নিরন্ন বিপন্ন অসহায় লোক পড়ে রয়েছে, কই আপনারা তাদের তো কোন খোঁজ নেন না? আপনাদের কোন প্রচারককে কোনও চাষীর কুঁড়ে ঘরে দেখতে পাই না।" আমার কথায় বিরক্ত হইয়া তিনি বলিলেন, "আপনি কি ভগবানের মত একা সর্বদা থাকতে পারেন? ওরকম প্রচার ও সেবক আমাদের যথেষ্ট আছে।" আমি বলিলাম, "আমার দুর্ভাগ্য ঐসকল প্রচারকদের মধ্যে একজনকেও আমি খুঁজে বার করতে পারি নি।"

—স্মৃতি কথা, স্বামী অখণ্ডানন্দ (উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, পৃঃ১৩০-১৩২)

সংগ্রাহক : সম্পাদক, নগর পেরিয়ে

সুবল চট্টোপাধ্যায় থেকে স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ গিরি

—বিমলেন্দু দাশগুপ্ত

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে কলকাতার ঢাকুরিয়া অঞ্চলের ১০/১, এ বি চ্যাটার্জী স্ট্রিটে স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ গিরি ওরফে সুবল চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম ছিল সুরেন্দ্রনাথ, মা হলেন মানদা। মাত্র দেড় বছর বয়সে শিশু সুবল মাতৃহারা হন এবং যখন তাঁর পাঁচ বছর বয়স তখন বাবাও তাকে ফাঁকি দিয়ে পরলোক গমন করেন। এইভাবে মাতৃপিতৃহীন হয়ে অনাথ সুবল অনেকের কাছে গলগ্রহ হয়ে বড় হতে থাকে এবং সহজেই অনুমেয়, এসময় তাঁর জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না মোটেই। কিম্বা বলা যায়, যাঁরা অধ্যাত্ম পথের পথিক হবেন ভবিষ্যৎ জীবনে, সেক্ষেত্রে দেখা গেছে দুর্ভাগ্য যেন জন্মলগ্ন থেকে তাঁদের তাড়া করে ফেরে। এই প্রসঙ্গে ইংরাজ কবি থমসনের একটি কবিতার কথা মনে পড়ছে। কবি বলেছেন, মানুষ যেমন ঈশ্বরের সন্ধান করে, তেমনি ঈশ্বরও সন্ধান করেন তাঁর ভক্তদে?। কবিতাটির নাম বড় অদ্ভুত— "দি হাউণ্ড অব হেভেন।" যেন সেই দিব্য সারমেয় স্বর্গ হতে ভক্তদের সন্ধানে নেমে আসে মর্তধামে। তারপর তাঁদের তাড়িয়ে নিয়ে আসে ঈশ্বর সন্নিধানে এইভাবে দুর্ভাগ্যের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে। তাই বাপ-মা মরা কিশোর সুবল সংসাবের অসারত্ব মর্মে মর্মে অনুভব করেন। এই সময় তিনি নিজের পৈতৃক গৃহ ত্যাগ করে নিখিল বিশ্বকে আপন গৃহ করে নিয়েছিলেন।

গৃহ ত্যাগ করে তিনি সুদূর হরিদ্বারে গিয়ে হাজির হন। তাঁর হরিদ্বারে যাবার পিছনেও একটা ছোট্ট কাহিনী আছে। বালক সুবল সেদিন বাজারে যাচ্ছিল তার দাদুর সঙ্গে। পথে সে একটা কাগজ কুড়িয়ে পায় যাতে ছিল একজন সন্ন্যাসীর ছবি। সুবল তার দাদুকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল, সন্ন্যাসীর নাম শ্রীশ্রীভোলানাথ গিরি; হরিদ্বারে তাঁর আশ্রম আছে এবং তাঁর ভক্ত শিষ্য আছে সারা ভারত জুড়ে। তিনি একজন খুব বড় সন্ন্যাসী।

ভোলানন্দ গিরি মহারাজের এইটুকু জ্ঞান নিয়েই হরিদ্বারে আসেন তিনি। উদ্দেশ্য ছিল কোন রকমে এই আশ্রমে একটু স্থান করে নেওয়া। কিছুদিন হরিদ্বারের গঙ্গার ধারে ভিক্ষুক ও সন্ন্যাসীদের সঙ্গে লাইনে বসে পুণ্যার্থীদের কাছ থেকে সাহায্যও নিয়েছেন। অবশেষে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে হরিদ্বার ত্যাগ

করে সমতলে আসেন। অনেক জায়গায় ঘুরেছেন তিনি, কিন্তু কোথাও একটু মাথা গোঁজার স্থান পাননি।

অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে তিনি এসে পড়েন এই মণিরামপুরে, এই সিদ্ধেশ্বরীতলায়, এই মনোরম পরিবেশে এবং ভাগ্য এবার সহায় হল, শেষ পর্যন্ত তার এখানে ঠাঁই হয়ে গেল এক রকম।

এই সিদ্ধেশ্বরীতলায় গঙ্গার ধারে একখানি ঘরছিল, যা জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি নির্মাণ করেছিলেন গঙ্গাবাসীদের জন্য। ঘরখানা খালিই থাকত সারা বছর। কচিৎ কোন সন্ন্যাসী এখানে এসে পড়লে, এই ঘরে রাত কাটাত। জ্যোতির্ময়ানন্দ এই ঘরটিতে স্থায়ীভাবে আশ্রয় নিলেন। আর তাঁর ক্ষুধা নিবৃত্তির প্রধান দায়িত্বটা গিয়ে বর্তালো নিকটবর্তী পার ঘাটের মাঝি মাল্লাদের উপর ও নিকটের গঙ্গার ধারে নির্মিত ছোট্ট এক রাধা-কৃষ্ণের মন্দিরের ভক্ত সেবক গোপীনাথ বাবাজীর উপর। তাছাড়া স্থানীয় দয়ালু বাসিন্দাদের কেউ কেউ তাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে আদর করে খাওয়াতো কখন সখন।

রাস্তার অন্য ছেলেদের মতই অতি তুচ্ছ, অতি নগন্য এই ঘর পালানো ছেলেটির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোন বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেত না কেউ। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলেই তার বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ত। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব অনেক সময় আলাপচারিতায় ডিমে তা প্রদানরত পক্ষী মাতার দৃষ্টির দৃষ্টান্ত দিতেন; ঠিক সেই রকম উদাসীন ও ভাসাভাসা দৃষ্টি ছিল সুবলের দুচোখে। আমরা সাধারণ মানুষ যেমন বহির্জগৎকে দেখতে ব্যস্ত সর্বদা, সুবলের দৃষ্টি ছিল ঠিক তার বিপরীতমুখী। যেন অন্তরের গভীরে পক্ষীমাতার মতই কোন কিছুতে তা দিতে ব্যস্ত সদা। অবশেষে ডিমফুটে বাচ্চা বেরনোর সময় হল।

সুবল সন্ন্যাস নিয়ে নাম নিয়েছিলেন জ্যোতির্ময়ানন্দ গিরি। তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন ভোলাগিরি মহারাজের প্রধান শিষ্য মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজের কাছে। ভোলাগিরির মৃত্যুর পর হরিদ্বারের ভোলাগিরি আশ্রমের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন এই মহাদেবানন্দ। সেক্রেটারি ছিলেন স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি। বিশ্বেশ্বরানন্দের মৃত্যুর পর সেক্রেটারি হয় জ্যোতির্ময়ানন্দ। এক সময় তিনি এই আশ্রমে প্রবেশ লাভের জন্য কত চেষ্টা করেছিলেন, পরে সেই আশ্রমের তিনি হলেন সেক্রেটারি। সারা ভারতে এই ভোলাগিরি আশ্রমের যেখানে যত শাখা আছে সবের দেখাশোনা করার দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি।

হরিদ্বারের ভোলাগিরি আশ্রমের একটি শাখা মণিরামপুরের এই আশ্রমটিকে স্থানীয় মানুষ বাবাজি আশ্রম বলেই জানে। কারণ, মূল মন্দিরটি এখন যেখানে আছে, সে জায়গায় আগে যে ছোট রাধাকৃষ্ণের মন্দির ছিল, তার সেবক ছিল ভক্ত গোপীনাথ বাবাজি। তিনি মারা যাবার সময় মন্দিরের নিত্য পূজার ভার দিয়ে যান জ্যোতির্ময়ানন্দকে। সেই থেকে জ্যোতির্ময়ানন্দ

স্থানীয় মানুষের কাছে বাবাজী। তাই ভোলাগিরি আশ্রমকে তারা বাবাজী আশ্রম বলে সুখ পায়।

যখন তিনি হরিদ্বারের ভোলা গিরি আশ্রমের সেক্রেটারি হন, সে সময় তাঁর কর্মের পরিধি পশ্চিমবঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে যায়। তিনি পুরীতে ভোলা গিরি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। যোশীমঠ ছাড়িয়ে কিছুটা গেলে বদ্রীনারায়ণ নামে জায়গায় তিনি ভোলা গিরির নামে একটি আশ্রম ও একটি ধর্মশালা প্রতিষ্ঠা করেন।

ঈশোপনিষদের ঋষির মত জ্যোতির্ময়ানন্দও, এই জগতের সব কিছুই ঈশ্বরীয় চৈতন্যে উদ্ভাসিত দেখতেন। এখানে কেউ হেয় নয়, কেউ ঘৃণ্য নয়। সকলের সাথে একাত্ম হতে হবে, তবেই না সর্বভূতে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

লেখক পরিচিতি ঃ প্রতিষ্ঠিত লেখক

মুসলিম উপাসনালয়

মণিরামপুর অঞ্চলে মুসলমান সম্প্রদায়ের উপাসনার জন্য কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

- মণিরামপুর মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রের পাশে হাজি মুকবুল মুন্সীর মসজিদ।
- মিস্ত্রীঘাট আনন্দময়ী কালীবাড়ীর কাছে ইমামবাড়া।
- মিস্ত্রীঘাট সন্দলপুর ইমামবাড়া।
- মিস্ত্রীঘাট সন্দলপুর দরগা।
- নয়াপল্লীতে রয়েছে দু'টি দরগা।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ গিরি

ধনী, মানী, কুলীন, পন্ডিত কুলে জন্ম হয়ে ছিল বটে, কিন্তু সার্থক হয়নি এই মানব জন্ম। যেদিন আশ্রয় নিলাম আমার প্রিয়তম গুরুর চরণে, সেদিনই আমি নিজেকে ধন্য মনে করলাম।

শুক্লা ফাল্গুনী তিথির সুখদা বসন্তকাল নবনব ফুল ফলে শোভিত, আম্রমুকুলে অনুরঞ্জিত, বেদধ্বনি নিনাদিত, কোকিলের কুহুকুহু রব ও মধুমক্ষিকার গুণগুণ ধ্বনি বয়ে এনেছে আমার প্রভুর আগমনের দিনের পুণ্যময় বার্ত্তা। আজ মনে জেগে উঠ্ছে প্রাণময় প্রভুর কথা। শিহরণ জাগছে অন্তরের গোপন হৃদয়ের, ধ্বনিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত প্রভুর বাণী। শুধু হা-হুতাশ হচ্ছে প্রভুপ্রভু বলে। সেই ফাল্গুনের প্রতিপদ তিথি আর এই ফাল্গুনের প্রতিপদ তিথি মনে হচ্ছে আকাশ পাতালের দুস্তর ব্যবধান। প্রভু বিহনে সব অন্ধকার। হে বরণীয়, পূজণীয়, আরাধ্য তিথি! তুমি বয়ে এনেছিলে আমায় প্রাণময় প্রভুকে, তাই তোমাকে জানাই আমার অন্তরের অসংখ্য প্রণাম। ধন্য, ধন্য, পূর্ববঙ্গ, ধন্য ময়মনসিংহের পূত স্পৃষ্ট পাথরাইদ গ্রাম, যে গ্রামে আবির্ভূত হয়েছিলেন আমার প্রাণময় প্রভু, ধন্য পিতা গিরিশচন্দ্র, ধন্য মাতা রাজকুমারী, যার গর্ভসিন্ধু হতে আবির্ভূত হলেন স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি। আজ এই শুভদিনে, শুভক্ষণে তোমার পাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার মত আমার কিছুই নাই। যেমন লোকে গংগাজলে গংগাপূজা করে, তোমাতেই সমর্পিত কায়মনোপ্রাণ তোমারই চরণে অর্ঘ্য দিলাম, ধন্য কবলাম জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত। জনেজনে নানাপ্রকার মতবাদ, কেউ বলে তোমায় জ্ঞানী, গুণী, পন্ডিত, কেউ বলে তোমায় যোগী, কেউ বলে তোমায় ত্যাগী, কেউ বলে তোমায় ঋষি, কেউ বলে তোমায় সিদ্ধ মহাত্মা। কিন্তু আমি জানি তুমি আমারই হৃদয়ের সর্বস্ব প্রাণময় প্রিয়তম প্রভু। তাই তোমার কাছে আমার এই আকুল আকুতি। তুমি আমার শুধু এক জনমের নয়, জনম জনমের মত হবে প্রভু, আমি হব তোমার দাস। জয় ফাল্গুনী প্রতিপদ তিথি। জয় ভোলানন্দ গিরি মহারাজ! জয় প্রাণময় প্রভু স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ!

লেখক পরিচিতি ঃ স্বামী মহাদেবানন্দ মহারাজের শিষ্য, বারাকপুর শ্রীগুরু ভোলানন্দ আশ্রম ছাড়াও আরো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্রষ্টা। আশ্রম স্মরণিকা '৬৪ থেকে গৃহীত।

মণিরামপুর বারোয়ারী দুর্গোৎসব—শতবর্ষের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

——————————— কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রতীপ নিয়োগী

মণিরামপুর বারোয়ারী দুর্গোৎসবের শতবর্ষের ঐতিহাসিক তথ্য দেওয়া এক কঠিন সমস্যা। বারোয়ারী দুর্গোৎসবের কোন লিখিত তথ্য বড় একটা থাকে না। তবুও নানা কথকথা এবং পল্লীবাসীর প্রবীণ ব্যক্তিদের নিকট হইতে আমরা যৎসামান্য সংগ্রহ করিয়াছি, তাহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে সচেষ্ট হইতেছি।

এই উৎসবের যাঁহারা গোড়া পত্তন করিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশ বংশধর এখনও বর্তমান, এবং মিস্ত্রীঘাট অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা। মূলতঃ তাঁহাদের নিকট হইতেই গঠিত আমাদের এই সংগ্রহ ভান্ডার।

আজ হইতে শতবর্ষ পূর্বে তখন মণিরামপুর ছিল একটি গন্ড গ্রাম। তিন দিকে বেষ্টিত স্রোতস্বিনী গঙ্গার উপকূলবর্তী একটি ছায়া শীতল স্নিগ্ধ পরিবেশ। উর্বরা এই পুণ্যভূমিতে সবুজের সাম্রাজ্য। তারই মাঝে মধ্যে কয়েকটি পরিবার লইয়া ছিল একটি গ্রামীণ পল্লী। ক্রমে ক্রমে নদীর তীরে অবস্থিত এই গ্রামে ছোট ব্যবসার পত্তন হয়। আনুমানিক ধিতাড়া গ্রামের (বর্তমানে পলতা) বাসিন্দা ক্ষেত্রমোহন ঘোষ আসিয়াছিল এই অঞ্চলে চুন-সুরকীর ব্যবসা করিতে। সেই কারণে এই জায়গাটিকে বলা হইত চুণাইটি। সম্ভবতঃ সন্নিকটেই ইংরেজদের প্রভাব থাকায় চুনাইটি নামের সঙ্গে কিছুটা বিদেশীয়ানা থাকিয়া গিয়াছে। কারণ মণিরামপুরের অনতিদূরেই ছিল ইংরেজদের ব্যারাক। আমাদের দুর্গাপূজা আরম্ভের পূর্বেই মণিরামপুর সংলগ্ন বারাকপুর ঐতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহে সমাধিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল। আজও সিপাহী বিদ্রোহের পীঠস্থান স্বরূপে বারাকপুর ভারতবাসীর তীর্থভূমি। ইহাছাড়া স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পূজারী, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পুরোধা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ মণিরামপুরের বাসিন্দা।

সিপাহী বিদ্রোহের পীঠস্থান হইতে পাঁচ'শ গজের মধ্যে অবস্থিত আমাদের শতবর্ষ ঐতিহ্যমণ্ডিত পূজা প্রাঙ্গণ। ক্ষেত্রমোহন ঘোষের উদ্যোগে এবং স্থানীয় বাসিন্দাগনের ঐকান্তিক সহযোগিতায় ১২৮২ বঙ্গাব্দে প্রথম দুর্গাপূজার আয়োজন হইয়াছিল। যদিও সেই সময় দুর্গাপূজা ছিল রাজসিক ব্যাপার। জমিদারগণের অঙ্গনেই তাহা শোভা বর্দ্ধন করিত। সেই সময় বারোয়ারী দুর্গোৎসবের আয়োজন নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

বর্তমানে যে স্থানে চিররঞ্জন মিত্রের সুবৃহৎ বসতবাটী সেই স্থানেই বাঁশ আর

হোগলার ছাউনীতে গড়িয়া উঠিয়াছিল বারোয়ারী পূজা প্রাঙ্গণ। ক্রমে সেই জায়গায় বাড়ী নির্মাণ হওয়ায় ক্ষেত্রমোহন ঘোষের নিজের গোলায় অর্থাৎ আজ যে স্থানে বি. ওয়াই. এম. এ. ক্লাব প্রতিষ্ঠিত সেইস্থানে পূজার স্থান পরিবর্তন করা হয়।

শোনা যায়, সেই সময় ক্ষেত্রমোহন ঘোষ তাঁর গোলায় সমগ্র বৎসর যাবৎ বারোয়ারী দুর্গোৎসবের জন্য বৃত্তি গ্রহণ করিতেন। এবং বহু বৎসর তাঁদের উদ্যোগেই পূজার অনুষ্ঠান আয়োজন সম্পন্ন হইত।

পর্যায়ক্রমে পূজার দায়িত্ব পড়ে মিস্ত্রীঘাট অঞ্চলের স্থায়ীবাসিন্দা শ্রীযুক্ত কালিপদ পাল এবং অন্যান্য স্থানীয় বাসিন্দাগণের নিকট। এই সময় পুনরায় পূজার স্থান পরিবর্তন করা হয়। বসতি যতই বাড়িতে থাকে স্বাভাবিক ভাবেই পূজার স্থানও পরিবর্তন হইতে থাকে।

শ্রীযুক্ত কালিপদ পাল মহাশয়ের কাছে ১৯১৭ সালের (১৩২৪ বঙ্গাব্দ) পূজার আয় ও ব্যয়ের একটি হিসাব পাই। চাঁদা সংগ্রহ হইত ৭০ হইতে ৮০ টাকা। এবং পূজার খরচ এইরূপ —প্রতিমা ১০ টাকা, প্রতিমার সাজ ১০ টাকা, পুরোহিত ৮ টাকা, ঢাকি ৮ টাকা এবং আনুষঙ্গিক ২৫/৩০ টাকা। ইহা হইতে ষষ্ঠী পূজার জন্য ফলমূল এবং কাপড় গামছার ব্যবস্থা করিতে হইত। সিঙ্গুর হইতে পুরোহিত আসিতেন। ষষ্ঠীর দিন হইতেই বহু পূণ্যার্থী পূজা প্রাঙ্গণে জড় হইতেন, নানাবিধ ফলমূল ও নতুন বস্ত্রাদি পূজার জন্য জমা হইত। পুরোহিতের ব্যবস্থা অনুযায়ী ইহার দ্বারাই সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী পূজার কার্য্য সম্পন্ন হইত। পূজামণ্ডপে ভোগের ব্যবস্থাও ছিল। ক্রমে মিস্ত্রীঘাট অঞ্চলে মানুষের বসবাস বাড়িতে লাগিল এবং বারোয়ারীতলা ও আরও দু-এক জায়গা স্থান পরিবর্তন করিয়া বিগত পঁয়ত্রিশ বৎসর যাবৎ বর্তমান বারোয়ারীতলাতেই দুর্গাপূজার আয়োজন পর্ব সমাপ্ত হইতেছে। সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের অনুষ্ঠান আয়োজন ক্রমশই পরিবর্তিত হইতে থাকে।

পরিবর্তনের সম্পূর্ণ ইতিহাস দেওয়া এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। সর্বপ্রথম যে সমস্ত কর্মীবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই বারোয়ারী দুর্গোৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল তাঁহারা হইলেন —

বঙ্গাব্দ ১২৮২ হইতে ১৩২৪ (ইং ১৮৭৫ হইতে ১৯১৭)

ঁক্ষেত্রমোহন ঘোষ, ঁঅধরচন্দ্র সাধুখাঁ, ঁপ্রিয়নাথ পাল, ঁবিহারীলাল পাল, ঁহরিবন্ধু বাড়ুই, ঁহীরালাল পাল, ঁক্ষেত্রমোহন দাস, ঁভূতনাথ মালিক, ঁসারদা দে, ঁরাখাল পাল, ঁগুরুদাস পাল।

সৌজন্য ঃ স্মরণিকা, বারাকপুর বারোয়ারী দুর্গোৎসব, মিস্ত্রীঘাট, ১৩৮১

মণিরামপুরের মন্দির ও উৎসব

■ বিশালাক্ষ্মী

বিশাল বদনা দেবী বিশাল নয়নোজ্জ্বলে।
দৈত্যমাংসম্পৃহে দেবী বিশালাক্ষ্মী নমোহস্তুতে।।

'বিশালাক্ষ্মী দেবী তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, দ্বিভূজা, উগ্রা খড়্গা ও খেটক হস্তা, রক্তবসনা, ষোড়শবর্ষীয়া, মুণ্ডমালাভূষিতা, জটামুকুটশোভিতা, শবোপরি অবস্থিতা সর্বসৌভাগ্য ও সম্পদদাত্রী। ধর্মপূজা বিধানে বিশালাক্ষ্মীর তিন রূপ—প্রাতঃকালে কুমারী, মধ্যাহ্নে প্রৌঢ়া এবং সন্ধ্যায় বৃদ্ধা।" বিশালাক্ষ্মীর আর এক নাম বাশুলী। মুকুন্দ মিশ্রের বাশুলীমঙ্গলা কাব্যে দেবী বাশুলী বা বিশাললোচনা চণ্ডী চামুণ্ডা কালীর সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করা হয়েছে। বিশালাক্ষ্মীর মূর্তির প্রকারভেদ দেখা যায়। কোথাও অনেকটা চণ্ডী কালীর ধাঁচে, কোথাও আবার সরস্বতীর মত।

মণিরামপুরের বিশালাক্ষ্মী বলতে দেখা যাবে কয়েকটা গাছ নিজেদের মধ্যে জড়াজড়ি করে অবস্থান করছে। মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এখানে উৎসব হয়। সম্প্রতি মন্দিরের নাটমন্দির নির্মিত হয়েছে।

■ স্বামী অভেদানন্দ উদ্বোধিত শিব মন্দির

২১নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত এই শিব মন্দির। এটি প্রতিষ্ঠা করেন চূড়ামণি ঘোষ এবং সহধর্মিনী কালীদাসী ঘোষ কর্তৃক পরিকল্পিত ও নির্মিত। মন্দিরের গায়ে পাথরের ফলকে লেখা আছে—

"ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের অন্যতম সাক্ষাৎ অন্তরঙ্গ শিষ্য স্বামী অভেদানন্দ কর্তৃক অনুষ্ঠিত ২২ই আশ্বিন ১৩৩০ সাল।" নিত্য পূজা হয়।

■ জোড়া শিব মন্দির

২০নং ওয়ার্ডে এই মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের গায়ে লেখা অনুযায়ী এর প্রতিষ্ঠা কাল ১৬৮৬ শকাব্দ। পরবর্তীকালে এর সংস্কার করা হয়েছে। মন্দির

প্রাঙ্গণে বারোয়ারি দুর্গাপূজা হয়ে থাকে। শিব নিত্য পূজা পেয়ে থাকে এখানে।

■ সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির

কালীর একটি রূপ হল সিদ্ধেশ্বরী। "সিদ্ধেশ্বরী সিন্দুরবর্ণা, পীনোন্নত পয়োধরা, মাথায় জটা, রক্তপদ্মোপরিস্থিতা, চতুর্ভূজা, বাম হস্তদ্বয়ে কর্ত্রী ও খর্পর, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বর ও অভয় মুদ্রাধারিনী।" এখানকার মূর্তি ভিন্ন ধরণের। মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়ের দক্ষিণ লাগোয়া এই মন্দির। নিত্যপূজা হয়। বিশেষ বিশেষ তিথিতে পূজোর ডালির ভিড়ে মন্দির প্রাঙ্গণ উৎসবের চেহারা নেয়। কালীপূজোর পরদিন অন্নকূটের উৎসবে বহুলোক সমাগম হয়।

■ বুড়োশিব মন্দির

১৯নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত জলকলের প্রাচীরের গায়ে কিছুটা উত্তরে গির্জার আদলে নির্মিত হয়েছে বুড়ো শিবের মন্দির। এখানকার দে পরিবার এই মন্দিরের দেখভাল করেন । দে পরিবারের কোন এক পুরুষ স্বপ্নাদেশ পেয়ে গঙ্গা থেকে শিবকে তুলে এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন, আর বৃষটি বার্মা থেকে আনা হয়েছে বলে শোনা যায়। চৈত্র সংক্রান্তিতে এখানে পূজা হয়। চৈত্র মাস ৩০ দিনে হলে সেই মাসের ২৫ তারিখে আর চৈত্র মাস ৩১ দিনে হলে ২৬ তারিখে দে পাড়ার গঙ্গার ঘাট থেকে শিবকে স্নান করিয়ে স্থাপন করা হয়।

■ আনন্দময়ী কালীমন্দির

প্রাচীন এই কালীমন্দির মিস্ত্রীঘাটের মোড়ে অবস্থিত। মিস্ত্রীঘাটে স্নান সেরে দেবতার পায়ে অর্ঘ্য দেবার উদ্দেশ্যেই এই কালীমন্দির স্থাপিত হয়েছিল বলে শোনা যায়। স্নানের ঘাট এখন জঙ্গলাকীর্ণ। এই মন্দিরে নিত্যপূজা হয়ে আসছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের ফলহারিনী কালীপূজার দিন এটি স্থাপিত হয়েছিল বলে শোনা যায়। অমাবস্যা তিথিতে ফলহারিনী কালীপূজা উপলক্ষে এই মন্দির উৎসব মুখর হয়ে ওঠে। বাস কর্মীদের অনেকেই যাত্রাশুরুতে মা'র আশীর্বাদ নিতে ভোলে না এখান থেকে।

■ শ্রীগুরু ভোলানন্দ আশ্রম

মণিরামপুর গঙ্গার তীরে ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ গিরি মহারাজের প্রচেষ্টায় এই আশ্রম গড়ে ওঠে। এটিই হরিদ্বারের শ্রী শ্রী ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমের শাখা। প্রথমে দেড় কাঠা জায়গা পাওয়া যায় সাধুচরণ ঠাকুরের কাছ থেকে, যা দিয়ে 'রাধাগোবিন্দজী' সেবার জন্য একটি মন্দির গড়ে ওঠে। পরে

সেই মন্দির সংস্কার করে ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ শিব মন্দির স্থাপন করা হয়। বহুলোকের দান রয়েছে এই আশ্রমের বিস্তারে। স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের শিষ্যকে অবলম্বন করে আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি ঘটানই এই আশ্রমের উদ্দেশ্যে। এই আশ্রমের পরিচালনায় রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বৃদ্ধাশ্রম এবং কন্যাশ্রম। তবে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আশ্রমের পরিচালন থেকে বেরিয়ে এসেছে। আশ্রমের পরিচালনায় ছাত্রদের থাকার জন্য হস্টেল রয়েছে। নিত্য পূজা ছাড়াও শিবরাত্রি উপলক্ষে নানারকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বর্তমানে উৎসবের জাঁকজমক কমেছে। একটি কারীগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ছিল। বর্তমানে সেটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন।

■ শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ মন্দির

মণিরামপুর চিত্রবাণী সিনেমা হলের পাশেই অবস্থিত এই মন্দির স্থাপিত হয় ১৩০৫ বঙ্গাব্দে। মা আনন্দময়ী দাসীর মুখে স্বপ্নাদেশ শুনে পুত্র চন্দ্রমোহন সা বেনারস থেকে রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহ নিয়ে এসে রাসপূর্ণিমা তিথিতে স্থাপন করেন। একসময় রাস উপলক্ষে এই মন্দির উৎসব মুখর হতো, বসত যাত্রাগান আর পুতুল নাচের আসর। এখানে শিব ও লক্ষ্মী নারায়ণেরও মূর্তি পূজা হয়ে থাকে।

■ মান্নাবাড়ির অন্নকূট উৎসব

মান্নাপাড়ার মান্নাবাড়িতে প্রতি বছর ২০ জুন এই উৎসব হয়ে থাকে। বহু লোক সারাদিন ধরে এখানে ভোগগ্রহণ করে থাকেন। স্তূপাকার ভাতের পাশেই বাইশরকম ভাজা ছাড়াও বহু রকমের ভোগ সাজানো হয়।

■ রাধাগোবিন্দ মন্দির

বেনেপাড়ার গোবিন্দ বাটীর এই মন্দির পুরানো। গোবিন্দ কষ্টি পাথরের আর রাধিকা অষ্ট ধাতুর। জন্মাষ্টমী, রাস, দোল উপলক্ষে উৎসবের দোলা লাগত। নিত্য পূজা চালু আছে।

অসংগঠিতভাবে চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়কের মেলা বসে মণিরামপুরে। একসময় সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের সামনে চড়ক গাছে গাজন সন্ন্যাসীরা ঘুর পাক খেত। একালের মণিরামপুরে জম-জমাট মেলা বসে কালীপূজাকে কেন্দ্র করে। পূজা একদিনে শেষ হলেও চারদিন ধরে চলে মেলা। দূর-দূরান্ত অঞ্চল থেকেও দর্শনার্থীরা এখানে ভিড় জমায়।

মণিরামপুর-সদরবাজারে সঙ্গীত চর্চার সেকাল একাল

শিবরতন বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা সময় ছিল যখন মণিরামপুরের বিভিন্ন এলাকায় পারিবারিক সঙ্গীত চর্চা গড়ে উঠেছিল। মণিরামপুর গোয়ালপাড়া নিবাসী স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার ঘোষ মহাশয়ের বাড়িতে একটা সঙ্গীত চর্চাকেন্দ্র ছিল। স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার ঘোষ মহাশয় একজন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পীরা তাঁর বাড়িতে নিয়মিতভাবে যাওয়া আসা করতেন। বাড়ির বাইরের দিকের ঘরটা সব সময়ই গান বাজনায় ভরপুর হয়ে থাকতো। মনে আছে খুব ছোট্টবেলায় সকালে একবার তাঁর বাড়িতে একটি গান বাজনার অনুষ্ঠানে আমার বড়দার সঙ্গে আমি গিয়েছিলাম। ঐ অনুষ্ঠানে তখন তিনি গান গাইছিলেন। খুব একটা গান বুঝতাম না, তবে ভালবাসতাম। মনে হচ্ছিল সকালের একটা আমেজ যেন আমার শরীর মনকে ভরিয়ে রেখেছে। তাঁর সঙ্গে তবলায় সঙ্গত করছিলেন রানাঘাটের বিখ্যাত তবলিয়া স্বর্গীয় ভোলানাথ ঘোষ মহাশয়। স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার ঘোষ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র স্বর্গীয় বিশ্বনাথ ঘোষ মহাশয় প্রখ্যাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে পশ্চিমবাংলার সঙ্গীত মহলে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। যাইহোক, পরবর্তীকালে স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার ঘোষ মহাশয় যৌথ পরিবারের আঙিনা ছেড়ে মণিরামপুর বেনেপাড়ার নিকটে নিজ বাড়িতে চলে আসেন। এইখানেও বাইরের ঘরটিতে নিয়মিতভাবে গান বাজনা চলতো। তখন বিশ্বনাথদা একজন পরিপূর্ণ সুগায়ক হিসাবে পরিচিত। আমি মাঝে মধ্যেই তাঁর বাড়িতে তাঁর গান শুনতে যেতাম। আমার সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠতাও ছিল। একদিন আমাকে বললেন—তুমি আগামীকাল আমাদের বাড়িতে চলে এস। কয়েকজন ভারত বিখ্যাত শিল্পীর আসার কথা আছে। তারপরদিন ঠিক বিকালে আমি পৌঁছে গেলাম। আমি যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পেলাম একটা গাড়ি বিশ্বনাথদার বাড়ির সামনে এসে হাজির হলো। দেখলাম ভারতবিখ্যাত সরোদিয়া ওস্তাদ হাফেজ আলি খাঁ সাহেব এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র ওস্তাদ আমজাদ আলী খাঁ সাহেব গাড়ি থেকে নেমে আসছেন। তাঁদের ঠিক পিছনে বেনারসের প্রখ্যাত তবলিয়া পণ্ডিত নানকু মহারাজ ছিলেন। একটি মজার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। চায়ের পর্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পর ওস্তাদ হাফেজ খাঁ সাহেব বিশ্বনাথদাকে সিগারেট আনতে বললেন। বিশ্বনাথ দা আমাকে ডেকে টাকা দিয়ে বললেন খুব দামী সিগারেট আনতে। তখনকার দিনে ক্যাপস্টান খুব দামী সিগারেট। আমি ঐ সিগারেট ২ প্যাকেট কিনে এনে দিলাম।

খাঁ সাহেব আমার হাতে প্যাকেট ২টি ফেরৎ দিয়ে বললেন—ক্যাভেন্ডার সিগারেট নিয়ে এস। বড়ই মুশকিলে পড়ে গেলাম। তখন ক্যাভেন্ডার সিগারেটের চল এখানে মোটেই ছিল না। খুবই কমদামী সিগারেট। কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। বিশ্বনাথদা বললেন সাইকেল নিয়ে যাও সব দোকান খুঁজে দেখো হয়ত পেয়ে যেতেও পার। সাইকেল নিয়ে বিভিন্ন দোকান খুঁজতে খুঁজেতে কোর্টের কাছে একটা দোকানে পেয়ে গেলাম। ২ প্যাকেট ক্যাভেন্ডার সিগারেট কিনে নিয়ে এসে বিশ্বনাথদার হাতে দিলাম। ক্যাভেন্ডার সিগারেট পেয়ে খুব খুশী হয়ে একটা ধরালেন। সিগারেটটা ধরিয়ে শিশুর মত হাসতে লাগলেন। পাকা দাড়ি, মাথায় ফেজ টুপি পরে বৃদ্ধ খাঁ সাহেব বেশ মজার মজার গল্প করছিলেন। ঐ অনুষ্ঠানে আমার বড়দাও গেছিলেন। বড়দা খাঁ সাহেবকে একটু সরোদ বাজাতে ভীষণভাবে অনুরোধ উপরোধ করতে লাগলেন। তখন খাঁ সাহেব বললেন—দেখো বেটা আমার নখে খুবই যন্ত্রণা হচ্ছে। আমার ছেলে আমজাদের কাছ থেকে সরোদবাদন শুনে নাও। তখন ওস্তাদ আমজেদ খাঁ সাহেবের কোনই নাম ছিল না। তাঁর বয়স ষোল কি সতেরো হবে। পড়াশুনা করছেন। বড়দা হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কোন ক্লাসে পড়। উনি বললেন ক্লাস টেন এ পড়ি। তাঁকে দেখে মনে হল সৌম্যকান্ত চেহারার মধ্যে শান্ত ভদ্র এবং তা ভাব যেন ফুটে বেরুচ্ছে। যা এখনও তাঁর মধ্যে সেই স্বভাবগুলি প্রকাশ পায়। ওস্তাদ আমজেদ আলী খাঁ সাহেব সরোদ ধরলেন। যেন মনে হলো সুরের মধ্যে তিনি ধ্যানস্ত হয়ে গেলেন। ঐতিহ্য অনুসারী পরিচ্ছন্ন বাদনশৈলী। আলাপ, জোড়, ঝালা এবং বিলম্বিত ও দ্রুত দুটি গতের মাধ্যমে রাগের পরিপূর্ণ বিন্যাস, যা আমাদের সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। তাঁর বাজনায় সৌন্দর্য এবং বুদ্ধিদীপ্ত ঝালায় উল্লাস ও উত্তেজনা তাঁর প্রতিভার পরিচয় দেয়। তবলায় সঙ্গত করছিলেন পণ্ডিত নানকু মহারাজ, যিনি ছিলেন আগাগোড়া বিশ্বস্ত। ত্রুটিহীন সঙ্গত ও সওয়াল-জবাব বাস্তবিকই অনবদ্য। কত যে শ্রোতা তাঁর বাজনা শুনছিলেন তা বলে বোঝাতে পারব না। ভিড়ে রাস্তা যেন উপচে পড়ছে। এই ভাবেই বিশ্বনাথ দা মাঝে মধ্যেই ভারত বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীদের নিয়ে আসতেন সাধারণ মানুষদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত মনস্ক করে তুলবার জন্যে। অনেক প্রখ্যাত শিল্পী এবং সঙ্গীত গুণীজন তাঁর বাড়ীতে আসতেন। তাঁদের সঠিক নাম ঠিকমত বলতে পারবো না। তবে রানাঘাটের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক এবং কলিকাতার বেতার কেন্দ্রের অনতম উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী শিব কুমার চট্টোপাধ্যায় (গুণীন চ্যাটার্জী) তাঁর বাড়িতে নিয়মিতভাবে আসতেন। বিশ্বনাথ দা নিজেও একজন বিখ্যাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। তিনি কলকাতার বিখ্যাত সব সঙ্গীত সম্মেলনে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন, যেমন তানসেন সংগীত সম্মেলন, নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলন সাদারঙ্গ আদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন ইত্যাদি। বিশ্বনাথদা সঙ্গীত শিক্ষা কার কাছে গ্রহণ করেছিলেন সঠিক ভাবে কিছু বলতে না পারলেও তাঁর বাবা তো বটেই আরও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ওস্তাদদের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

বিশ্বনাথদার শিল্পী সুলভ মনের কথা একটু না বললে মনে হয় তাঁর কথা সম্পূর্ণ হবে না। তাঁর টাকা পয়সার কোন চাহিদা ছিল না। তিনি সামান্য টাকার পরিবর্তে অথবা টাকা না নিয়েও অনেক ছাত্র-ছাত্রীদের গান শেখাতেন। তিনি গানকে ভালবাসতেন। বিভিন্ন বাড়িতে গিয়েও গান গাইতেন। যেমন ছিল সেই সময়কার শিল্পীদের মানসিকতা তেমনি ছিল শ্রোতাদের আগ্রহ এবং আন্তরিকতা।

আমি এই অঞ্চলে সঙ্গীত চর্চা যাঁরা করেন এবং সঙ্গীত অনুরাগীরা, যাঁরা বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীতানুষ্ঠানে সঙ্গীত রসস্বাদনের জন্য কত উৎসাহ এবং আনন্দ নিয়ে স্বতস্ফুর্তভাবে যোগদান করতে ভালবাসতেন, সেই ঐতিহ্যগুলো তুলে ধরতে চাই। বর্তমানে যাত্রার যে রূপ দেখতে পাই, তাতে শুধু নাটকের প্রাধান্য খুব বেশী থাকে। সেই সময় যাত্রার ঐরূপ ছিল না। সেই সময়কার যাত্রায় নাটক তো অবশ্যই থাকতো। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন ধরণের গানের প্রাধান্য এত বেশী থাকতো যে লোকে বলত যাত্রাগান শুনতে যাচ্ছি। বিখ্যাত গায়কেরা যাত্রা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের গান গেয়ে শ্রোতা বা দর্শকদের মনোরঞ্জন করতেন। বিবেকের নাম ভূমিকায় তাঁরা গান গেয়ে নাটকের পরবর্তী দৃশ্যে কি ঘটবে বা ঘটতে চলেছে সেই সব কথা গানের মাধ্যমে জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিতেন। টপ্পাঙ্গের গান, ধ্রুপদাঙ্গের গান, রাগ মিশ্রিত ভক্তি সঙ্গীত ইত্যাদি সবরকমের গান সেই সময়কার গায়কেরা যাত্রার মধ্যে পরিবেশন করতেন। সানাই ছিল যাত্রার প্রধান অঙ্গ। আমি দেখেছি বিখ্যাত বাংলা টপ্পা গায়ক সুকণ্ঠী স্বর্গীয় কালিপদ পাঠক মহাশয় যাত্রা দলের সঙ্গে এসে বিবেকের নাম ভূমিকায় কত গান গেয়েছেন; কত সংগীত রসিকদের তিনি আনন্দ দান করেছেন, তা বলে বোঝাতে পারবো না। বারাকপুর মণিরামপুর অঞ্চলে তৎকালীন চিত্রবাণী সিনেমা হলের পাশে ৺চন্দ্রমোহন সা'র ঠাকুর বাড়ীতে প্রতি বছর রাস পূর্ণিমার সময় ১ মাস যাবৎ যাত্রাগানের অনুষ্ঠান হ'তো। প্রতি শনিবার এবং রবিবার সন্ধ্যায় বিভিন্ন যাত্রার দল এসে, যাত্রাগান করে যেতেন। খুব জাঁকিয়ে যাত্রার আসর বসতো। স্থানীয় দল থাকতই। উপরন্তু কলকাতা, হাওড়া, বালী, উত্তরপাড়া প্রভৃতি স্থান থেকে যাত্রার দলগুলি এখানে আসতো। যা টাকা খরচ করা হতো তা সবটাই ৺চন্দ্রমোহন সা'র এষ্টেট্ থেকে ব্যয় করা হত। সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকতো যাত্রাগানের আসরটি। বারাকপুরবাসীরা সব দুঃখ কষ্ট বেশ কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে গিয়ে কত আনন্দ নিয়ে বাড়ী ফিরে যেতেন তা বর্তমান প্রজন্মের মানুষদের কিছুতেই অনুভব করানো সম্ভবপর নয়। আমিও সেই যাত্রাগানের আসরে বাবা মার সঙ্গে যেতাম। যাত্রা শুরু হওয়ার আগে কনসার্ট বাজানো হত, বর্তমানে যাকে আমরা বলি অর্কেষ্ট্রা। আমার খুব ভাল লাগতো ঐ কনসার্ট শুনতে। প্রায় ১ ঘন্টা ধরে ঐ বাজনা চলতো। যাইহোক, একটা জিনিষ লক্ষ্য করার বিষয় আছে, সেই সময় সঙ্গীত শিল্পী এবং সঙ্গীত রসিকদের মধ্যে একটা অপূর্ব মেল বন্ধন তৈরি হয়েছিল। তখন সঙ্গীত শিল্পী চাহিদার তুলনায় খুবই কম। কারণ প্রকৃত সঙ্গীত শিল্পী না হলে কেউই নিজেকে প্রকাশ করতো না।

তাঁরা সংগীত শিল্পত্বের ওজন বুঝতেন। অথচ সংগীতমনস্ক সাধারণ মানুষের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল। তার একটা কারণ ছিল, সঙ্গীতমনস্করা সঙ্গীত রসস্বাদনের জন্য বিভিন্ন শিল্পীদের বাড়িতে গিয়ে নিয়মিতভাবে গান শুনে আসতেন। ঠিক যেন মৌমাছির মধু সংগ্রহের মত। কিন্তু বর্তমানে দেখছি সঙ্গীত শিল্পীর সংখ্যা অনেক আর প্রকৃত শ্রোতার সংখ্যা হাতে গুনে বলা যায়। কিন্তু কেন এমন হলো? আমার মনে হয় সঙ্গীতের পূর্বজ্ঞান বিচারের অভাব। বাড়ীতে ভাল ভাল খাবার থাকতে বাইরের রাস্তার ধারে অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার মত।

পারিবারিক সংগীতচর্চা কেন্দ্র সদরবাজারের অন্তর্গত মুরগী মহলে স্বর্গীয় রবীন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের বাড়িতে খুবই জমজমাটভাবে গড়ে উঠেছিল। স্বর্গীয় রবীন্দ্র বসু মহাশয় একজন বিরাট মাপের সঙ্গীতমনস্ক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর কন্যা শ্রীমতী অর্চনা বসুকে বিভিন্ন সঙ্গীত শিক্ষকের দ্বারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিনী করে তুলেছিলেন। পুত্রদের মধ্যেও দুই পুত্রকে খ্যাত নামা তবলাবাদকদের কাছে তবলা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রী পার্থ বোস বেনারসের পণ্ডিত কিষেন মহারাজের কাছে তবলা শিক্ষা গ্রহণ করলেও বিভিন্ন কারণে তার শিক্ষা স্থগিত রাখতে হয়। কিন্তু তৃতীয় পুত্র শ্রী শ্যামসুন্দর বোস বর্তমানে বারাকপুর অঞ্চলে খ্যাতনামা তবলা বাদক এবং শিক্ষক হিসাবে তার অবদান বারাকপুরবাসীদের কাছে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। তিনি পণ্ডিত শ্যামল বসুর কাছে দীর্ঘদিন ধরে তবলা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এই অঞ্চলে অনেক প্রতিষ্ঠিত তবলা বাদক তাঁরই ছাত্র। বারাকপুর তথা কলকাতায় বড় বড় সঙ্গীত অনুষ্ঠানে কখনও তবলা লহরায় বা কখনও তবলা সঙ্গতে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় রেখেছেন। স্বর্গীয় রবীন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী অর্চনা বসু বারাকপুর অঞ্চলে বিশিষ্ট উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গায়ন ভঙ্গী এবং স্বর বিস্তার, ছোট ছোট সুক্ষ্ম তান, গমক প্রভৃতি খুবই সুন্দর ছিল। বিশেষ করে লঘু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে অর্থাৎ ভজন, গীত, ঠুমরী ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের গানে সুন্দর চলন, তাল ও ছন্দের অপূর্ব মিলন ঘটিয়ে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করার ক্ষমতা লক্ষ্য করার বিষয় ছিল। স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বাইরের দিকের ঘরটিও সব সময় গানে বাজনায় ভরপুর হয়ে থাকতো। তাঁর বাড়িতে বিখ্যাত বিখ্যাত শিল্পীদের আনাগোনা ছিল। বেনারসের বিখ্যাত তথা ভারত বিখ্যাত তবলা বাদক পণ্ডিত কিষেন মহারাজের পদধূলিও তাঁর বাড়িতে পড়েছিল। যদিও বিশেষ কারণবশতঃ ঐ দিন আমি তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত থাকতে পারিনি। তবুও শুনেছি সারাদিন তাঁর বাড়িতে পণ্ডিতজীর তবলা বাদনে ঘরটা মুখরিত হয়ে উঠেছিল। বিখ্যাত বেহালা বাদক রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপক পণ্ডিত রবীন ঘোষ প্রায়দিনই তাঁর বাড়িতে আসতেন। আমি পণ্ডিত রবীন ঘোষের বেহালা বাদন তাঁর ঐ ঘরে বসেই শুনেছি। এখনও মনে আছে তিনি কিরবানী রাগে বেহালা বাজিয়ে বিস্তারের এক মনমুগ্ধকর পরিবেশ

তৈরী করে আমাদের সকলের হৃদয়কে অনুরণিত করে তুলেছিলেন। বিলম্বিত গতে বিস্তার তানকারি ও তেহাইয়ের বৈচিত্র্য ছিল। তান সমাপনে গতের মুখে উপনীত হওয়ার শৈলী সকলের কাছ থেকে প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছিলেন। স্বর্গীয় রবীন্দ্র নাথ বসু মহাশয় কতখানি সঙ্গীত অনুরাগী ছিলেন তা একটি ঘটনাকে উল্লেখ না করলে তাঁকে বোঝা যাবে না। আমি একদিন শ্রীরামপুরের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের কার্ড দিতে তাঁর বাড়িতে সন্ধ্যার সময় গিয়েছিলাম। গানের ঘরটাতে ঢুকে অবাক হয়ে দেখি মেঝের উপর একটি মাঝারিগোছের রেডিও ভেঙ্গে পড়ে আছে। চারিদিকে যন্ত্রাংশগুলি ছড়িয়ে পড়ে আছে। আর রবিদাকে দেখি একটা খাটের ওপর খুব গম্ভীর মুখে বসে ধূমপান করছেন। যাইহোক, সাহস হলো না রবিদাকে কিছু জিজ্ঞেস করার। পাশের ঘরে গিয়ে পার্থকে জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপারটা কি ? পার্থ বললো ব্যাপারটা কিছুই নয়, বাবা মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান ঐ রেডিওতে শুনছিলেন। সেই সময় রেডিওটা খুব ডিসটার্ব করছিল। পরিষ্কার গান শোনার জন্য অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করে যখন দেখলেন কিছুই করতে পারলেন না অথচ মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান শেষ হয়ে গেছে তখন তিনি প্রচণ্ড রেগে গিয়ে মেঝেতে আছাড় মেরে রেডিওটা ভেঙ্গে ফেললেন। এইখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে, যদিও তিনি তাঁর রাগের মাত্রাকে ধরে রাখতে পারেন নি, ক্ষতি হলো তাঁরই, তবুও তাঁর প্রবল সঙ্গীত পিপাসা যে কত বড় মাপের ছিল তা একমাত্র সঙ্গীত রসিক ব্যক্তিরাই বুঝতে পারবেন। সেই সময় এই রকম ভাবে চারিদিকে সঙ্গীতমনস্ক ব্যক্তিদের বাড়ীতে সঙ্গীতের মধু ভাণ্ড থাকতো, থাকতো অবারিত দ্বার সর্বসাধারণের জন্যে। ছিল না কোন বিধি নিষেধ, বরঞ্চ থাকতো সর্বসাধারণের জন্যে সাদর আহ্বান।

আমার দীর্ঘ জীবনের স্মৃতিচারণ করতে করতে চলে যেতে চাই 'সদর বাজার অন্তর্গত বাজাজ মহলে সেই পুরানো জীর্ণ বাড়ির বাইরের দিকের ঘেরা বারান্দার মধ্যে, যেখানে আমার বাবা একটা চৌকির উপর বসে দলিল লেখার কাজ করতেন। চৌকিটার সামনে একটা বেঞ্চ ছিল, মক্কেলরা ঐ বেঞ্চে এসে বসতেন। ঠিক ১১টা নাগাদ চান খাওয়া দাওয়া সেরে অফিসে যেতেন। অফিস থেকে ফিরে জলখাবার চা খেতে বাজার যেতেন। বাজার থেকে ফিরে এসেই হারমোনিয়াম এবং তবলা নিয়ে গান বাজানায় বসে যেতেন। বাবার সঙ্গে যোগদান করতেন স্বর্গীয় ডাঃ সতীশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের কম্পাউণ্ডার স্বর্গীয় রাম লাল রায় মহাশয়। তাঁরা শুধুমাত্র নিজেদের ক্লান্তি এবং মানসিক অবসাদকে দূরে সরিয়ে রেখে নিছক আনন্দ পাওয়ার জন্য গান গাইতেন। সঙ্গীত শিল্পী হওয়ার কোন উচ্চাশা ছিল না, ছিল না কোন আসরে গান গাওয়ার বাসনা। শুধু শরীর মনের আনন্দের তাগিদেই গান তাঁদের উপর নেশার মত চেপে বসেছিল। কোন দিনই তাঁদের গান বাজনা বন্ধ হতে দেখিনি। আমি প্রায় প্রতিদিনই ঐ বেঞ্চের ওপর বসে তাঁদের গান শুনতাম। কোন কোন দিন অনেক রাত পর্যন্ত চলতো। কখনও কখনও আমি বেঞ্চের ওপর ঘুমিয়ে পড়তাম।

গানের শেষে বাবা আমাকে ডেকে ভেতরে নিয়ে যেতেন। সেই সময় আমি প্রায়ই দেখতাম, আমাদের পাড়া দিয়ে যে সব অফিস যাত্রী মণিরামপুরের বাড়িতে হেঁটে ফিরতেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত গান গাইতেন বা গান শুনতে ভালবাসতেন। দেখেছি, অনেকেই রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে বেশ কিছু কিছুক্ষণ গান শুনে বাড়ি ফিরতেন। আবার যাঁরা গান গাইতে পারতেন, তারা দু-চারটা গান গেয়েও বাড়ি ফিরে যেতেন। সরলমতি সেই দিনকার মানুষগুলো শুধুমাত্র গানের মধ্যে শরীর মনে আনন্দের খোরাক জুগিয়ে চলতেন। কি অপূর্ব ছিল সেই সময়ের দিনগুলো। কত সরল, সঙ্কোচহীন মন নিয়ে সেই সময়কার মানুষেরা চলাফেরা করতো। আপন লোকের মত শুধুমাত্র গান গাওয়া বা গান শোনার আনন্দ নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে কিছুক্ষণ আমাদের বাড়িতে গানের মধ্যে কাটিয়ে যেতেন। তখনকার মানুষের মধ্যে এই রকম সঙ্গীত অনুভূতি ছিলা। আমাদের পরিবারে প্রায় সকলেই কিছু না কিছু সঙ্গীত চর্চা করতেন। আমার বাবার খুব সুরেলা কণ্ঠ ছিল। প্রাচীন বাংলা গান, টপ্পাঙ্গের বাংলা গান, কিছু সেকালের হাস্যরসাত্মক গান, ধ্রুপদাঙ্গের গান গাইতেন। গানের মধ্যে তাঁর তাল লয়ের স্বচ্ছন্দ গতি ছিল। বাবার মুখে শুনেছি আমার ঠাকুরদাও নাকি খুব ভাল গান গাইতে পারতেন। তিনিও ছিলেন দলিল লেখক। সেই প্রাচীন কালে মানুষের মধ্যে সঙ্গীতবোধ যে কত প্রবল ছিল, একটি ছোট ঘটনা না বললে মনে হয় আমার বক্তব্য ঠিক উপলব্ধি করা যাবে না। বর্তমানে বারাসাত রোড়ের ধারে মোহনপুরে আমাদের আদি বাড়ি। আমার ঠাকুরদাও বারাকপুর রেজিস্ট্রী অফিসে গিয়ে দলিল লিখে কিছু রোজগার করতেন। বাবার মুখে শুনেছি তখন তাঁদের অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। মেঠো রাস্তা ছিল তখনকার বারাসাত রোড। দু একটা গরুর গাড়ি এবং ঘোড়ার গাড়ির আসা যাওয়া ছিল। মোহনপুর গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে বারাকপুর স্টেশনের নিকট সাব রেজিস্ট্রি অফিসে আমার ঠাকুরদাকে আসতে হতো। বারাসাত রোড এবং মোহনপুর গ্রামে যাওয়ার সংযোগস্থলে একটা ছোট মুদি দোকান ছিল। ঠাকুরদা বাড়ির থেকে বেরিয়ে সেই ঐ সংযোগস্থলে আসতেন। ঐ মুদির দোকান থেকে ডাক আসতো "কালিদা একটু তামাক খেয়ে যান"। তামাকের নাম করে তাঁকে গানে বসিয়ে দিতেন। গান পাগল আমার ঠাকুরদা একটার পর একটি গান গেয়ে চলতেন। যাঁরা বসে গান শুনতেন তাঁরা কিছুতেই ছাড়তে চাইতেন না। কখনও বাংলা টপ্পা, কখনও ধ্রুপদের গান আবার কখনও রামায়ণ গান বা কীর্তনাঙ্গের রাধা-কৃষ্ণের গান খালি গলায় গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে দিতেন। সময়ের খেয়াল থাকতো না। এই ভাবে যখন বেলা গড়িয়ে গেলো বাড়ি ফিরে আসতেন। ঠাকুরমা খুবই রাগারাগি করতেন। কোন রোজগার নেই অতগুলো ছেলে মেয়ে নিয়ে কি করে সংসার চালাবেন ভেবেই অস্থির হয়ে যেতেন। সঙ্গীতপ্রেমী মানুষের সংসারের ওপর হয়তো একটু শিথিল দৃষ্টি থাকতে পারে কিন্তু তাঁকে সংসার নির্লিপ্ত মানুষ বলা যায় না। আমার মনে হয় যে কোন সাধনাই সাধকদের সামান্য সংসার বিমুখ

করে তোলে। জীব ধর্মের বিশিষ্ট রূপ প্রকাশ পায় সঙ্গীতের মাধ্যমে। গ্রীক দার্শনিক প্লেতো বলেছেন "Music for Soul" যেমন খাদ্য দেহের ক্ষুধা নিবৃত্তি করে শরীরের পুষ্টি সাধন করে তেমনি সঙ্গীত আত্মার ক্ষুধাকে নিবৃত্তি করে চিত্তকে উন্নীত করে। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "সঙ্গীত একটি প্রাণধর্মী জিনিস এবং প্রাণের বিকাশ তার মধ্যে আছে।" আমার মনে হয় চিত্তকে অনুভূতিশীল, নমনীয় এবং সংযত করে রাখার জন্যে সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা আছে। শোকে, দুঃখে, আনন্দে, সুখে জীবনের সব অবস্থায় সঙ্গীতের ব্যবহার মানব সমাজের মধ্যে আছে। কারণ সঙ্গীত চিত্তের উপর সবসময় ক্রিয়াশীল।

সদর বাজারের অন্তর্গত বাজাজ মহলে স্বর্গীয় রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ির রাস্তার দিকে একটি সুপ্রশস্থ ঘেরা সুন্দর বারান্দায় প্রায়দিনই খুব জমজমাটভাবে সঙ্গীতের আসর বসতো। পশ্চিম বাংলার বিখ্যাত টপ্পাগায়ক স্বর্গীয় কালিপদ পাঠক মহাশয় সেই আসরের মধ্যমণি হয়ে থাকতেন। আমরা সবাই সেই আসরে উপস্থিত থাকতাম। টপ্পা গান সাধারণতঃ পাঞ্জাবেই বেশী প্রচলন ছিল। তাই টপ্পার একটা ধারাকে বলা হয় পাঞ্জাবী টপ্পা। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় লক্ষ্মৌ, রেওয়া প্রভৃতি সংস্কৃতির পীঠস্থানে টপ্পা গান ছিল সভ্য সমাজের বাইরে। পশ্চিম বাংলার বিখ্যাত টপ্পা গায়ক স্বর্গীয় কালিপদ পাঠক মহাশয় নিধুবাবুর বাংলা টপ্পা গান গাইতেন। সাধক রামপ্রসাদের রচিত টপ্পাঙ্গের অনেক শ্যামা সঙ্গীতও গাইতেন। তাঁর গায়ন পদ্ধতি এবং সুরালাপের পরিপাটি শ্রোতাদের এমন জায়গায় পৌঁছে দিত যা সহজেই অন্তঃকরণ স্পর্শ করত। একটির পর একটি গান গেয়ে চলতেন। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতেন। তানপুরার সুরকে বন্ধ করা চলতো না। তিনি বলতেন সুরের রেশ যেন ঘর থেকে চলে না যায়। যাইহোক, রাত্রি ১২টা পর্যন্ত সেই অনুষ্ঠান চলতো। স্বর্গীয় রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মাঝে মধ্যেই নিজ বাড়িতে তাঁকে এনে বাংলা টপ্পা গানের এক সুন্দর অনুষ্ঠান করতেন। এই অনুষ্ঠানে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। সবার প্রবেশ অবারিত ছিল।

বারাকপুর মণিরামপুরে "গীতায়ণ" নামে একটি বহু পুরাতন সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র আছে। অনেক ছাত্র-ছাত্রী ঐ সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র থেকে সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন সময়ে বারাকপুর অঞ্চলের অনেক খ্যাতনামা সঙ্গীত শিক্ষকের দ্বারা সঙ্গীত শিক্ষা দান করা হয়েছে এই সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্রে। এলাহাবাদ, প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতির মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। বহু সঙ্গীতঅনস্ক গুণীজনেরা এই সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্রটা পরিচালনা করে থাকেন। এখানে বিভিন্ন ধরণের সঙ্গীতে শিক্ষা দান করা হয়।

বারাকপুর অঞ্চলে আর একটি সুন্দর নৃত্যকলা শিক্ষা কেন্দ্র মণিরামপুর অন্তর্গত মিস্ত্রীঘাটের নিকট বিশালভাবে গড়ে উঠেছে। ঐ নৃত্যকলা শিক্ষা কেন্দ্রের মুখ্য পরিচালক পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত শিল্পী শ্রী প্রদীপ্ত নিয়োগী। প্রতি

বছর প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতির মাধ্যমে বার্ষিক পরীক্ষার দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের মান নির্ণয় করা হয়। কত্থক, ভারতনাট্যম, মণিপুরী ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের নৃত্যকলার শিক্ষা দান, এই শিক্ষা কেন্দ্রে নিয়মিত ভাবে দেওয়া হয়ে থাকে। শ্রী প্রদীপ্ত নিয়োগী জয়পুর ঘরানার কত্থক নৃত্য শিল্পী। কত্থক নৃত্য ছাড়াও তিনি বিভিন্ন নৃত্য কলাকে একাগ্রতা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে অধিগত করেছেন। তিনি ভারতনাট্যম, ব্যালে এবং বিভিন্ন ধরণের নৃত্যে যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় রেখেছেন। শ্রী নিয়োগী সুকান্ত সদনে প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটা মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান করে থাকেন। তিনি প্রতি বছর বারাকপুর সুকান্ত সদনে আর একটা অনুষ্ঠান করে থাকেন। বারাকপুরবাসীদের অতিপ্রিয় "বারাকপুর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন"।

এরই পাশাপাশি সুকান্ত সদনে আর একটা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন বেশ কয়েক বছর ধরে বিখ্যাত সঙ্গীত সম্মেলন হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। এই সঙ্গীত সম্মেলনটা "নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি সঙ্গীত সম্মেলন" নামে খ্যাত। বারাকপুরবাসীর এই সঙ্গীত সম্মেলনের মাধ্যমে ভারত বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীদের বিভিন্ন সঙ্গীত কলা শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। স্বর্গীয় নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত বিখ্যাত সেতার শিল্পী ছিলেন। তিনি ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব এবং পরবর্তীকালে তাঁরই সুযোগ্য পুত্র ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ সাহেবের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যু সমস্ত মানুষকে তাঁর সঙ্গীতরস আস্বাদনের সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত করেছে।

লেখক পরিচিতি ঃ বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী

নাট্যচর্চায় মণিরামপুর

—শঙ্কর আচার্য

মণিরামপুরের নাটক চর্চার সেকাল একাল নিয়ে লিখতে বসে বেশ বুঝতে পারলাম কাজটা আদৌ সহজ নয়। বাংলা নাটকের বয়স ২০০ বছর পেরিয়েছে মাত্র। সেক্ষেত্রে মণিরামপুরের নাটক চর্চার ইতিহাসের খুব গভীরে ডুবতে হবে না বুঝতে পারলাম। কিন্তু কতটা ডুব দিলে কাজ হবে অর্থাৎ মণিরামপুরের নাটক চর্চার মূল ধরতে পারব সেটাই ভাবতে লাগলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল কাজী নজরুলের একটি বিখ্যাত গান, "গঙ্গা সিন্ধু নর্ম্মদা কাবেরী যমুনা ওই,/বহিয়া চলেছে আগের মতন/কইরে আগের মানুষ কই ?"। খুঁজতে লাগলাম পুরানো মানুষ। যাদের নাটকের সাথে ছিল প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। অর্থাৎ যাঁরা থাকতেন মঞ্চে এবং দর্শক আসনে। কিন্তু দুটো বিষয়েই আমাকে নিরাশ হতে হল। তেমনভাবে পুরনো মঞ্চকর্মীদের বা দর্শকদের পেলাম না যাদের নিয়ে ইতিহাসের গভীরে ডুব দেওয়া যায়। এমনকি তেমন কোন তথ্যও পাওয়া গেল না। তবে একজন তো আছেই—পিলু মজুমদার।

প্রখ্যাত আবৃত্তিকার প্রদীপ ঘোষের পিতা চিন্ময় জীবন ঘোষ মহাশয়ের হাত ধরেই মণিরামপুরের মঞ্চস্থ প্রথম নাটক 'সাজাহান'। ১৯৪৮/'৪৯ সাল নাগাদ নাটকটি মঞ্চস্থ হয় কোর্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রযোজনাতে। চিন্ময় জীবন ঘোষ এই নাটকে সাজাহানের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এরপর 'কেদার রায়', 'বঙ্গে বর্গী' ইত্যাদি আরও নাটক হয়। তবে এই সব নাটকে যাত্রার একটা ছায়া স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা গেছে। উল্লেখ করার দাবী রাখে যে মণিরামপুরে যাত্রাপালার বাজার বেশ জমজমাট ছিল। রাম রসায়ণ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তণ, মঙ্গলকাব্য এই অঞ্চলের চণ্ডীমণ্ডপগুলোতে বা অন্যত্র পূজো বা অন্য উপলক্ষে বহুদিন ধরে চলতো। আর এগুলি ছিল মানুষের বিনোদনের মাধ্যম। তারপর আসে যাত্রাপালা। চন্দ্র সা'র বাগানে ছিল বাঁধান মঞ্চ। আজও আছে। বটতলা, মদনমোহন নাট্য সংস্থা, সৌখিন, বিদ্যার্থীবৃন্দ ইত্যাদি বহু সংস্থা বহু যাত্রাপালা করে এসেছে। সুতরাং এ অঞ্চলে নাটকের ধারায় যাত্রার ভূমিকা মোটেই ছোট করে দেখার নয়। তথাপি নাটকতো নাটকই, সে তো যাত্রা নয়।

নাটককে নাটকের মত করে মঞ্চে হাজির করার চেষ্টা এ অঞ্চলে যারা করেছেন তাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সত্যব্রত দাশগুপ্তের নাম। ১৯৫৩/'৫৪ সাল নাগাদ উনি মানুষের মাঝে হাজির করেন, 'ছেঁড়াতার'।

এরপর অনেকেই নাটক করতে নামেন। পিলুদাও বন্ধু প্রদীপ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে নেমে পড়েন নাটকের আসরে। তৈরি হয় অনেক নাটক। মানুষের মন জয়ী নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, মহারাজ নন্দকুমার ইত্যাদি। অনেকেই সেদিন নাটকের আসরে ভিড় করেছিলেন—শৈলেন দাস, চন্দ্রকান্ত পালিত, চিত্তরঞ্জন মিত্র (চকুদা) ও আরও অনেকে। এদের প্রত্যেকের মধ্যে আবেগ ছিল, কিন্তু দায়বদ্ধতা বা নাট্য নিবেদিত প্রাণ ছিল না। সে ধারায় থেকে গেলেন একমাত্র পিলুদাই।

১৯৫৬ সাল নাগাদ নাটককে ঘিরে যুবক-গ্রন্থী ক্ষণস্থায়ী হত বলে একবার একটি নাটক সংস্থার নাম হয় 'ক্ষণিক'। পিলুদার পরিচালনায় অনেক নাটক হয় এই সংস্থায়। উল্কা, চার অধ্যায়, মেঘে ঢাকা তারা ইত্যাদি। পিলুদা ইতিমধ্যেই অভিনয় ও পরিচালনা উভয় ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা দিয়ে মানুষের মনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। বর্তমানের প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক প্রভাত রায় ও প্রয়াত চিত্র পরিচালক অজিত গাঙ্গুলী পিলুদার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। প্রভাত রায় নাটকে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করতেন। এই সময়ে নাটক যাঁরা করতেন তাদের মধ্যে প্রদীপ দত্ত (ইন্টুদা) সর্বজন পরিচিত ছিলেন। সেই সময় অভিনেত্রী পাওয়া ভীষণ মুশকিল ছিল। তাই পুরুষরা নারী চরিত্রে অভিনয় করেছেন বহু জায়গায়। নারী চরিত্রে ইন্টুদা অভিনয় করতেন অনবদ্য।

১৯৫৯ সাল নাগাদ ক্ষণিকে ভাঙ্গন আসে। সে ভাঙ্গন ক্ষণিক আর সামলাতে পারেনি। মণিরামপুরের নাটক চর্চার ধারাতে ক্ষণিক চিরদিনের জন্য নিভে গেলেও তার স্বল্পায়ুতে বেশ কিছু ভাল নাটক উপহার দিয়ে গেছে।

ক্ষণিক থেকে যারা বেরিয়ে এসেছিলেন এদিক ওদিক কিছুদিন ঘোরার পর তাদের মনে আবার একটা নাট্য সংস্থাকে জন্ম দেওয়ার তীব্র কামনা জাগে। এবারের নাট্য সংস্থার নাম, 'অন্তরাল-নাট্যগোষ্ঠী'। সুব্রত লাহিড়ী এই গোষ্ঠী গড়ার পেছনে প্রধান উদ্যোক্তার ভূমিকা গ্রহণ করেন। ওঁর, এক বড় পরিচয় আছে। উনি পরে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ভারতরত্ন চিত্রপরিচালক সত্যজিত রায়ের কাছে কাজ করেছেন। যাইহোক, অন্তরালে সুব্রতবাবুর পরিচালনায় বহু নাটক হয়। চিত্রবাণী সিনেমা হলে টিকিট কেটে নাটক হয়, 'এক পেয়ালা চা'। এই নাটকে প্রভাত রায় অভিনয় করেন। এছাড়া 'রজনীগন্ধা', 'তাহার নামটি রঞ্জনা' ইত্যাদি বহু নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। নাটকগুলি মণিরামপুরের গণ্ডি ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল দূর দূরান্তে। সফল চিত্র-নাট্যকার শঙ্কর দাশগুপ্ত 'শেষ বিচার' নাটকে অভিনয় করেন।

এরপর পিলুদাকে দেখা গেল পল্লীসেবক সংঘে। 'পিতামহদের উদ্দেশ্যে', 'মহাকাব্য' ইত্যাদি বহু নাটক এখানে মঞ্চস্থ হয়। পল্লীসেবক সংঘের পরে পিলুদাকে লোকে দেখল পলতা ওয়াটার্স ওয়ার্কের ভেতর সম্মিলনী ক্লাবে। বসন্ত মুখার্জী, মানস রায়, বিশ্বনাথ রায়, আশিস রায়, মনজিল সেনগুপ্ত, তাপসী ঘোষ ও আরও বহু ছেলে

মেয়ে জড়ো হয়েছিল এই ক্লাবের আঙ্গিনায়। উজানের মাঝি, স্বীকারোক্তি, নৈশ্যভোজ ইত্যাদি বহু নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল।

প্রতিবিম্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আবার নাটক। মহাকাব্য, বাজি, গর্ধভ, সাজানোবাগান, কেনারাম বেচারাম, ফাঁস, সেমসাইড ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ হয়।

মণিরামপুরের নাট্যধারায় একটি নাটকের নাম প্রায় মুখে মুখে ঘুরতো। আজও কারো কারোর স্মৃতিকোঠায় সে নাটক বেঁচে আছে—নাম 'লাললণ্ঠন'। হুয়াদার (ভাল নাম জানা নেই) পরিচালনায় নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল। আর একটি লোকের নাম উল্লেখ না করে পারছিনা। তিনি এই অঞ্চলের নাটকের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—আশিস দত্ত।

সেকালে নাটকের স্থায়ী মঞ্চ ছিল চিত্রবাণী, পল্লীসেবক, পলতা রিক্রিয়েশন ক্লাব। মণিরামপুর ছিল নাটকের এক জমজমাট আসর। বর্তমানে চিত্রবাণী বন্ধ; পলতা রিক্রিয়েশন ক্লাব সংরক্ষিত হওয়ার কারণে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ; পল্লীসেবক মঞ্চ ভগ্নপ্রায়।

১৯৮৩ সাল থেকে গণনাট্য সংঘের কিন্নরশাখা মণিরামপুরের নাট্যচর্চায় এক নব ধারা সৃষ্টি করেছে। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের জীবনের কথা নিয়ে পূর্ণা, একাঙ্ক ও বিশেষ করে পথনাটক মঞ্চস্থ করে চলেছে এই শাখা। পথনাটক এই অঞ্চলে কিন্নরই প্রথম করে, সব মিলিয়ে ৪০ টিরও বেশি নাটক এই শাখা করেছে। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই শাখা কাজ করে। মানস রায়, বিশ্বনাথ রায় এই দু'জন নাট্য পরিচালক আছেন এই শাখাতে।

বার্ষিক অনুষ্ঠানে বহু ক্লাব নাটক করেছে বা আজও করে। ক্লাবগুলোতে খুব কম নাটক হতে দেখা যাচ্ছে। আবেগগুলো আজ বন্দি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে। দূরদর্শন মানুষকে করেছে গৃহবন্দী। তাই চারিদিকে এক সন্দিগ্ধ দৃষ্টি, নাট্য শিল্পটা বাঁচবে তো। শিল্পের প্রাণ নিহিত থাকে তার চর্চার উপর। একটা সময় মণিরামপুর ছিল নাটক চর্চায় মুখরিত। আজ বলতে দ্বিধা নেই যে, এখানে আজ ভাটার টান স্পষ্ট। তবুও ভাটার পরেইতো আবার জোয়ার। এই অঞ্চলে এই মুহূর্তে নাটক করা যাদের লক্ষ্য এমন দুটো দল আছে। তারা হল—কিন্নরশাখা ও শুণ্ডিনাট্যগোষ্ঠী। শুণ্ডিতে বর্তমানে তুষার পাল শিশুদের নিয়ে কাজ করেছেন। সুতরাং মণিরামপুরের নাটক চর্চা মজে যায় নি। কথায় কথায় এইটুকু আশা রেখে নতুন নাটকের অপেক্ষায় রইলাম।

লেখক পরিচিতি ঃ নাট্যকার

মণিরামপুরের পথ পরিচয় এবং আদিবাসী সমাজ

——————————— শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়

পথ পরিচয়

কিছুদিন আগের কথা। আমার ছোটবেলার বন্ধু শুভঙ্কর বর্ধমান থেকে এক রবিবারের সাত সকালে বাড়িতে হাজির। বেশ ছটফটে ছেলে সে। কোথাও বেড়াতে গেলে পথ-ঘাট আশপাশের খবর সংগ্রহে আগ্রহ তার বেশি। জল-খাবার খেতে খেতে শুভ বলল, তোদের এই মণিরামপুর থেকে স্মৃতির ক্যামেরায় কি তুলে নিয়ে যাব বল?

আমি জলকল (পলতা ওয়াটার ওয়ার্কস) থেকে শুরু করে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের কথা বলতেই শুভ বলল, আর দেরি নয় চল তোদের মণিরামপুরের পথঘাট ঘুরে শহরটাকে জানি।

ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়ায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম দুজনে। আমার ঠিকানা বিশালাক্ষ্মীতলার কাছেই। প্রথমেই তাকে বিশালাক্ষ্মীতলায় নিয়ে গেলাম। নিরালায় দাঁড়িয়ে শুভ-কে বলতে শুরু করলাম পঞ্চ-বৃক্ষ তলে মাতৃ পূজার কাহিনী। মাঘী-পূর্ণিমায় অসংখ্য ভক্তের সমারোহে পূজা ও নাম সংকীর্তন হয়। পর পর ৩/৪ দিন এখানে আনন্দের হাট বসে, সামনের নাট-মন্দিরটি বছর দুয়েক হয়েছে। আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে বলে উঠল, তুই টিটাগড়ের বিশালাক্ষ্মী মন্দির দেখেছিস? বলেই সেই মন্দির ও বিশালাক্ষ্মী দেবী সম্পর্কে দুচার কথা শোনাল। আমি অবাক হলাম তার জ্ঞানের পরিধি দেখে।

আমরা কথার মাঝেই পথ চলা শুরু করেছি। জলকলের পাঁচিল ঘেঁসে পশ্চিম মুখে যে পথটা এস এন ব্যানার্জী রোড স্পর্শ করছে তার নাম কৈলাশপতি রায়চৌধুরী রোড়। ওই পথের বাঁকের আগে উত্তর দিকে বুড়ো শিবের মন্দির দেখালাম। দে পাড়ার দে পরিবারের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন মন্দির ও স্বপ্নাদেশে প্রাপ্ত শিবলিঙ্গ কালের সাক্ষী হয়ে নির্জনতায় ডুবে আছে। শুভকে নিয়ে ফিরে এলাম এস এন ব্যানার্জী রোডে। তাকে বললাম, এস এন ব্যানার্জী নামক এই প্রশস্থ পথটির উত্তরে কেন্দ্রীয় মৎস্য গবেষণাগারের সামনে থেকে বারাকপুর ইস্টিশান পর্যন্ত বিস্তৃত। শুনেছি ৮০-৮৫ বছর আগে কাঁকর বিছানো পথে যান-বাহন বলতে ঘোড়ার গাড়ি ও পালকির ব্যবস্থা ছিল। পথের দুধারে এত বাড়ি ছিল না, দু পাশে ঝোপ ঝাড় যথেষ্ট ছিল। যাঁর নামে এই পথ, তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ।

যাঁর বাগ্মিতায় এক সময় মানুষ স্তম্ভিত হয়ে যেত। পরে তাঁর বাড়ি দেখাব।

পথের পশ্চিম বরাবর লক্ষ্য কর পরপর গঙ্গায় যাওয়ার ঘাট ও কয়েকটি ইঁট ভাঁটা, এখানে ইঁট শিল্পের বেশ খ্যাতি আছে। গঙ্গার পলি এই শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে।

শোন শুভ, বিশালাক্ষীতলা থেকে এগিয়ে আসার সময় উত্তর পথের ধার ঘেঁসে দীর্ঘ সুউচ্চ পাঁচিল দেখেছিস? সেই পাঁচিলের অপর পাশে জলকল (পলতা ওয়াটার ওয়ার্কস) এশিয়ার বৃহত্তম পানীয় জলের প্রকল্প যা স্থানীয় ও বিশেষকরে কলকাতার লাখ লাখ মানুষের পানীয় জলের প্রয়োজন মেটাচ্ছে।

কথার মাঝে দু'জনে দাস পাড়া পার হয়ে মিস্ত্রীঘাট বাস স্টপেজের কাছে এসে পৌঁছালাম। বললাম চৈত্র সংক্রান্তিতে এখানে পথের পাশে চড়কের মেলা বসে, যার বিস্তৃতি দাস পাড়া থেকে সুরেন্দ্রনাথের বাড়ি পর্যন্ত। বাঁ-ধারে মহাদেবানন্দ কলেজ আর সামনে সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির দর্শন করল শুভ। সেখান থেকে ডান দিকে ভোলাগিরি রোড দেখিয়ে বললাম, ঐ দিকে আশ্রম, দুইটি স্কুল ও ফেরিঘাট আছে। শুভ জানতে চাইল এস এন ব্যানার্জী রোড স্পর্শ করে কালীমন্দিরের সামনে দিয়ে যে-পথটি পূবমুখী হল, তার নাম। বললাম, সিদ্ধেশ্বরীতলা-রোড-নতুন-বাজারের কাছে চন্দ্র মোহন সা-রোডে ও ভবশঙ্কর রোড সংযোগ রক্ষা করেছে ঐ পথটি। মণিরামপুরের এই একটি বাজার, প্রত্যহ সকালে বসে।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল শুভর সাথে। বললাম তুই জানিস কি গান্ধীজি দু-বার এই বাড়িতে এসেছিলেন। সে তো কথা শুনে অবাক। বললাম বাঁ-দিকে একটা পিচের পথ দেখতে পাচ্ছিস? এই পথটা বেনেপাড়ায় রামপদ হালদার রোড স্পর্শ করেছে। নাম যোগেন গাঙ্গুলী স্ট্রীট। তিনি মিস্ত্রিঘাটের স্থায়ী বাসিন্দা এবং সদালাপি, অর্থবান মানুষ ছিলেন।

ফের এস এন ব্যানার্জী রোড ছুঁয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা। শুভর দৃষ্টি পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়ির সারির দিকে। তাকে বলি, বৃদ্ধা কাকিমার কাছে শোনা কথা, সে-কালের পথের দু'পাশ সবুজ পাঁচিলের মাঝে দু'একটা বাড়ি সাজানো থাকতো। পথের লোকজন কম দেখা যেত, ক্লান্ত পথিক গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় শরীরটাকে জুড়িয়ে নিত, নির্জনতায় ঘিরে রাখতো চারিধার। কালের আবর্তে হারিয়ে গেছে সে সব শোভা।

এস এন ব্যানার্জী রোডের বাঁক ঘুরে পূবমুখী হয়ে শুভকে বললাম বাঁ-দিকে দেখ কালীমন্দির পার হয়ে একটা পথ চলে গেছে। ওই পথের নাম ভবশঙ্কর ব্যানার্জী রোড, বেনে পাড়া ছুঁয়ে নতুন বাজারের পৌছে গেছে পথটা। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের পুত্র। উত্তর বারাকপুর পৌরসভার নির্বাচিত পৌরপ্রধান। শুভ, আয় সামনের চায়ের দোকানে বসে একটু চায়ে চুমুক দিই।

জানিস শুভ, পৌরসভা পরিচালিত পলি-ক্লিনিকের পাশ দিয়ে যে পথ পূবমুখী হয়ে পরে ভবশঙ্কর রোডে মিশেছে তার নাম সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জী লেন। তিনি উপরোক্ত পৌরসভায় উপ পৌরপ্রধান ছিলেন।

এবার আমরা দুজনায় ভবশঙ্কর রোড ছুঁয়ে চলেছি। দেখ বেনেপাড়া শিবতলা পার হচ্ছি। এই যে শিব মন্দিরটা দেখছিস এটি রামকৃষ্ণ দেবের শিষ্য অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠা করেন। পথের বাঁক পেরিয়ে এসে পড়েছি রামপদ হালদার রোডের সংযোগস্থলে। পূব-দক্ষিণ কোণে চেয়ে দেখ মণিরামপুর ব্যায়াম সমিতি। এই ব্যায়ামাগারে বিশ্বশ্রী মনোতোষ রায় দেহ সৌষ্ঠব প্রদর্শন করে গেছেন। এই সংযোগস্থলের পশ্চিমে রামপদ হালদার রোড শুরু হয়ে পূবে ব্যায়াম সমিতির পাশ দিয়ে ক্যান্টনমেন্ট স্পর্শ করেছে। তিনি উত্তর বারাকপুর পৌরসভার কমিশনার ছিলেন।

আমরা ক্রমশ উত্তরে এগিয়ে চলেছি চন্দ্র মোহন সা রোড দিয়ে নতুন বাজার দ্বিতীয় মোড় পার হলাম। পূবে কামারপাড়া রোড হাই ড্রেন পর্যন্ত বিস্তৃত। তারপর বারাকপুর ক্যান্টমেন্টের এলাকার পথ। পায়ে পায়ে চলে এলাম। পূবে চন্দ্র মোহন সা ঠাকুর বাড়ি। মদনমোহন জিউয়ের পূজা অর্চনা এখানে প্রতিদিন হয়ে থাকে। আমার শৈশবে রাসের সময় দেখেছি বেশ কয়েকদিন উৎসবের মেজাজ, পর পর যাত্রা ও পুতুল নাচ হত। শৈশবের সোনালী দিনগুলো কালস্রোতে একে একে ভেসে গেছে, এখন পুতুল নাচ হয় না, যাত্রার সংখ্যা কমে গেছে। আর এই দেখ পাশেই চিত্রবাণী সিনেমা হল। এখন অবশ্য হলটি বন্ধ আছে।

রোদ্দুর ক্রমশ চড়া হতে শুরু করেছে, শুভর তবু জানার আগ্রহের শেষ নেই। শার্টের পকেট থেকে টুক করে একটা নোট বুক বার করে গোপনে কয়েকটা শব্দ লিখে নিল। ঠাট্টা করে বলি কিরে ইতিহাস লিখবি নাকি ? সে বলল, ইতিহাস সবার দ্বারা হয় না।

এদিকে চন্দ্রমোহন সা রোড বিনোদ বিহারী স্ট্রীট্ ছুঁয়েছে, পশ্চিম থেকে রাম লাল মুখার্জী রোড সেও এখানে উপস্থিত। এটাকে তেমাথার মোড় ধরা যায়। শুভকে বলি উত্তরে যে পথটি সোজা গিয়েছে পথটির নাম বিনোদ বিহারী ঘোষ স্ট্রীট্। এই পথ গোয়ালা পাড়ার মোড় পর্যন্ত বিস্তৃত। বিনোদ বিহারী সঙ্গীত অনুরাগী ছিলেন।

চন্দ্রমোহন সা রোড ও বিনোদ বিহারী ঘোষ স্ট্রীট্ সংযোগ স্থল থেকে আমরা ক্রমশ পশ্চিমে বিস্তৃত পথটির দিকে চলা শুরু করলাম। শুভকে বলি পথের নাম রাম লাল মুখার্জী রোড। এই পথ ক্ষেত্র মোহন ভট্টাচার্য রোডে গিয়ে পড়েছে। তিনি ছিলেন সমাজ সচেতন, বিত্তবান ব্যক্তি। শুভ বলল, চল রাম লাল মুখার্জি রোডের গা ঘেঁষে, দেখি কি আছে। একটু এগিয়ে বাঁ-দিকে

দর্শন করালাম বিশাল মাঠটি। বললাম পৌরসভার পরিচালিত এই মাঠ, শিশুদের মুক্তাঙ্গন। মণিরামপুরের একমাত্র খেলার মাঠ, স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন দড়িকল মাঠ। এককালে এখানে দড়ি তৈরী হতো।

রামলাল মুখার্জী রোড ছুঁয়ে উত্তরে এগিয়ে চলছে যে পথটি, তার চলার শেষ ঘটক পাড়া হয়ে এস এন ব্যানার্জী রোড পর্যন্ত পথটির নাম ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য রোড। তিনি ছিলেন জনপ্রিয় শিক্ষাবিদ। দেবীপ্রসাদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা মনে রাখার মত। ক্ষেত্রমোহন উত্তর বারাকপুর পৌরসভার নির্বাচিত কমিশনার ছিলেন।

হরিপদ ঘোষ স্ট্রীট্ ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য রোডের সংযোগ স্থল থেকে শুরু হয়েছে। চেয়ে দেখ পাশের এই পুরনো বাড়িটির দিকে। এই বাড়ি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ স্বর্গীয় ভূধর চন্দ্র ভট্টাচার্যের। এই পথ জলকলের প্রাচীরের দিকে ক্রমশ উত্তরে বিস্তৃত।

শুভকে নিয়ে মান্নাপাড়ার পথ ধরলাম। পথটির নাম ত্রৈলোক্য মান্না স্ট্রীট্। তাকে বললাম এই পথ পূবে সুরেন্দ্র নাথ কলোনীর দিকে এগিয়ে কেদার মুখার্জি রোডে বিলীন হয়েছে। ত্রৈলোক্য মান্না ছিলেন স্থানীয় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী।

আমরা এখন যে পথে চলেছি এই পথের নাম জগন্নাথ সিং রোড। জলকলের পাঁচিলের ধার দিয়ে প্রথমে পূবমুখী হয়ে গোয়ালা পাড়ার মোড় ছুঁয়ে উত্তরে ঘুরে জলকলের ২নং গেট পর্যন্ত এই পথ বিস্তৃত। জগন্নাথ সিং ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তিনি অনেক আন্দোলন করেছেন। কারাবাস ভাগ্যে জুটেছে একাধিকবার।

সিংহী বাগান রোড ও সিদ্ধেশ্বরী রোডের সংযোগ রেখেছে যে পথ তার নাম বিশ্বনাথ রায় রোড। তিনি একজন ব্যবসায়ী ও সমাজ সচেতক ছিলেন।

গোয়ালা পাড়া মোড় থেকে পূবমুখী পথটি খানিক গিয়ে দুটি বাঁক নিয়েছে। পরে ফের পূবমুখী। নয়াবস্তি ভেদ করে এগিয়ে গেছে পথটি। এই পথের নাম কাজিপাড়া রোড। এই কাজি কে ছিলেন? তা আজ অজ্ঞাত। এই পথের পাশে একটি উর্দুভাষী বিদ্যালয় এবং যামিনী স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

কাজিপাড়া রোডের পূব দিকের প্রান্ত ছুঁয়ে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত আউট পোস্ট রোড। এই পথের সাথে জলকল ২নং গেট থেকে একটি প্রশস্থ পথ এসে মিশেছে। এই পথটির নাম জনশ্রুতি অনুযায়ী জলকল ২নং গেট রোড।

কাজীপাড়া রোড ছেড়ে আবার বিশালাক্ষ্মীতলার দিকে এগোতে লাগলাম। মুহূর্তে মনটা ডুবে গেল ভেসে আসা মায়াবী সুরের রাজ্যে। আসলে রাস্তার পাশেই 'আঁকিবুকি'-তে তখন চলছিল গানের তালিম।

আদিবাসী সমাজ

'যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।'

কবিগুরুর এই সত্য উক্তি যে কোন পিছিয়ে পড়া মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, আরও বেশী প্রযোজ্য মনে হয় আমাদের আদিবাসী সমাজ সম্পর্কে। আমাদের দেশে মাটির সঙ্গে যাদের সংপৃক্ততা বেশী তারা হলেন আদিবাসী সম্প্রদায়। পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬ শতাংশ আদিবাসী। এরা মূলত গ্রামীণ সম্প্রদায়ভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত আদিবাসীরা রয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সাঁওতাল, লেপচা, শবর, টোটো, মাহলী, ওঁরাও, হো, গারো, এরকম আরও সম্প্রদায় রয়েছে।

আমার আলোচনার ক্ষেত্র খুবই ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেই পরিসরটি হল বারাকপুরের অন্তর্গত মণিরামপুর অঞ্চল। এই স্থানের অধিকাংশ আদিবাসী ওঁরাও সম্প্রদায়ভুক্ত। মণিরামপুরের মান্নাপাড়া, গোয়ালাপাড়া, গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলের ইটখোলা এই সমস্ত স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশটি পরিবার বসবাস করে। এদের বেশীরভাগই হিন্দু সম্প্রদায় ভুক্ত তবে কিছু খৃষ্টান সম্প্রদায়ের আদিবাসী আছে।

ওঁরাও জাতি সম্প্রদায়ের যে সমস্ত গোত্র পাওয়া যায় সেগুলো হল ঃ

তিরকি (Tirkey), তিগ্গা (Tigga), লাকারা (Lakara), মিঞ্জ (Minz), টোপ্পো (Toppo), কুজুর (Kujur), খিজ (Khease), বেক (Bek), আক্কা (Akka), খালখো (Khalkho), খাখা (Khakha), কাচাচাপ (Kachachap), বারা (Bara), কেরকেটা (Kerketa) ইত্যাদি। আমি বললাম ওগুলো কি Title, কেউ কেউ বললেন Title নয়, গোত্র।

ওঁরাও সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা ওঁরাও ভাষায় কথা বলে। তবে এই ভাষায় কোন লিপি নেই। বাঙালী সমাজের সাথে মিশে তারা বাঙলা ভাষাও ভালই বলতে পারে। অধিকাংশই বাঙলা ভাষায় লেখাপড়া শিখেছে, তবে হিন্দি ও ইংরেজিতে কয়েকজন কথা বলতে পারে।

চার পাঁচ পুরুষ ধরে এই আদিবাসীরা এখানে বসবাস করছে। কেউ সরকারি চাকরি করে কেউবা আবার সাঙ্গীর (মাটি কাটার) কাজ করে। কিছু মানুষ রাজমিস্ত্রি, যোগাড়ের কাজ করে থাকে।

ওঁরাও'রা অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে। যারা হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত তাদের মূল উৎসব দুটি। ১। কর্মা (Karma) ও ২। সাহারুল (Shaharul)। সাহারুল বাঙলার চৈত্র মাসের শেষের দিকে আর কর্মা ভাদ্র মাসে একাদশীর দিনে পুজো হয়।

কর্মা উৎসব উপলক্ষে ১৫ দিন আগে থেকেই অনুষ্ঠান শুরু হয়। ছেলেরা উপোস থেকে কর্মা গাছের ডাল কাটতে যায় সকাল বেলা। মেয়েরাও উপোস থাকে। সবাই এক সাথে গাছের ডাল নিয়ে আসে নির্দিষ্ট স্থানে। তারপর মাটিতে ডাল পুঁতে রাখা হয়। পূজো হয় দিনের বেলায়। এই উৎসবে মেয়েরা জওয়া গাছ কলসী বা ঝুড়ির মধ্যে বালি রেখে রোপন করে। মেয়েরা বালি লুকিয়ে আনে। কর্মার পূজোর পর সারারাত ধরে চলে খুশিয়ালী— গল্প, নাচ, গান ইত্যাদি। পরবর্তী দিনে ঘরে ঘরে কর্মা ডাল নিয়ে ঘোরা হয়। তারপর নদী বা বড় খালে সেটা ভাসান দেওয়া হয়। এখানে স্থানাভাবের জন্য উত্তর ২৪ পরগণার কাউগাছি ও হুগলীর বৈদ্যবাটিতে উন্মুক্ত স্থানে কর্মা উৎসব পালিত হয়।

সাহরুল উৎসব হয় রবি ফসল এবং যুদ্ধে যাওয়াকে কেন্দ্র করে। (যদিও তাদের এখন যুদ্ধে যাওয়া হয় না।) চাঁদ দেখে পূজা হয়। এই পূজা উপলক্ষে গাঁয়ের বাসিন্দারা আতব চাল আর শালগাছের ফুল (শকুয়াপেড়ের ফুল) ফুটকল শাক নতুন কুলোয় দিয়ে দেয়। পুজোর পুরোহিত সেগুলো ভাগ-করে দেয়। এই দিন থেকে আম, কাঁঠাল খাওয়া শুরু। এই উৎসবেও বেশি স্থানের প্রয়োজন হয়। কারণ জলভরা লোক, পুরোহিত, মার জন্য রুটি গড়ার কারিগর ও মুরগীর ৪০/৫০টি বাচ্চা সংগ্রহের লোক ও গাঁয়ের প্রচুর লোকের সমাবেশ। এ অঞ্চলে স্থানাভাবের জন্য এবং সব কিছু একত্রিত করতে অসুবিধার জন্য এই উৎসব বিহারের রাঁচিতে পালিত হয়। সাহরুল উৎসবের পুরোহিত ও জলভরে যে, সে ২দিন উপোস করে এবং মুরগী কাটার ও রুটি তৈয়ারীর লোক ১দিন উপোস করে থাকে।

ওঁরাও সম্প্রদায়ের বিবাহ অনুষ্ঠানও এক আনন্দ উৎসব। তাদের বিবাহ স্থির হয় চাঁদ দেখে। বিবাহে পুরোহিত থাকে না। তবে তাদের পঞ্চ বসে। পঞ্চে বেশির ভাগ মেয়ে সদস্য থাকে। বিবাহের প্রমাণ হল এই পঞ্চ। বর্তমানে লেখাপড়া করেও বিবাহ হচ্ছে। ঝাড়া (হাঁড়িয়া) ছাড়া আদিবাসীদের উৎসব মেতে ওঠে না।

হোলিও তাদের কাছে এক আনন্দ উৎসব। এই উৎসবকে তারা 'ফাগ্লু' বলে।

সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছে। এই সব আদিবাসীরাও নতুন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছে। তার ফলে তাদের আহার, বাসস্থান, পোষাক, পরিচ্ছদে আধুনিকতা এবং স্বচ্ছলতার ছাপ আসছে। উদার মনোভাব নিয়ে ওঁরাও সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ মণিরামপুরের অন্যান্য সম্প্রদায়ের উৎসবের আনন্দ লাভের জন্য পথে নেমে পড়ে।

লেখক পরিচিতি ঃ প্রতিষ্ঠিত ছড়াকার

সার্দ্ধশততম বর্ষ পেরিয়ে মণিরামপুর উচ্চবিদ্যালয়

——————————(পূর্বতন মণিরামপুর এম. ই. স্কুল) — সংগৃহীত

"বর্ষে বর্ষে দলে দলে আসে বিদ্যামঠ তলে
চলে যায় তারা কলরবে
কৈশরের কিশলয় পর্ণে পরিণত হয়
যৌবনের শ্যামল গৌরবে।"

— এই ছাত্রধারাই তো যে কোন বিদ্যায়তনকে প্রাণচঞ্চল করে রাখে। আর বিদ্যায়তন যদি ১৫০ বছর পার হয়ে আসে তবে তার শরীরে যে কত ছাত্রের চিহ্ন আঁকা হয়ে যায় কে জানে! এরকম একটি বিদ্যায়তন হল 'মণিরামপুর উচ্চবিদ্যালয়', যা পূর্বে মিড্‌ল্ ইংলিশ স্কুল নামে পরিচিত ছিল। "শুরুটা ঠিক কবে কীভাবে হয়েছিল সে প্রমাণ দেবার জন্য কেউ জীবিত নেই। কিছু নথিপত্র আছে যা বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকের। উনবিংশ শতাব্দীর প্রমাণ রয়েছে বসার আসনের কাঠের গায়ে। জনশ্রুতি যা আছে তাতে জানা যায় ১৮৪৮-এর কিছু আগেই বিদ্যালয়ের পত্তন হয়েছিল।" কিছু স্মৃতি-কথায় এই বিদ্যায়তনের অতীত আর বর্তমানের কথোপকথন শুনে নিই।

" ... পূর্বে বারাকপুরের ঐতিহাসিক সেনানিবাস, পশ্চিম ও দক্ষিণে স্রোতস্বিনী গঙ্গা এবং উত্তরে ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠিত পলতা জলকল। তার মাঝে আলো করা এই ঐতিহ্যমণ্ডিত মণিরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়। পূর্বতন মিড্‌ল্ ইংলিশ স্কুল (M.E.School)।

দীর্ঘদিন অযত্নে, অবহেলায় প্রায় ভঙ্গুর হয়ে পড়ছিল। ভগ্নপ্রায় ছাদ, জানালা দরজাবিহীন অব্যবহার্য ক্লাশ রুম, যা কিনা বিদ্যালয়ের পরিবেশকে ধীরে ধীরে মরুভূমির দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। এলাকার মানুষের গর্বের এই বিদ্যালয়কে বাঁচিয়ে রাখার সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন সে সময় এই অঞ্চলেরই বহু গুণীজন। সারা দেশ-বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত বহু কৃতী ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা গ্রহণের সূচনা ক্ষেত্র এই বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় মণিরামপুর, বারাকপুর তথা পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে গর্বের।

প্রাক্তন বিধায়ক প্রয়াত যামিনী ভূষণ সাহাকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যালয়কে জুনিয়ার হাই থেকে হাইস্কুলে উন্নীত করার লক্ষ্যে ২৪ পরগণা জেলা শিক্ষা অধিকর্তা (৬০/বি, চৌরঙ্গী লেন, কলিকাতা) মাননীয় শ্রী তপন রায়ের সঙ্গে

দেখা করি। ওখানেই ফাইল খুঁজতে গিয়ে D.I. শ্রী রায় জানতে পারেন যে, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ ৩৫ বৎসর এই বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতিতে ছিলেন। উনি অবাক হয়ে যান। প্রশ্ন করেন—কেন এতদিন বিদ্যালয় উচ্চ বিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করেনি প্রভৃতি। যাইহোক, উনি কথা দেন, হাইস্কুল প্রাপ্তির জন্য সাহায্য করবেন। ১৯৮৬ সালে প্রাক্তন বিধায়ক প্রয়াত যামিনী ভূষণ সাহা, তৎকালীন D.I. মহাশয়-এর প্রচেষ্টায় জুনিয়র বিদ্যালয় উচ্চ বিদ্যালয়ের মর্যাদা পায়। ....” **(প্রাণ গৌর কুণ্ডু —সম্পাদক বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি)**

“ .... রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বভারতীয় নেতৃপদে থাকলেও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের ক্ষেত্রে উত্তর বারাকপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান ছিলেন, তেমনই স্থানীয় এই বিদ্যালয়টির পরিচালন সমিতির সভাপতিও ছিলেন। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বহু বৎসর এই বিদ্যালয়টির পরিচালন সমিতির সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন এবং তাঁর সময়েই পূর্বতন মাইনর স্কুলটি জুনিয়র হাইস্কুলে উন্নীত হয়েছিল। সম্পাদকরূপে কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন বিদ্যালয়টির উন্নতি সাধনে। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর পরিচালনকালে এই বিদ্যালয়ের সহসম্পাদক পদের দায়িত্ব লাভ করার। ....” **—শিবধন মুখোপাধ্যায় (প্রাক্তন ছাত্র)**

“রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতি বিজড়িত এই বিদ্যালয়। তিনি কার্যনির্বাহক সমিতির বহুদিন সভাপতি ছিলেন। তাঁর উপযুক্ত পুত্র ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বহুদিন কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি ছিলেন। শোনা যায়, যে জমিটির ওপর বিদ্যালয়ের গৃহটি দণ্ডায়মান, সেই জমি দান করেছিলেন মধুসূদন দে মহাশয়। এই বিদ্যালয় ১৮৪৮ সনে এম. ই. স্কুলের রূপ পায়। ১৮৮৫ সন থেকে এই বিদ্যালয় দীর্ঘ ৪০ বছর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ তত্ত্বাবধানে স্নেহচ্ছায়ায় প্রগতির পথ অনুসরণ করে এবং গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সৃষ্টি হয়। সেটা আজও অম্লান। ১৯৫৩ সালে তৎকালীন শিক্ষক সুশীল রায়চৌধুরী ও ভূতনাথ পাকড়াশী এবং অন্যান্য শিক্ষানুরাগীদের প্রচেষ্টায় এই বিদ্যালয় জুনিয়ার হাই স্কুল হিসাবে অনুমোদন পায়। ঐদিন থেকেই প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক (জুনিয়ার হাই) এই দুটো বিভাগে বিভক্ত হয়। তখন সম্পাদক ছিলেন অমূল্যনাথ মুখোপাধ্যায়। অমূল্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পর বিদ্যালয়ের সম্পাদক হিসাবে ভার পড়ে কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়, যিনি এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং প্রাক্তন শিক্ষকও ছিলেন।

এই বিদ্যালয়ের একটি ইতিহাস আছে, সে ইতিহাস হল শিক্ষকগণের আত্মত্যাগের ইতিহাস—সে ইতিহাস হল কঠিন কর্তব্যপালনের ইতিহাস। যে

সব ছাত্র এই বিদ্যালয়ে পড়েছেন, জীবনে যারা কৃতিত্ব অর্জন করতে পেরেছেন—তারা এই আত্মত্যাগের সাক্ষী। রোহিনীনন্দন সেন আমার পিতৃদেবের শিক্ষক। ইংরেজি সাহিত্যকে আয়ত্ত করতে তাঁর সাধনা যেন এক বিশেষ উদাহরণ। নিত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (নিতুবাবু), কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়, পশুপতি মুখোপাধ্যায়, কৃত্তিবাস নায়ক, মণিমোহন সিংহ কেউই আর পৃথিবীতে নেই। কিন্তু তাঁরা আমাদের হৃদয়কে যেভাবে জয় করে গেছেন, তার স্মৃতি আজও অম্লান।" —**শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (শিক্ষক প্রাক্তন)**

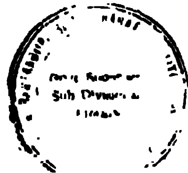
"গত ৩৩ বছর ধরে বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটা সুনিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। শুরুর স্মৃতিটা এখন অস্পষ্ট। 'মাইনর' অপভ্রংশে 'মাইনের' স্কুল—বর্তমানে মণিরামপুর হাইস্কুল। বহু জটিলতা, টানাপোড়েন অবজ্ঞা নিয়ে বিদ্যালয় ১৫০ তম বর্ষে পদার্পন করেছে। একটা পরম্পরা সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে এই সুদীর্ঘ পথে কোথাও ছেদ পড়েনি। আমাদের বিদ্যালয়ের ৮০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের। সারা বছরের জন্য সরকার নির্দিষ্ট Fees দিতে তাদের অভিভাবকরা কষ্ট পায়। অনেক ক্ষেত্রে কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে বই দেওয়া কিংবা বকেয়া Fees মিটিয়ে দেবার কাজটিও শিক্ষকরা কেউ কেউ করেন। এরই মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সুনিবিড় সম্পর্ক।" — **বিশ্বনাথ রায় (বিদ্যালযের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক)।**

"মাঝে একসময় এসেছে বিদ্যালয়ের দুর্দিন যখন ছাত্র সংখ্যা ঠেকেছে মাত্র ৪০-এ। সেই দুর্দিনকে কাটিয়ে ১৯৮৬ সালে সরকারী স্বীকৃতি পেল মণিরামপুর হাইস্কুল। ১৮৩৫ সালের শিশু-বৃক্ষ পাঠশালা ১৮৪৮ সালে এম. ই. স্কুল ও ১৯৫৫ সালে জুনিয়ার হাইস্কুল হিসাবে গড়ে ওঠে। যে সকল কর্মদক্ষ পরিচালন সমিতি এবং শিক্ষকগণের সহায়তায় এটা সম্ভব হয়েছে তাঁদের সাধুবাদ জানাই। কিন্তু এই দীর্ঘ ইতিহাসকে পিছনে ফেলে এলেও যে সমস্ত শিক্ষক এই বিদ্যালয়ে সামিল হয়েছিলেন, যাঁরা শুধু দিয়েই গেলেন, পেলেন না কিছুই, যাঁরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে বিদ্যালয়কে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের সামাজিক স্বীকৃতি কোথায়।" —(গৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রধান শিক্ষক, মণিরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়)

'মানুষ, মানুষকে ভুলে যায় কিন্তু ভুলতে পারবো না মণিরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সেই সব দিনগুলোর কথা। স্কুল বাড়ির প্রতিটি ধূলিকণার সাথে জড়িয়ে আছে আমার স্কুল জীবনের স্মৃতি। যে স্মৃতির মালা আজও আমাদের মনে আঙিনায় সুরভি ছড়ায়।' —উজ্জ্বল কর্মকার (প্রাক্তন ছাত্র)।

Recd.
3.3.16

No. 2677



Please quote the No. and date of this letter.
It is particularly requested that a single letter should deal with one subject only.

FROM

W. C. WORDSWORTH, Esqr. M. A.,
Inspector of Schools, Presidency Division.

To

The Secretary,

Manirampore M.E.School.

285, Bowbazar Street, Calcutta, 29th February,1916.

SIR,

I have the honour to return your application for the renewal of the grant to the Manirampore M.E.School and to state that it should be revised for the ~~renewal of the~~ existing grant of Rs.12/- and resubmitted at a very early date.

I have the honour to be
Sir,
Your most obedient servant,
W. C. Wordsworth
Inspector of Schools, Pres~~y.Divn~~.

সংগ্রাহক ঃ সম্পাদক, নগর পেরিয়ে
সৌজন্য ঃ মণিরামপুর উচ্চ বিদ্যালয় স্মারক পুস্তিকা ১৯৯৭

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয় পাঠকেন্দ্র, মণিরামপুর

দেবীপদ আচার্য

উচ্চশিক্ষাদানের পদ্ধতিগুলি বর্তমানে দূরসঞ্চারি শিক্ষণ মাধ্যমে বিশেষভাবে সামাজিক অর্থনৈতিক বা অন্যভাবে বঞ্চিত মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার মহান ব্রত নিয়ে ১৯৯৭ সালে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন দ্বারা স্বীকৃত। কর্মরত নর-নারী, গৃহবধূ প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ, বয়স্ক এবং যারা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার দরজায় সহজে প্রবেশাধিকার পান না তাদেরই এই বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রচেষ্টায় রত। এই বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রের মাধ্যমেই শিক্ষা দান করে।

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিশেষ ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বি. এ. এবং বি. কম. (অনার্সের সমতুল্য) পড়ার ব্যবস্থা আছে। জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর হল শিক্ষাবর্ষ। আবার প্রতিটি শিক্ষাবর্ষ দুটি অর্ধবর্ষে বিভক্ত—জানুয়ারি থেকে জুন এবং জুলাই থেকে ডিসেম্বর। এখানে নির্দিষ্ট সংখ্যক উপস্থিতির বাধ্যবাধকতা নেই। সমস্ত পাঠক্রম (তিন বৎসরের) দুভাগে বিভক্ত—আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক। এখানে ভর্তির কোন বয়সসীমার বাধা নেই।

বি এ পাঠক্রমে ঐচ্ছিক বিষয়গুলি হল—বাংলা, ইংরাজি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, জনপ্রশাসন, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস ও অর্থনীতি (যে কোন একটি)। বি কম পাঠক্রমে বাণিজ্য শাখার সব বিষয়গুলিকে পাঠ্য করা হয়েছে। এগুলি ছাড়াও একটা প্রায়োগিক বিষয়ও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। ভর্তির ন্যূনতম মান উচ্চমাধ্যমিক (১০ +২)।

প্রতিটি পাঠক্রমে মোট মানক (Credit) সংখ্যা ৯৬ অথবা ১২০০ নম্বর। আবশ্যিক বিষয়ের জন্য ২৪ মানক বা ৩০০ নম্বর। ঐচ্ছিক বিষয়ে ৬৪ মানক বা ৮০০ নম্বর। প্রায়োগিক বিদ্যায় ৮ মানক বা ১০০ নম্বর। প্রতি সেমেস্টারে ১৬ মানক পড়া হবে। তিন বছরে মোট ৬টি সেমেস্টারে ৯৬ মানকের জন্য নির্দিষ্ট। প্রতি ৬ মাসের সেমেস্টারে তিন মাস পাঠকেন্দ্রগুলিতে পরামর্শদান সভার ব্যবস্থা আছে। যদিও পরামর্শদান সভায় অভিজ্ঞ অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাগণ পরামর্শ দেন যা শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষয় আয়ত্ত করতে সহায়তা করে, তথাপি এই সভায় উপস্থিতি শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামুলক নয়। এখানে অডিও-ভিসুয়্যাল ব্যবস্থার

সুযোগ পাওয়া যায়।

ধারাবাহিক মূল্যায়ণের জন্য মোট মানকের ৩০ ভাগ সংরক্ষিত। বাকি মানক প্রান্তিক পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করা আছে। প্রান্তিক পরীক্ষা হবে প্রতি সেমেস্টারের শেষে নিজ নিজ পাঠকেন্দ্রগুলিতে। শিক্ষার্থী তার সুবিধামত পরীক্ষায় বসবেন। প্রতিটি প্রান্তিক পরীক্ষায় বসা বাধ্যতামূলক নয়। স্থিরীকৃত প্রাপ্ত মানক অনুযায়ী ন্যূনতম তিনটি শিক্ষাবর্ষের মধ্যে শিক্ষার্থী সাধারণভাবে সাম্মানিক সহ অথবা সাম্মানিক প্রথম শ্রেণী সহ পাশ করবেন। প্রয়োজনীয় মানক অর্জনের জন্য শিক্ষার্থী অতিরিক্ত ৫ বৎসর পর্যন্ত সময় পেতে পারেন।

উপরের আলোচনা এবং তথ্য অনুযায়ী বলা যায় নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তার পাঠকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে এমন একটা উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করেছেন যার পরিব্যাপ্তি উচ্চতায় বেশি না হলেও সামতলিকভাবে সুদূরপ্রসারী।

লেখক পরিচিতি ঃ অধ্যক্ষ বঙ্গবাসী মর্নিং কলেজ—কলকাতা, গবেষক এবং নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা

■ **প্রাথমিক ঃ** নব পল্লী হো-চি-মিন নগর জি এস এফ পি, হামদার্দ উর্দু ইউ পি, অপর্ণা, প্রাথমিক বিদ্যালয়, সারদা বিদ্যামন্দির, মণিরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, মণিরামপুর বিদ্যাপীঠ জি এস এফ পি, মণিরামপুর হিন্দী ইউ পি, নয়াপল্লী আদর্শ প্রাথমিক, স্বামী মহাদেবানন্দ বিদ্যায়তন ইউনিট ১, স্বামী মহাদেবানন্দ বিদ্যায়তন ইউনিট ২, বিবেকানন্দ শিক্ষাসদন।

■ **উচ্চবিদ্যালয় ঃ** স্বামী মহাদেবানন্দ বিদ্যায়তন, স্বামী মহাদেবানন্দ বিদ্যায়তন ফর গার্লস্, মণিরামপুর উচ্চবিদ্যালয়।

■ **মহাবিদ্যালয় ঃ** স্বামী মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়।

■ **বিশ্ববিদ্যালয় ঃ** নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

■ **গবেষণাগার ঃ** কেন্দ্রীয় মৎস্য প্রগ্রহণ অনুসন্ধান সংস্থা।

■ **সংস্কৃত চর্চা ঃ** মণিরামপুর চতুষ্পাঠী এবং মান্নাপাড়া শিব চতুষ্পাঠী।

নিজস্ব প্রতিনিধি

কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় মৎস্য অনুসন্ধান সংস্থা ও তার অবদান

— মনিরঞ্জন সিন্‌হা

■ ভূমিকা

এশিয়ার মধ্যে অন্তর্দেশীয় মাছ সম্বন্ধীয় গবেষণা, সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণে অগ্রণী সংস্থা নামে পরিচিত বারাকপুরের মণিরামপুরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় অনুসন্ধান সংস্থা যা আবার অন্তর্দেশীয় মৎস্য প্রগ্রহণ অনুসন্ধান সংস্থা নামেও পরিচিত। দেশের সবচেয়ে পুরনো এই অন্যতম গবেষণা সংস্থা ১৯৪৭ সালে স্থাপিত হবার পর থেকে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে দেশের মৎস্য শিল্পের উন্নতির জন্য উৎসর্গীকৃত। এই সংস্থার প্রধান অর্পিত কার্যাধারা হচ্ছে দেশের অন্তর্দেশীয় জল সম্পদ ও মৎস্য সম্পদের সম্ভাবনা গবেষণার মাধ্যমে সঠিকভাবে নিরূপণ করা ও উপযুক্ত কার্যপ্রণালী বের করা যার সাহায্যে জল সম্পদের সংরক্ষণ ও সেরা সদ্ব্যবহার করা যায়।

■ ইতিহাস

দেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও তার পরবর্তীকালের ক্রমঃবর্ধমান খাদ্যাভাবের জন্যই মাছ চাষ গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে দেশের সমস্ত চাষযোগ্য জলাশয়কে খাদ্য উৎপাদনের উপযোগী করে তোলার ও প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু তখনও দেশে বিজ্ঞান ও শিল্পভিত্তিক মাছের খামার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ব্যবহারিক জ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে জানা ছিল না। তাই তখন সর্বভারতীয় আকারে মৎস্য গবেষণা সংস্থা গড়ে তোলার জরুরী প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৯৪৩ সালে ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় দেশে মৎস্য সম্পদের উন্নতিকল্পে পৃথক কেন্দ্রীয় মৎস্য গবেষণাগার সৃষ্টি করার প্রকল্প অনুমোদন করেন। ফলস্বরূপ, ১৯৪৭ সালের ১৭ মার্চ কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় অনুসন্ধান সংস্থা কলিকাতায় স্থাপিত হয়। যদিও নিয়মমাফিক এই সংস্থা ১৯৪৭ সালে স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু দেশ বিভাগের পরবর্তীকালীন অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কঠিন পরিস্থিতির জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী ও যন্ত্রপাতির সংস্থান ১৯৪৯ পর্যন্ত করা সম্ভবপর হয়নি। ১৯৪৯ সালেই এই সংস্থার অফিস ও গবেষণাগার স্থাপিত হয় বারাকপুরে পলতায় কলিকাতা কর্পোরেশনের পানীয় জল

সরবরাহ কেন্দ্রের ভিতরে ও বাইরে প্রতিরক্ষা বিভাগের অধীন কতকগুলি অস্থায়ী ঘরে। তখন এই গবেষণা সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্যগুলি বিশদভাবে প্রকাশ করা যা সমস্ত চাষযোগ্য জলাশয়ে প্রয়োগ করে দেশে মাছের সর্বাধিক উৎপাদন সম্ভব হয়। তখন মূলত তিনটি বিভাগের মাধ্যমে গবেষণার কাজ চালানো হত। (১) মাছচাষ বিভাগ—যার প্রধান কেন্দ্র ছিলো কটক, (২) নদী ও হ্রদ বিভাগ, যার প্রধান কেন্দ্র ছিল এলাহাবাদ এবং (৩) খাঁড়ি বা মোহনা সংক্রান্ত বিভাগ, যার প্রধান কেন্দ্র সংস্থার প্রধান কার্যালয় অর্থাৎ বারাকপুরে।

গত কয়েক দশক ধরে দেশের মৎস্য শিল্পের উন্নতির জন্য এই সংস্থা উৎকর্ষ গবেষণার মাধ্যমে দেশের সেবা করে চলেছে। আকারে জটিল, ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ ও ক্রিয়াকলার বিশিষ্ট জলাশয়ের বাস্তুতন্ত্রের তারতম্য থাকা সত্ত্বেও এই সংস্থা উপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যা উদ্ভাবন করেছে যেগুলির মধ্যে অন্যতম নদীর পোনামাছের বীজের ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিরূপণ, পোনামাছের বীজ উৎপাদন এবং মিশ্র মাছ চাষ যা দেশের সর্বত্র মৎস্য চাষীরা সাদরে গ্রহণ করেছে। মৎস্য চাষের জন্য প্রযুক্তির উন্নতি দেশে মাছের উৎপাদন বাড়াতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

অতঃপর ১৯৮৭ সালে এই সংস্থাকে মৎস্য প্রগ্রহণ বিষয়ক গবেষণার কাজে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করা হয়েছে।

■ একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান

এই প্রতিষ্ঠানে ৭টি বিভাগে মোট ২০টি বহু বিষয়ক প্রকল্প নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। এলাহাবাদে অবস্থিত নদী সংক্রান্ত বিভাগ থেকে ভারতের প্রধান নদনদীগুলির পরিবেশগত উদ্বিগ্নতায় প্রভাব কাটিয়ে মাছের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য নিয়মিত গবেষণা চালানো হচ্ছে। বাঙ্গালোরে অবস্থিত জলাধার বিভাগের প্রধান কার্যালয়ে ও সারা দেশে এর কেন্দ্রগুলিতে দেশের মানব সৃষ্ট জলাধারগুলির বাস্তুতন্ত্র এবং উৎপাদন ক্ষমতা বিষয়ে আঞ্চলিক প্রয়োজন অনুযায়ী গবেষণা করা হয়, যাতে ঐসব জলাধার থেকে মাছের উৎপাদন বাড়ানো যায়। বারাকপুরে অবস্থিত জলাভূমি বিভাগ দেশের পূর্ব ও উত্তরপূর্ব অঞ্চলের নদীপ্লাবিত অসংখ্য জলাভূমিতে মাছের উৎপাদন বাড়াতে গবেষণায় নিয়োজিত। খাঁড়ি সংক্রান্ত বিভাগে পূর্ব উপকূলের হুগলী মাতলা খাঁড়িতন্ত্র এবং পশ্চিম উপকূলের নর্মদা খাঁড়িতন্ত্রে গবেষণা হচ্ছে। পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ও মৎস্য স্বাস্থ্য বিভাগ পরিবেশের উন্নতিকল্পে এবং মাছের মহামারী ক্ষত রোগ ও অন্যান্য রোগের বিষয়ে গবেষণায় ব্যস্ত রয়েছে। ইলিশ বিভাগের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে গঙ্গা ও দেশের অন্যান্য নদীতে মহামূল্য ইলিশ মাছের সংখ্যা পুনরুদ্ধার করবার জন্য কৃত্রিম প্রযুক্তির সাহায্যে চারা উৎপাদন করে নদীতে পুনরায় ছেড়ে দ্রুত সংখ্যা বাড়ানো। মৎস্য সম্পদ নিরূপণ বিভাগ গবেষণা করে চলেছে, কিভাবে সুযোগ্য কর্মপদ্ধতি এবং ভারতীয়

সূত্র বা নমুনা উদ্ভাবন করা যায় যার সাহায্যে সহজেই মুক্ত জলাশয়ে মাছের মজুত সংখ্যা নিরূপন করা সম্ভব হয়, যাতে ক্রমাগত উচ্চ উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হতে পারে।

■ আমাদের গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যপ্রণালী

(১) নদী ও মানবসৃষ্ট জলাধারের বাস্তুতন্ত্র ও মৎস্য উৎপাদন বিষয়ক পরিচালন পদ্ধতি।

(২) জলাভূমির বাস্তুতন্ত্রের প্রগতিশীল উৎপাদন।

(৩) বন্যাপ্লাবিত হ্রদসমূহে মৎস্য উৎপাদন।

(৪) খাঁড়ি ও উপকূল অঞ্চলের স্বাভাবিক আবাস সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহার।

■ পরিবেশের উপর আলোকপাত

এই সংস্থা পরিবেশ সহায়ক প্রযুক্তিবিদ্যা উদ্ভাবন করতে বদ্ধপরিকর, যার দ্বারা নদ, নদী, নালা ও তার প্লাবিত অঞ্চল, কৃত্রিম জলাধার জাতীয় হ্রদ, বিভিন্নপ্রকার জলাভূমি, খাঁড়ি এবং উপকূলবর্তী জলাশয়ের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হতে পারে। দেশের এই সমস্ত উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্যকূলের সংরক্ষণ ও পরিচালন ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই উপযুক্ত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের সমস্তরকম জলাশয়ের পরিবেশের ভারসাম্য সংরক্ষণ করে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করাই এই সংস্থার একমাত্র লক্ষ্য।

■ পরামর্শমূলক সেবা

দেশের বিভিন্ন প্রকার জলাশয়ের পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতি ও বিজ্ঞানভিত্তিক অধিক মৎস্য উৎপাদন পারদর্শিতায় এই সংস্থার আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে। তাই এই সংস্থা ই ডি এফ (ফ্রান্স), ভারতীয় উত্তর পূর্ব পরিষদ, নর্মদা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, পারাদ্বীপ পোর্ট সংস্থা, জাতীয় তাপ বিদ্যুৎ পরিষদ, কৃষি আর্থিক নিগম ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মপন্থার পরামর্শদাতা হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। এ ছাড়াও এই সংস্থা গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করে দেশের বিভিন্ন জলাশয়ের পরিবেশ ও তার মৎস্য উৎপাদন ক্ষমতার মূল্যায়ণের কাজে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

■ প্রযুক্তি হস্তান্তরকরণ

এই সংস্থার সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ বিভাগ খুবই সুসংগঠিতও অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ। এই বিভাগ থেকে নিয়মিতভাবে মৎস্যচাষী, মৎস্যজীবি ও মৎস্য চাষ সংগঠকদের

মৎস্য বিষয়ক বৈজ্ঞানিক তথ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে। রাজ্য সরকার ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্প্রসারণ কর্মীদের স্বতন্ত্র পারদর্শিতার উন্নতি করাই আমাদের মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য। এছাড়া এশিয়ার, ল্যাটিন আমেরিকার ও আফ্রিকার মৎস্য আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য এই সংস্থা দেশের প্রদান কেন্দ্র হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে।

কাকদ্বীপে অবস্থিত কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে সুন্দরবনের গ্রামীণ মানবশক্তির বিকাশের জন্য নিয়মিতভাবে কার্যালয়ে এবং চাষীদের খামারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত ৮,৯৫৫ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

■ তথ্যপরিবেশন

দেশে মৎস্য বিজ্ঞানের সমগ্র তথ্যের আধার হিসাবে এই সংস্থা গর্বিত। এখানকার গ্রন্থাগারে ৮০০০ বই আছে এবং আছে সমসংখ্যার অন্যান্য পত্রিকা, মানচিত্র, বিবরণী ইত্যাদি। প্রায় ২৫০ টির মত দেশি ও বিদেশি সাময়িক পত্রিকাও রাখা হয়। এখানে আছে আধুনিক তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা, যার অন্যতম হচ্ছে নির্বাচিত তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা, সংক্ষিপ্ত তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা, চলতি সচেতনতা তথ্য সেবা এবং কেন্দ্রীয় তথ্য নথি। ইণ্ডিয়ান ফিসারীজ অ্যাবসট্রাকট নামে ভারতে প্রকাশিত মৎস্য বিজ্ঞানের গবেষণাপত্রের সংক্ষিপ্ত তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা, দেশে একমাত্র এই সংস্থা থেকেই প্রকাশ করা হয়। এখানকার গ্রন্থাগার বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিদ,ছাত্র, জ্ঞানপিপাসু পণ্ডিত ব্যক্তিদের সেবায় নিয়োজিত। এখানে কমপিউটারের মাধ্যমে টেবিলের উপরেই প্রয়োজনীয় প্রকাশন ছাপানোর ব্যবস্থা আছে।

লেখক **পরিচিতি ঃ নির্দেশক, কেন্দ্রীয় মৎস্য প্রগ্রহণ অনুসন্ধান সংস্থা, বারাকপুর এবং গবেষক**

চতুষ্পাঠী

মণিরামপুর চতুষ্পাঠী

এই চতুষ্পাঠী ১৯৩৬ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে অধ্যাপক ভূধর চন্দ্র ভট্টাচার্য, গোলক বিহারী মান্না, রামপদ হালদার, হরিপদ ঘোষ, বটুকৃষ্ণ রায় প্রমুখ শিক্ষানুরাগীদের আগ্রহে প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের সঙ্গে স্মরণ করতে হয় জানকী নাথ তর্কতীর্থ সাহিত্য শাস্ত্রীর নাম। অধ্যক্ষ ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মণিরামপুর অঞ্চলে একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে এসে এই চতুষ্পাঠীর কথা জানতে পারেন এবং সরকারি আনুকূল্যের আশ্বাস দেন এবং তার প্রচেষ্টা সফল হয়। প্রথমে ৫/৬ জন শিক্ষার্থী নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। এদের মধ্যে আবাসিক ছিলেন দুজন। প্রথমদিকে অধ্যাপকদের কোন ভাতা ছিল না। স্থানীয় পৌরসভা মাসিক পাঁচ টাকা হারে সাহায্য করত। অন্যান্য ব্যয়ভার এলাকার কিছু মানুষ বহন করতেন। প্রথমে এই চতুষ্পাঠীর কাজ অন্য বাড়িতে সম্পন্ন হত। পরবর্তীকালে বর্তমান ঠিকানায় স্থানান্তরিত হয় ঘটকপাড়া, মণিরামপুর। এই চতুষ্পাঠীতে কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ, ন্যায় প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দান চলে আসছে। আদ্য, মধ্য, উপাধি পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান নানা সমস্যায় জর্জরিত।

মান্নাপাড়া শিব চতুষ্পাঠী

এটি স্থাপিত হয় ১৯৮২ সালে। এখানকার অধ্যাপক হলেন বিনোদ বিহারী স্মৃতিতীর্থ। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান নানা রকম সমস্যায় জর্জরিত হবার জন্য প্রতি বছর পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না।

(সংগৃহীত)

এক নম্বর আড্ডা

সত্যব্রত দাশগুপ্ত

'এক নম্বর'টা অবশ্যই মানবাচক নয়, নিতান্তই স্থানবাচক। ক্যান্টনমেন্টের সীমা পেরিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির সীমায় প্রবেশ করলে অনতিদূরে গুহঠাকুরতাদের বাড়ির বিপরীতে যে বাড়িটির নীচের তলার ঘরে আমাদের দীর্ঘদিনের আড্ডার স্থানটি রয়েছে তাকে কেন প্রায়ই 'এক নম্বর' বলে উল্লেখ করা হয় — এ প্রশ্ন অনেকের মুখে শুনেছি। বিষয় হল, '৫০/৫২ সালে আমাদের মূল আড্ডা ছিল সদরবাজারে যে তিনতলা নন্দীবাড়ি রয়েছে তার নীচের বারান্দায়। সে সময় 'পাড়া' এবং 'বাজার' বলে দুটি কথা প্রচলিত ছিল। প্রথমটি 'মণিরামপুর' ও দ্বিতীয়টি 'সদরবাজার' বোঝাতো। কিন্তু বস্তুত, এই দুই ক্ষেত্র আমাদের জন্য একাকার ছিল। মণিরামপুরের অগণিত বন্ধুরা বাজারে আড্ডা জমাতো আমাদের এ বারান্দায়। আর আমরা পক্ষান্তরে 'বাজার' থেকে চলে যেতাম মণিরামপুরের দূরদূরান্তবাহী কাঁচারাস্তা ধরে নিরিবিলি নানা সর্পিল গলিতে। এ পাড়ায় ও পাড়ায় মিলেমিশে আমরা কোথায় না ক্রিকেট-ভলি খেলেছি, থিয়েটারের রিহার্সেল দিয়েছি, সরস্বতী পূজোর বিচিত্রানুষ্ঠান করেছি। এমতাবস্থায় যখন উপরোক্ত আড্ডাটির পত্তন হল তখন মণিরামপুরের বন্ধুরা, এবং সদর বাজার থেকেও যে দু-একজন বন্ধু পাকাপাকিভাবে মণিরামপুরে চলে গেছেন তাঁরা, আগে ঐ আড্ডায় কিছুক্ষণ হাজিরা দিয়ে এসে উপস্থিত হতেন সদর বাজারস্থ নন্দীবাড়ির বারান্দার আড্ডায় এবং দেরীর কারণস্বরূপ বলতেন 'একনম্বরটা হয়ে এলুম।' এই ভাবে ঐ আড্ডা 'একনম্বর' ও বাজারের আড্ডা 'দুনম্বর' আখ্যা প্রাপ্ত হল। 'দুনম্বর' আজ লুপ্ত। কিন্তু বর্তমান আড্ডার সঙ্গে 'একনম্বর' বিশেষণটা বোধহয় চিরতরে লেপটে গেছে।

আমাদের আড্ডার মূল শক্তি হল যে আমাদের এখানকার প্রায় সব সভ্যরা পরস্পর পরস্পরকে প্রায় ৫০ বৎসরেরও দীর্ঘসময়কাল ধরে হাড়েহাড়ে চেনে। হাফ্‌প্যান্ট থেকে ফুল্‌-এ, স্কুলজীবন থেকে চাকুরী জীবনে উত্তরণে এক এক জনের জীবন এক এক দিকে বেঁকেচুরে চলে গেছে। কেউ নামীদামী জীবনের স্বর্ণালী বৃত্তে, কেউ সাদামাটা চাকুরীর ঝাপসা অন্তরালে, সবাই ষাট পেরিয়ে গেলাম। কিন্তু একের থেকে অপরের মানের কোন হ্রাসবৃদ্ধি নেই এই ছোট ঘরটিতে। এখানে কনিষ্ঠ কেরাণীর সঙ্গে চীফ একসিকিউটিভের ফারাক নেই। বিপুলা এই পৃথ্বীর বহুল বৈচিত্র্য এখানে বর্তমান। আছে সরকারী কর্মচারী (পঃবঃ), ভারত সরকারের ডাক বিভাগ,

SAI (Steel Authority of India) নামীদামী প্রাইভেট কোম্পানীর দুর্ধর্ষ একসিকিউটিভ, (অন্ততঃ জনাতিনেক) স্কুল এবং কলেজ শিক্ষক, পৌরকর্মী, H.A.L. কর্মী, স্টেটব্যাঙ্ক কর্মী, মাহিন্দর এণ্ড মাহিন্দর কর্মী, কম্পাউণ্ডার, জমিদার ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের কেউ উকিল-ডাক্তার হয়নি এ দুঃখ রয়ে গেল যদিও। তবে ওই যে বললাম, কেউ নয় এখানে তিন ইঞ্চি বেশী লম্বা, কেউ নয় দীনের হতে দীন। ঘরে ঢোকার আগে আমাদের অলিখিত রীতি স্ব-স্ব পেশার তকমাটি বাইরে খুলে রেখে আসতে হবে। ছেঁড়াছাতা রাজছত্রের মহামিলন মেলার সঙ্গীতের মতই এই আড্ডার সুর-লয়-ছন্দে আকবর বাদশার সঙ্গে হরিপদ কেরাণীর কোন ভেদ নেই।

এ আড্ডার মধ্যমণি অবশ্যই সাধনদা—বিমল পাল, স্কুল শিক্ষক এবং দক্ষ হোমিওপ্যাথ। আড্ডাস্থলটি মূলতঃ ছিল তার চেম্বার—। চিকিৎসা ভালোই করতেন, কিন্তু আড্ডার নেশা ছিল দুর্নিবার আর শেষ পর্যন্ত আলমারীতে গোটা তিন মহাকায় চিকিৎসাগ্রন্থ ছাড়া চেম্বারত্ব বিশেষ কিছু রইল না। আড্ডার সমারোহ দেখে রোগীরা কেটে পড়ল, যদিও কিছু গরীব প্রতিবেশীর চিকিৎসা তিনি বজায় রাখলেন। তাঁর মস্ত গুণ হল, বিশ্বের নানা বিষয় সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ, ফন্ দানিকেনের গ্রহান্তরকাণ্ড থেকে বায়রণ-এর প্রেমবার্ত্যা পর্যন্ত সকল বিষয় সম্পর্কেই তাঁর কিছু বক্তব্য থাকে যা প্রায়শই অবিসংবাদী হয় না। বক্তা অপেক্ষা শ্রোতার ভূমিকা তাঁর অধিক প্রিয়, তবে দুষ্ট লোকে বলে কারুর বক্তব্য দীর্ঘ এবং ধোঁয়াটে হলে তিনি থামিয়েও দেননা, বস্তুত শোনেনও না, বি-কর্ণ হয়ে যান, মন বিচরণ করে 'গ্রহান্তরে', দৃষ্টি বিপরীত দিকে গুহঠাকুরতাদের বাড়ীর নতুন রং করা দেওয়ালে নিবদ্ধ। অত্যন্ত প্রাণবন্ত পুরুষ এবং প্রাণবান, দয়ামায়া স্নেহভালবাসা প্রচুর। চিড়িয়ামোড়ের (শান্তিবাজার) বাড়ি থেকে বেরিয়ে আগে এখানে আসেন, যে কজন থাকে সকলের জন্য ফাস্ট রাউণ্ড চায়ের অর্ডার দেন। দু একজন এর মধ্যে বেড়ে গেলে (ছুটির দিনে) দাঁত কিড়মিড় করেন কিন্তু চায়ের সংখ্যা যথারীতি বাড়িয়ে দেন। 'ফার্স্ট' রাউণ্ড চা বলাটা তাঁর মহান ট্র্যাডিশন। তাই দেরিতে আসা ব্যক্তিকে 'আর আসার কী দরকার ছিল?' যেমন বলবেন, তেমনি তাঁর জন্য চায়ের সংখ্যাও বাড়িয়ে দেবেন। পশ্চাদাপসরণের প্রশ্ন নেই। কোন পথ চলতি পরিচিত জন (আড্ডার 'নিয়মিত' নন) যেতে যেতে হাসিমুখে সিঁড়িতে পা রাখতেই সাধনদার প্রশ্ন 'পকেটে পয়সা আছে? এখানে ঢুকলে কিন্তু চা খাওয়াতে হবে।' অনেকেরই মুখের হাসি মিলিয়ে যায়, ত্বরিতে বিদায় নেন। এরপর তিনি স্কুলে চলে যান, ছুটি হলে বাড়ি। আবার ফ্রেস হয়ে সন্ধ্যার মুখে সাইকেল চালিয়ে চিড়িয়ামোড় থেকে মণিরামপুর। আড্ডা প্রীতির এক ক্লাসিক নিদর্শন। পরম পরিতাপের বিষয় আজকাল আর তেমন সুস্থ নন বলে আসতে পারে না, আড্ডা মণিহারা হয়ে গেল।

কি কি বিষয়ে আলোচনা হয় এই আড্ডায়? একটি আন্তর্জাতিক ক্লাব তাঁদের সাপ্তাহিক সভায় প্রায়ই বক্তার আমদানী করেন ঃ বক্তৃতার বিষয় সম্পর্কে বলা

থাকে—আপনি সুপুরি থেকে সাবমেরিন পর্যন্ত যে কোন বিষয় বলুন আমরা আকাশতলে সর্ববিষয়ে আগ্রহী, শুধু তিনটি বিষয় touch করবেন না Sex, Religion, Politics. তবে কোন বিষয়ের ওপর আমাদের বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব নেই, নেই কোন ধর্মীয় বা রাজনৈতিক নিগড়। আমাদের আড্ডায় একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে আপনার যে কোন সমস্যা আপনি এখানে ফেলে দিন, একটা সমাধান বেরিয়ে আসবে। যে সমাধানগুলো প্রায়ই পিনফুটো বেলুনের অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তা হোক, কিন্তু মোটামুটি আপনাকে সমাধান পকেটে গুঁজে দেয়া ছাড়া যেতে দেয়া হবে না। সমাধানের রকমফের আপনাকে তাজ্জব করে দেবে। কার টিভির অ্যান্টেনা বিগড়েছে, একজন মন্দ্রকণ্ঠে বললেন, তোমাকে আমি দুটো কলাগাছের মধ্যে নারকোল দড়ি বেঁধে অ্যান্টেনা করে দিতে পারি, ঠিক কাজ হবে, তুমি দেখতে চাও? অপর একজন বললেন টেবিল ফ্যানটা অকেজো হয়েছে, শোনা গেল, আমার কাছে পাঠিয়ে দিও, মিস্ত্রী ডাকবার কোন প্রয়োজন নেই। আর এক চেয়ারের মন্তব্য ঠিক, তাই দিও। এর মেকানিকাল স্কিল তুমি জাননা, একখানা চামচ দিয়ে জাহাজ খুলে ফেলে দেবে। কিন্তু সবটাই হাসি তামাশা নয় অবশ্য। এদের কারো কারো বাস্তবজ্ঞান অত্যন্ত প্রখর। বাজারদর থেকে শুরু করে চুনকামের রেট, সামাজিক, রাজনৈতিক নানা pool করা তথ্যে আড্ডা প্রায়ই information bureau-র চেহারা নেয়।

নিছক আড্ডা ছাড়া আমাদের আছে একটা ছোট সমবায় সমিতি; যথারীতি আছে তার সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ। আমাদের সকলের মাসিক চাঁদায় তা পুষ্ট। একটা বাৎসরিক চড়ুইভাতি সমেত ছোট ছোট খাওয়া দাওয়ার জন্যই মূলতঃ এই ফাণ্ড। আরো কিছু সামাজিক দায়-দায়িত্ব বাবদও কিছু ধরা থাকে। বিশদ বলবার অবকাশ নেই, শুধু বলি যাদের বাড়িতে আমাদের এই ঘরটি তাঁদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। আসবাবপত্র সহ এই স্বয়ংসম্পূর্ণ ঘরটি না পেলে কোন রকে বা কার ঠেকে আমাদের সমাবেশ করতে হত তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। ঘরের প্রায় উলটোদিকে আছে দেবানন্দের চায়ের দোকান; সেও প্রায় আমাদের পরিবারভুক্ত হয়ে পড়েছে।

এ আড্ডা আমাদের প্রাণ, আমাদের দ্বিতীয় গৃহ। আমাদের গর্ব। কিন্তু আর কতদিন একে বাঁচিয়ে রাখা যাবে জানি না। পরিপূর্ণ অবসর গ্রহণের পর যখন আড্ডা এবেলা ওবেলা জমে ওঠার কথা তখনি একে একে পরলোকগত হলেন পাঁচজন সভ্য, অপর আরো পাঁচজন থেকেও নেই ঃ অসুস্থতা প্রযুক্ত অনুপস্থিতি। তবু চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সব কিছুরই যেমন শুরু থাকে এবং শেষ। স্বীকার করে নেয়া ভালো এখন আমাদের বেলাশেষের ব্যথিত পর্ব চলছে। কিন্তু তবু চলছে, চলবে—

লেখক পরিচিতি ঃ অধ্যাপক

○ শিল্প

ইট শিল্পে মণিরামপুর এবং পলতা জলকল

—————————————————— নারায়ণচন্দ্র সাহা

ইট শিল্পে মণিরামপুর

ইটের পরে ইটকে গেঁথে মানুষ যতই পিঞ্জরেতে থাকুন না কেন, একটা ইটের বাড়ি কে না চায়। আজও প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন যা পাওয়া যাচ্ছে সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই ইটের প্রচলন ছিল তার প্রমাণ মিলেছে, তবে আকৃতিতে এবং গুণমানে একটা বিবর্তন অবশ্যই এসেছে। ইট একটা শিল্প হিসাবে দেখা দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে মণিরামপুর অঞ্চল ইট শিল্পের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছে। এই খ্যাতির প্রধান কারণ, ইটের গুণমান। গঙ্গার পলিমাটি থেকেই এই ইট তৈরি হয়, এই ইটে নোনা কম ধরে। প্রায় একশত বছরের কাছাকাছি সময়ে এখানকার ইট শিল্প গড়ে উঠেছে। এখানে প্রায় দশটি ইট ভাটার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানকার ইট বৃহত্তর কলকাতা ও পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে সরবরাহ করা হয়। West Bengal Pollution control এর আদেশ অনুসারে বর্তমানে লোহার চিমনির পরিবর্তে নব্বই ফুট উঁচুতে fixed chimney ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে, এই শিল্পের কিছু সমস্যার কথা জানা গেল— কাঁচা মালের অর্থাৎ পলিমাটির সমস্যা, ভাল কয়লার অভাব, শ্রমিক সমস্যা, করের চাপ ইত্যাদি।

বর্তমানে মণিরামপুর অঞ্চলে ইটের দাম প্রতি হাজারে (ভাটা বিশেষে কিছু তারতম্য রয়েছে)

১ম শ্রেণী—৩৫০০.০০ টাকা, ২য় শ্রেণী—৩৩০০.০০ টাকা, ৩য় শ্রেণী—৩০০০.০০ টাকা, ৪র্থ শ্রেণী—২৮০০.০০ টাকা।

○ জলকল

পলতা জলকল

জলকলের প্রথম গোড়াপত্তন হয় ১৮৬৮ খ্রী প্রায় ৪৮২ একর জমির উপর। এবং এর তত্ত্বাবধানে তখন ছিলেন ডাঃ ম্যাক্‌নামারা, মি. ক্লার্ক, ডাঃ বি.এন.দে, মিঃ এস. সি. মিত্র প্রমুখ ব্রিটিশ ও ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ। সেই সময় পরিকল্পনামাফিক তৈরি করা হয়েছিল বড় বড় সেট্‌লিং ট্যাঙ্ক এবং ফিল্টার বেড। স্টিম ইঞ্জিনের মাধ্যমে পাইপের দ্বারা গঙ্গা থেকে জল তুলে তাতে এ্যালাম ডোজ মিশিয়ে সেট্‌লিং ট্যাঙ্কে

ছাড়া হত। সেই জল বিভিন্ন ট্যাঙ্কে থিতিয়ে গেলে ফিল্টার বেডে দেওয়া হয়। এরপর পরিশ্রুত হলে পরিমাণ মত ক্লোরিন মিশিয়ে প্রেশার স্টেশনের মাধ্যমে পাইপের ভিতর দিয়ে বি. টি. রোডের নিচে দিয়ে গিয়ে পৌছায় টালা ট্যাঙ্কে। এত কিছুর পর টালা পাম্পিং স্টেশন সেই জল কলকাতা শহরে সরবরাহ করে থাকে। বলা কিন্তু খুব সহজেই হয়ে গেল, আসলে কাজটা অনেক জটিল ও সূক্ষ্ম পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

প্রথম ষ্টিম ইঞ্জিনের মাধ্যমে জল তুলে স্লো স্যান্ড ফিলটারে পরিশ্রুত জল সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৬০ লক্ষ গ্যালনের মত। সেই জলের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২০ কোটি গ্যালনের মত। এটা সম্ভব হয়েছে উন্নত কারিগরী ও প্রযুক্তি প্রয়োগের দ্বারা, যেমন, ১৯৬৪ সালে প্রথম চালু হয় ৬০ এম. জি. ডি ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ল্যারিফুকুউলেটর র‍্যাপিড গ্র্যাভিটি ফিল্টার বেড এবং পরে ১০০ এম. জি. ডি ক্ল্যারিফুকুউলেটর। এখন পলতা জল শুধু কলকাতারই তৃষ্ণা নিবারণ করছে তাই নয়, আশে-পাশে বারাকপুর, পলতা, বি টি রোডের দুপাশেও অল্প-বিস্তর জলদান করে চলেছে। এখন স্লোস্যান্ড ফিল্টার বেড থাকলেও ষ্টিম ইঞ্জিন কিন্তু আর নেই। সেই বিলেতি ষ্টিম ইঞ্জিন বর্তমানে মডেল আকারে গেষ্ট হাউসের সম্মুখে স্থাপিত করা হয়েছে। আরও একটা শুভ খবর জলকলের পূর্ব প্রান্তে আর একটি ১০০ এম. জি. ডি ক্ষমতা সম্পন্ন প্ল্যান্ট নির্মিত হচ্ছে। গত এপ্রিল মাস থেকে ঐ প্ল্যান্টের একটি অংশ ২০ এম. জি. ডি জল সরবরাহ করছে এবং এর ফলে বিধাননগর সল্টলেক প্রভৃতি স্থানে টালা থেকে জল সরবরাহ করা শুরু হয়েছে। আশা করা যায় উক্ত ১০০ এম. জি. ডি প্ল্যান্টটি অতি সত্ত্বর পূর্ণ মাত্রায় জল সরবরাহ করতে সক্ষম হবে।

জলকলের ভিতর প্রবেশ না করলে বোঝা যাবে না যে প্রতিমুহূর্ত কি কর্মকান্ড হয়ে চলেছে। এখানে সেই কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার, কর্মী, ঠিকাদার, শ্রমিক মিলিয়ে প্রায় হাজার ছাড়িয়ে গেছে। শুধু জলই নয়, জলকলের আবহাওয়া দূষণমুক্ত রাখতে এখানের কর্মকর্তাদের তৎপরতায় এবং বনদপ্তরের সহযোগিতায় বৃক্ষরোপণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এখন এখানে প্রায় সত্তর হাজার বৃক্ষ সৃজনে সবুজ ঘেরা পরিবেশ মনমুগ্ধকর স্নিগ্ধছায়ায় ভরে গেছে। তার প্রমাণ এক নম্বর গেটে প্রবেশ করলেই দৃষ্টি কাড়বে "আরণ্যক"। গত ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন-এর মেয়র মাননীয় প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় আরণ্যকের উদ্বোধন করেন।

পরিশেষে বলা যায়, এই জলকলের জলের সঙ্গে যে সব ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার, কর্মীবৃন্দ আবাসিক হিসাবে বসবাস করছেন তাদের জন্যও কিছু সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন নতুন-নতুন কোয়ার্টার, আমোদ-প্রমোদের জন্য নাট্যশালা, রিক্রিয়েশন ক্লাব, ছেলে-মেয়েদের জন্য খেলার মাঠ ইত্যাদি।

লেখক পরিচিতি ঃ প্রতিষ্ঠিত লেখক

সেকালের জলকল

——— সংগৃহীত

কলকাতা থেকে প্রায় ২৫ কি.মি. দূরে বর্তমান জলকল স্থাপনের পরিকল্পনার কারণ।

পলতার বর্তমান জলকলের অবস্থান যে আদর্শ স্থান, সে প্রসঙ্গে O'malley তাঁর Bengal District Gazatteers-24 Parganas (1914) গ্রন্থে The Statesman-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের যে বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন, তাতে বলা হয়েছে ঃ "In England, the supply of water for large towns and cities is usually collected in hills away from the town, and sometimes has to travel very long distances before reaching the consumer–the Birmingham catch-ground, for instans, is away in the hill of wales. This system was, however, impossible in calcutta for there is not a hill one hundred feet high within one hundred miles of the city. Another source of supply had. therefore, to be found, and it was decided by the authories about halt a century ago to take the water from the river Hooghly. There is nothing of the crysstal spring of which the poet sings about the Hooghly, and in the city itself the water is so brackish that it was felt that it would be impossible to purify it. Therefore, a place had to be found where the water contained a minimum of silt and other impurities, and Palta was eventually fixed upon."

W.W. Hunter তাঁর 'A Statistical Account of Bengal Vol. 1(1875) গ্রন্থে পলতা জলকল সম্পর্কে Smith-এর যে বর্ণনার উল্লেখ করেছেন তা হল ঃ

"The works include a jetty for landing machinery, coals, and filtering media, while it protects the two large suction pipes, thirty inches in diameter, which there dip into the river, and through which the water is drawn by the pumps. The engines are three in number, each of 50 horse power

nominal, with six boilers. They are contained in a handsome brick building designed by Mr. Christopher Wray, of Cannon Street, London. All these buildings are of similar design. The water is discharged into six settling tanks, each five hundred feet long by two hundred and fifty feet wide; they are walled and floored with brick masonry. The floors are arranged with a slope and channels to facilitate the cleansing. The water is allowed to stand quiescent for thirty-six hours, when a large quantity, amounting to eight or ten inches, of mud accumulates. This is flushed away through the sludge cultvert into the river. The water after settlement is drawn off from the tanks. An arrangement is provided from which it is taken from just beneath the surface, continuously, as the surface sinks to within three feet of the bottom. This lower water is never drawn off consumption; it is used for cleaning out the tanks. The quantity of four feet in depth of two of these tanks is required for one day's supply of six million gallons. The water then passes through iron pipes, forty-two inches in diameter, to the filters. These are eight in number, each two hundred feet by one hundred feet in area; they contain four feet in depth of filtering media when fully charged, and two feet in depth of water. The water passes downward through the filtering media, and through brick channels beneath, into cast-iron pipes, by which it is conducted to the covered well. This is a small building over a large octagonal tank, where the water is collected from all the working filters previous to starting on its journey to Calcutta. In the covered well it passes over a marble platform, where its purity can be observed. The water flows thence through the forty-two inch main, which is capable, under the most favourable circumstances, of passing eight million of gallons through it in twenty-four hours. The purity of the water is daily tested in Calcutta by the Government analyst, Dr. Macnamara."

একালের জলকল

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জল সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রথমে জল সরবরাহ করা হতো দৈনিক ৬০ লক্ষ গ্যালন। এখন প্রায় কুড়ি কোটি গ্যালন বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করা হয়। শুধু তাই নয় বর্তমানে সল্ট লেক অঞ্চলে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ : সম্পাদক, 'নগর পেরিয়ে'

পলতা ব্রিক ফ্যাক্টরি

মুখমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই ফ্যাক্টরির পরিকল্পনা করেছিলেন। পলতা জল সরবরাহ কেন্দ্রের ঝিলের তলায় যে পলিমাটি জমে ওঠে তাকে কাজে লাগানোর জন্য বিধানচন্দ্র রায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এই পলি থেকে ইট তৈরি করে বাজারে বিক্রি করাও হবে আবার ট্যাঙ্কে পলি জমার সমস্যাও মিটবে। ১৯৬৩-৬৪ খ্রীঃ চেকোস্লাভাকিয়ার সাথে সহযোগিতায় এই ফ্যাক্টরি গড়ে ওঠে। এর আয়তন প্রায় ২৯.০৫ একর।

প্রথমে যে ইট তৈরি হত তার আকার ছিল ১০"x৫" x ৩"। পরবর্তীকালে এই ইটের আকার হয় ৮"x৪"x৪"। এই ইট লিবিয়া, সৌদি আরব প্রভৃতি দেশেও রপ্তানি করা হচ্ছে। পাঁচটি শ্রেণীতে এই ইট বিভক্ত— স্পেশাল ক্লাস, ক্লাস-এ, ক্লাস-এ পিক্ড্, ক্লাস-বি, ক্লাব-বি পিক্ড্।

তথ্য : নারায়ণচন্দ্র সাহা

রবীন্দ্রনাথ ও পলতা জলকল

পলতা জলকল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বছর চারেক পরে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে জল সরবরাহ চালু হয়। সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "সেই জলের কলের সত্যযুগে আমার পিতার স্নানের ঘরে তেতালাতেও জল পাওয়া যাইত। ঝাঁঝরি খুলিয়া দিয়া অকালে মনের সাধ মিটাইয়া স্নান করিতাম। সে স্নান আরামের জন্য নহে, কেবলমাত্র ইচ্ছাটাকে লাগাম ছাড়িয়া দিবার জন্য। একদিকে মুক্তি, আর একদিকে বন্ধনের আশংকা, এই দুইয়ে মিলিয়া কোম্পানির কলের জলের ধারা আমার মনেব মধ্যে পুলকশর বর্ষণ করিত।"

"মণিরামপুর ও নারী সমাজ"

— শিখা দত্ত

মণিরামপুরের নারীসমাজের চিত্র আর পাঁচটা সাধারণ শহরতলীর নারী সমাজে সাদৃশ্য আশ্চর্যজনকভাবে মিলে যায়। প্রাগ-স্বাধীনতা যুগে আমাদের এই অঞ্চলের মেয়েদের সমাজ জীবন সম্পর্কে ফলাও করে কিছু লেখার নেই। কর্মসূত্রে বিশেষ করে কলকারখানায় কর্মসংস্থান হেতু এখানে বহিরাগত মানুষের প্রথম বসবাস শুরু হয়। তবে এ অঞ্চলে কিছু বনেদী পরিবার আছেন যারা বংশ পরম্পরা এখানে রয়েছেন। এখানকার নারীরা মূলতঃ রক্ষণশীল হওয়ায় অন্তঃপুরে তাদের সময় কাটতো সংসারধর্ম চর্চায়, বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, পালা-পার্বন, ব্রতকথা ইত্যাদির মাধমে। বৃহত্তর জীবনের কোন রোমাঞ্চকর অনুভূতি তাদের আপ্লুত করেনি। মেয়েদের পাত্রস্থ করলেই পিতামাতার কর্তব্য শেষ হয়ে যেতো। নারীশিক্ষার আরও একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন গ্রাম বাংলাকেও নিষ্কৃতি দেয়নি। ইংরাজ গোরাদের দৌরাত্ম্যে তটস্থ হয়ে থাকতো এসব অঞ্চলের অল্পবয়সী মেয়েরা। তাদের অত্যাচারের শিকার হবার ভয়ে মেয়েরা পর্দানসীন হয়ে পড়েছিল। পথেঘাটে, নিরুপদ্রপে চলাফেরা, পাঠশালায় গিয়ে বিদ্যাভাসের কথা ভাবাই যেত না। এখানে নারী শিক্ষার উন্মেষ ঘটে ১৯৪০ সালের আগে মিস্ত্রীঘাটে 'খেদীর স্কুল' নামে একটি ক্ষুদ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু সেটিও ছিল চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রায় একই সঙ্গে খ্রীষ্টান মিশনারীদের আনুকূল্যে মণিরামপুরে 'খ্রীষ্টান মিশনারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেয়েদের পড়ানো শুরু হয়। কিন্তু সেখানেও ছাত্রী সংখ্যার উপস্থিতির হার ছিল নগণ্য। এরপর মিস্ত্রীঘাটে 'বিবেকানন্দ বিদ্যালয়' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সেখানে ছেলেমেয়ে উভয়দেরই পড়ানোর বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয় কিন্তু তাও প্রাথমিক শিক্ষা। উচ্চশিক্ষার কোন ব্যবস্থাই তখন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মণিরামপুরের বিশিষ্ট বাড়ীর মেয়েরা নবাবগঞ্জের 'শ্রীধর বংশীধর' হাইস্কুলে যেতো পড়াশুনার জন্য। এই অঞ্চলে স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত নৃত্যকালী হালদার মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সুলেখা হালদার প্রথম স্নাতক হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

যুদ্ধোত্তর পর্বে সদরবাজারে 'ক্যান্টনমেন্ট হাইস্কুল' নির্মিত হয় স্থানীয় মানুষের প্রচেষ্টায়। মণিরামপুরের স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত নৃত্যকালী হালদার মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী সুদেবী হালদার প্রধান শিক্ষায়িত্রীর পদে আসীন হন। ১৯৫২ সাল পর্য্যন্ত

এখানকার ছেলেমেয়েদের মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষার কোন সুযোগ ছিল না। বাধ্য হয়ে বৃহত্তর শিক্ষা জগতে প্রবেশ করার জন্য এখানকার ছাত্রছাত্রীদের 'শ্রীরামপুর মিশনারী কলেজে' ভর্তি হতে হতো। বিশেষ করে বিজ্ঞান শাখার জন্য মিশনারী কলেজের সুনাম ছিল। ১৯৫৩/৫৪ সালে অবশ্য রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ স্থাপিত হওয়ায় মণিরামপুর ও নিকটস্থ অন্যান্য অঞ্চলের মেয়েদের শিক্ষার প্রসার ঘটে। পরবর্তী কালে মণিরামপুরের মেয়েদের জন্য মহাদেবানন্দ বালিকা বিদ্যালয় এবং তৎপর ছেলেমেয়ে উভয়দের জন্য মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে এ অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা সচেতনতা বাড়ে এবং ক্রমশঃ মেয়েরা নানা ধরণের কর্মসংস্থানের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে নেয়। এতো গেল নারীদের শিক্ষা প্রসঙ্গ। মণিরামপুরের নিজস্ব একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরী হয়েছিল শিক্ষিত কিছু উৎসাহী যুবক-যুবতীর প্রচেষ্টায়। ১৯৫৮ সালে বর্তমানে বেনিয়াপাড়ায় "গীতায়ন" নামক প্রতিষ্ঠানটির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এখানে নৃত্য, গীত, নাটক এবং গীতি আলেখ্য শিক্ষা করতো এবং বিচিত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের কৃষ্টি, কুশলতা প্রকাশের সুযোগ পেত। ১৯৬০ সালে স্বর্গীয় নৃত্যকালী হালদার মহাশয়ের কর্মগৃহে 'গীতায়ন' স্থানান্তরিত হয় তাঁর কনিষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত অরূপ কুমার হালদার ও সমকালীন কিছু সংস্কৃতি পিপাসু উৎসাহী যুবকদের প্রচেষ্টায়। এখানে নিয়মিত নাটক, সাহিত্যচর্চা, সঙ্গীত প্রভৃতির বিশেষ ব্যবস্থা হতো। শুধু তাই নয়, একাধিকবার এঁরা নানান স্থানে গীতিনাট্য, নাটক, গীতি আলেখ্য ইত্যাদি পরিবেশন করে মণিরামপুরবাসীর অকুণ্ঠ ভালবাসা অর্জন করে। এ অঞ্চলের সুস্থ সংস্কৃতির মানুষ তাদের বাড়ীর মেয়েদের এই প্রতিষ্ঠানে দিয়ে বিশেষ গর্ববোধ করতো। একই সঙ্গে মিস্ত্রীঘাট সংলগ্ন এলাকায় 'বৈঠকী' নামে অনুরূপ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে যার কর্ণধার ছিলেন শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ পালিত, শ্রীযুক্ত করুনা দাসগুপ্ত প্রমুখ সংস্কৃতিপিপাসু মানুষ। এছাড়া দূরদূরান্ত থেকে মেয়েরা নৃত্য, গীত, অঙ্কন শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে 'সাহানা'তে, যার কর্ণধার বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী শ্রীযুক্ত প্রদীপ্ত নিয়োগী। এছাড়া 'তুলিকা'র নামটিও যুক্ত হতে পারে। বর্তমানে মণিরামপুরে মেয়েদের নানান সুযোগ ও সুবিধা রয়েছে নিজেদের আত্মপ্রকাশের। স্বর্গীয় ডাঃ নিতাই হালদার মহাশয়ে সুযোগ্য পত্নী শ্রীমতী রমা হালদারের প্রতিষ্ঠান 'মহিলা কর্ম মন্দির'টি এতৎ অঞ্চলের অনেক মহিলাকেও নতুন দিগন্ত দেখিয়েছে।

পরিশেষে বলি, দিন যত বদলাচ্ছে, মেয়েদের আত্মচেতনা তত বাড়ছে। অনেকেই আজ স্বনির্ভর হয়ে নতুন এক প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞায় ভরপুর। তবে পরিতাপের ব্যাপার যে, এতদ্ অঞ্চলে নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটলেও তাঁরা নিজস্ব কোন পত্রিকার জন্ম দিতে পারেনি যার দর্পণে আগামী প্রজন্মের ছবি ধরা থাকবে।

লেখক পরিচিতি ঃ প্রাক্তন অধ্যাপিকা এবং গবেষক

মণিরামপুর ও ক্যান্টন্‌ম্যান্টের খেলাধূলার সেকাল একাল

সনৎকুমার বসু

সুস্থ শরীর ও মনই সাফল্যের উৎস। খেলাধূলা তাই শরীর চর্চার অঙ্গ। শরীরচর্চা এবং খেলাধূলা শরীরের বুনিয়াদ রচনা করে। 'You will be nearer to heaven through football than through Gita'–Swami Vivekananda. অর্থাৎ গীতা পাঠ থেকে ফুটবল খেলার মাধ্যমে স্বর্গের নিকটতর হওয়া সহজ। খেলাধূলা শিক্ষারও অঙ্গ। আবার সেই খেলা যদি ফুটবল হয় তবে তো কথাই নেই। একদিকে যেমন শরীরর্চচা অন্যদিকে বুদ্ধিবৃত্তি। এই দুইয়ের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে একজন দক্ষ ফুটবলার।

সেকালে ফুটবল জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করত ছাত্রযুবকদের। বেশিরভাগ খেলাই হত গোরাদের সঙ্গে স্থানীয় ক্লাবের। এই বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন এই এলাকার যতীন দাস নামে এক ব্যক্তি। তিনি থাকতেন মুরগী মহল (সদর বাজারে)। তখন গোরাদের টিম যেমন D.L.I., D.C.L.I., K.O.S.B. Regiment ইত্যাদি। আর স্থানীয় ক্লাব বলতে ছিল বারাকপুর স্পোর্টিং ইউনিয়ন (আর্দালি বাজার), সদর বাজার অ্যাথ্‌লেটিক ক্লাব। এছাড়া ছিল রাজেন আচার্যের তৈরি আচার্য ব্রাদার্স টিম। এদের পরিবারের ৯জন ছিলেন এই টিমের সদস্য।

খেলার মাঠ বলতে তখন (১) সেন্ট্রাল স্কুলের মাঠ, (২) M.E.S. জল ট্যাংকের পাশের মাঠ, (৩) Garrison Ground (বর্তমান Police Ground), (৪) জলকলের মাঠ, (৫) আর্দালি বাজার M E S Ground, এবং (৬) Race Course-এর মধ্যের মাঠ যা কেবলমাত্র গোরাদের জন্য।

সেকালে খেলোয়াড়রা খালি পায়েই ফুটবল খেলতেন। কোন জার্সিও ছিল না। আর গোরাদের পায়ে থাকত বুট। সেই সব খেলায় এত উত্তেজনা এবং প্রেরণা যোগাত যে মাঠে জায়গা না পেয়ে গাছের ডালে বসে খেলা দেখত উৎসাহী দর্শকরা। খেলা চলতে চলতে প্রায়শই সংঘর্ষ হত গোরাদের সঙ্গে এদেশীদের। সেই সব ঘটনা চল্লিশের দশকের। Finey সাহেব লাটবাগানের একজন পুলিশ অফিসার। তিনি ফুটবল প্রেমী ছিলেন। একবার দুই দলের খেলার সময় মারামারি হয়। খেলার উদ্যোক্তা ছিলেন সেই যতীন দাস। Finey সাহেব যতীন দাসকে ডেকে পাঠান ঘটনার বিবরণ জানতে। যতীন দাস বললেন 'Public khaptured (খ্যাপচার্ড্) and soldiers go away'. বেশ খানিকটা হাসির

খোরাক জুগিয়ে ছিল সেই ঘটনা। Inter School Sports ছিল সেকালে। পরপর তিনবার ১৯৩২-৩৩-৩৪ (আনুমানিক) দেবীপ্রসাদ হাই স্কুল জয়লাভ করে। তখন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন বেনীমাধব ভট্টাচার্য। তিনি ছাত্রদের বিনা পয়সায় কোচিং ক্লাসেরও ব্যবস্থা করে ছিলেন।

খেলাধূলার চর্চায় যখন এত অগ্রগতি তখন খেলোয়াড়দের নাম জানতে ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। তখনকার অনেক খেলোয়াড়ই পরবর্তীতে কলকাতার নামী দামী দলে খেলাধূলা করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে নামগুলো এই মুহূর্তে আমার মনে পড়েছে সেগুলো হল ঃ

(১) মহঃ কালুট (পরে মোহনবাগানে খেলেছেন)
(২) গোপাল সাহা (পরে মোহনবাগানে খেলেছেন)
(৩) সনৎ নন্দী (বাবু)
(৪) শিবু প্রামানিক (পরে মোহনবাগানে খেলেছেন)
(৫) মহঃ সফী
(৬) সেখ বাবুজান (মহমেডান স্পোর্টিং-এ খেলছেন)

Race Course মাঠে সর্বভারতীয় পর্যায়ে/রাজ্য পর্যায়ে খেলাধূলা হত। এখানে বলাই চ্যাটার্জী, গোষ্টপাল, বীরেশ গুহ প্রমুখ অনেকেই আসতেন খেলতে, মোহনবাগান দলের সদস্য হয়ে।

ফুটবল ছিল আমার অত্যন্ত প্রিয় খেলা। সেই সুবাদে আমি নিজে ছিলাম বারাকপুর স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্য। বলাই চ্যাটার্জীর চেটো দিয়ে বলে লাথি মারা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল এবং আমি খুব সহজেই এই পদ্ধতি রপ্ত করেছিলাম। এই স্থানীয় ক্লাবটি গোরাদের সংগে খেলার জন্য রাজ্যস্তরে উন্নীত হয়েছিল। তখনকার খেলাধূলা বলতে তো ফুটবলই ছিল একমাত্র বিষয়।

এছাড়া টেনিস খেলা হত ৮নং ক্লাব রিভার সাইড রোডে। রবীন্দ্রনাথ নন্দী (কেলো) এখানে খেলাধূলা করতেন, যদিও মুলতঃ এটি ছিল ইউরোপীয়ানদের দখলে। ২নং রিভার সাইড রোডে একটা টেনিস গ্রাউন্ড আছে তবে সেটাও সেনাবাহিনীর লোকজনদের জন্যই বরাদ্দ ছিল।

তখন যে সব ফুটবল প্রতিযোগিতা প্রচলিত ছিল সেগুলি এই মুহূর্তে যা মনে পড়ছে— (১) অধরচন্দ্র মেমোরিয়াল শীল্ড, (২) S.D.O. Challenge Cup (৩) Police Officer Finey Cup & Shield (৪) সদর বাজার চ্যালেঞ্জ কাপ এবং (৫) যোগমায়া চ্যালেঞ্জ রানারস্ কাপ উল্লেখযোগ্য।

একালের ছাত্র যুবকদের মধ্যে খেলাধূলার তেমন কোন আকর্ষণ এ অঞ্চলে আছে বলে তো মনে হয় না। পড়াশুনার চাপে মাঠের যাবার মত সময়, মাঠ বা অবসর কোনটাই পায় না। এখন যে কটা খেলার মাঠ আছে সেগুলোর মধ্যে

উল্লেখযোগ্য হল—

(১) পুলিশ গ্রাউন্ড (ধোবীঘাট বাস স্টপেজের কাছে)

(২) জলকল পল্লীসেবক মাঠ

(৩) এম্. ই. এস্. গ্রাউন্ড

(৪) উত্তর বারাকপুর পুরসভার মাঠ (দড়িকল মাঠ)

এছাড়া ছিল মজুমদার মাঠ। এখানেও ছোটখাট টুর্নামেন্ট হত। জায়গাটা ছিল বর্তমান মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়ের পিছনে। এক সময় এই মাঠে শরীর চর্চাও হতো।

এইসব কথা ও কাহিনী আজ যেন শুধুই স্মৃতি। আমার বাবা ডাঃ সতীশ বসু এলাকার নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনিও ছিলেন চিকিৎসক। সেই সুবাদে বহু মানুষের আনাগোনা ছিল আমাদের এই বাড়িতে। 'পুরানো সেই দিনের কথা সে কি ভোলা যায়'!

লেখক পরিচিতি ঃ প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক

অনুলিখন ঃ স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মণিরামপুরের পুরপ্রধান, উপপুরপ্রধান, কাউন্সিলর/কমিশনার

(১৮ থেকে ২২ নং ওয়ার্ড)

১৯৫২ খ্রীঃ থেকে

চিররঞ্জন মিত্র, শিবধন মুখার্জি, সমরেন্দ্রমোহন সান্যাল, কেদারনাথ মুখার্জি, ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ রায়, সনৎকুমার বসু, সুখেন্দুবিকাশ কর, ভূপেন্দ্রনাথ মুখার্জি, হরিমোহন সেনগুপ্ত, বিশ্বনাথ হালদার, মিহির সান্যাল, সন্তোষ দত্ত, শংকর মজুমদার, সুদর্শন চৌধুরী, স্বপ্না চ্যাটার্জি, তপন পাল, সঞ্জীব সিংহ।

বর্তমানে উত্তর বারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান শ্রী মধুসূদন ঘোষ।

○ শিক্ষাবিদ

মণিরামপুরের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ৺ভূধর চন্দ্র ভট্টাচার্য

——— লক্ষ্মীজীবন ভট্টাচার্য

পরম পূজনীয় অধ্যাপক ৺ভূধর চন্দ্র ভট্টাচার্য (এম. এ. স্বর্ণপদক প্রাপ্ত) মহাশয় ভাটপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অল্প বয়সে পিতৃ বিয়োগ হয়। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কৃতিত্বের সঙ্গেই তিনি ম্যাট্রিকুলেশন, আই এ ও বি এ (সংস্কৃত অনার্সসহ) পাশ করেন। এম. এ. পরীক্ষাতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। সেখানে আহার তাঁহার সহ্য হইতে ছিল না এক কারণ, দ্বিতীয় কারণ, তিনি ঐ সময়ে ঢাকার স্বদেশী আন্দোলনকারীদের সংস্পর্শে আসেন। বিপ্লবীদের কাজে সহায়তা করিতেছিলেন। পুলিশ যে কোন সময়ে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার জননী স্বয়ং ঢাকায় গিয়া ভূধরবাবুকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। ঐ সময়ে স্যার সুরেন্দ্রনাথের পৌত্রীর গৃহশিক্ষক হন। তারপর দেবীপ্রসাদ হাইস্কুলে চাকুরী পান।

মণিরামপুরে জমি কিনিয়া তিনি স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। প্রথমে তিনি রিপন স্কুলে চাকুরী করেন। সেখানে ঠিক কতদিন শিক্ষক ছিলেন, তাহা জানিনা, পরে রিপন কলেজে যোগদান করেন। ঐ কলেজে অধ্যাপনা করিতে করিতেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার অধিকার অসাধারণ ছিল। কথায় কথায় সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিতেন, সংস্কৃত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল বলা চলে।

তাঁহার মেধার পরিচয় বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্যেও আমরা পাইয়াছি। সেক্সপীয়র ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থ অতি যত্নসহকারে তিনি পড়িয়াছেন। ইংরাজী শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্য তিনি ল্যাটিন ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে বহু প্রকার বই ছিল। তিনি আমায় বলিয়াছেন, শারীরিক কারণে বই ঝাড়া পোঁছা তাঁহার দ্বারা সম্ভব না হওয়ায় বহু বই পোকায় কাটিয়া নষ্ট করিয়াছে। তিনি নর্থ বারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানও হইয়াছিলেন (১৯৪৮-৫০)।

লেখক পরিচিতি ঃ অধ্যাপক

তথ্য ও পরিসংখ্যানে মণিরামপুর

কানাই পদ রায়

■ মণিরামপুরের 'Vernacular School' আজ কোথায়?

১৮৭১—৭২ সালে মণিরামপুরে একটা 'Vernacular School' ছিল। Hunter-এর Statistical Account of Bengal-Vol.I-এর উল্লেখ আছে। "...the aided vernacular schools near Barrackpur are at, monirampore Palta, Khardah....." এলাকার অনেক পুরানো লোকের সঙ্গে কথা বলেছি, কিন্তু কেউ এই স্কুলের সন্ধান দিতে পারেনি। তবে বর্তমানে যেটি মণিরামপুর হাইস্কুল, যা এক সময় ছিল এম ই স্কুল, সম্ভবতঃ সেটিই প্রথম অবস্থায় Vernacular School ছিল।

■ মণিরামপুরে একসময় প্রচুর জেলেদের বসবাস ছিল

নদী আর খালের ধারে একসময় প্রচুর জেলে বসবাস করত। প্রায় ১৩০ বছর আগে মণিরামপুরেও প্রচুর জেলে বসবাস করত। Hunter-এর বিবরণে এর উল্লেখ আছে (1875). ".... The following are almost wholly inhabited by fishing castes : Kulti Bihari, on the Kulti Gang; ..... Manirampore and Uriyapara Palta on the Hugli ...."

স্বাস্থ্য

■ সেকালের মণিরামপুরের একটি ডিসপেনসারীর পরিসংখ্যান

১৯১১ সালের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে মণিরামপুরে একটি ডিস্‌পেনসারী ছিল। সেখানে কোন শয্যা ছিল না। বর্হিবিভাগে রোগীর সংখ্যা ১২১৬ ছিল। অন্তর্বিভাগে কোন রোগী ছিল না। প্রতিদিন গড়ে রোগীর সংখ্যা ছিল ১৯ জন। পুরসভার গ্রান্ট ছিল ৩০০ টাকা। সরকারি গ্রান্ট ছিল ৬টাকা, আর বেসরকারীভাবে চাঁদা উঠত ৫০ টাকা। ১৯১১ সালে আয় হয়েছিল ৩৫৬ টাকা, খরচ হয়েছিল ১৯৮ টাকা।

■ মণিরামপুর দাতব্য চিকিৎসালয়

উত্তর বারাকপুর পৌরসভা পরিচালিত এই চিকিৎসা কেন্দ্র মিস্ত্রীঘাটের কাছে

অবস্থিত। ঠিক কবে প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলা যায় না। তবে প্রায় ১০০ বছরের পুরানো। এখানে একটি আধুনিক রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। চারটে বিভাগ রয়েছে— দাতব্য চিকিৎসালয়, পলিক্লিনিক, রাত্রিকালীন জরুরী বিভাগ এবং ল্যাবরেটরী। এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্যপুষ্ট একটি কেন্দ্র আছে নয়াপল্লীতে।

● মিস্ত্রীঘাট বয়েজ ক্লাব জরুরী প্রয়োজনে একটি অ্যাম্বুলেন্স উপহার দিয়েছে মণিরামপুরবাসীকে।

● হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে 'কমলাস্মৃতি হোমিও পলিক্লিনিক' (নতুন বাজার) প্রথম মণিরামপুরে একসঙ্গে অনেক ডাক্তারের আয়োজন করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে।

● দু'পয়সা ঘাটের কাছে বাসরাস্তার উপর 'হরিসভা'-তে সম্প্রতি হ্যানিম্যান মিশনের তত্ত্বাবধানে একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

■ যোগব্যায়াম কেন্দ্র

মণিরামপুরের যোগ ব্যায়াম শিক্ষার একটি বিখ্যাত কেন্দ্র হল 'পাতঞ্জল যোগ ইন্‌স্টিটিউট্' । এর প্রশিক্ষক হলেন অধ্যাপক রাজকুমার মুস্তাফি। এই কেন্দ্র থেকে 'পাতঞ্জল যোগ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

■ বারাকপুর ব্যায়াম সমিতি

বেনে পাড়ায় অবস্থিত এ ব্যায়াম সমিতির প্রথমে নাম ছিল 'প্রগতি ব্যায়াম সমিতি' । এই অঞ্চলে শরীর চর্চার প্রাণকেন্দ্র। বিশ্বশ্রী মনোতোষ রায় এখানে দেহ সৌষ্ঠব প্রদর্শন করে গেছেন। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৪ সালে।

■ চিত্রপরিচালকের ভিড়ে মণিরামপুর

বিখ্যাত চিত্রপরিচালক প্রভাত রায়ের সঙ্গে মণিরামপুরের সম্পর্ক অন্তরঙ্গ। এ অঞ্চলে তিনি প্রচুর নাটক করেছেন। কবিতাও লিখেছেন। —'লহ প্রণাম'— প্রভাত রায়।

".....যখনই ধর্মে এসেছে গ্লানি এসেছে মন্দ/নানারূপে তুমি এসেছো হে বীর বিবেকানন্দ,/তুমি উত্তাল, উদ্দাম, তুমি দুর্নিবার/'সত্যম, শিবম, সুন্দরম', তুমি অংশ তার ..."

বিখ্যাত চিত্র পরিচালক অজিত গাঙ্গুলী এবং অপূর্ব মিত্রের বাড়ির ব্যবধান প্রায় ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে। অজিত গাঙ্গুলীও এ অঞ্চলে একসময় নাটক করতেন।

■ মণিরামপুর কি বাজপড়া প্রবণ অঞ্চল?

গত ১০ বছরে একবর্গ কিমি অঞ্চলের মধ্যে বেশ কয়েকবার মণিরামপুরে বাজ পড়তে দেখা গেছে, কখনও বাড়িতে, কখনও গাছের উপর— (১) মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়ের পাশে দু'জায়গায়—পশ্চিমে এবং উত্তরে। (২) ঘটকপাড়া জলকলের প্রাচীরের ধারে পার্কের কাছে। (৩) দাসপাড়া এলাকায়—এস এন ব্যানার্জী রোড ছেড়ে ঘটক পাড়ায় ঢুকে ডান দিকে প্রথম রাস্তার কাছেই। (৪) সিদ্ধেশ্বরী তলা রোড, যেখানে নতুন বাজারকে ছুঁয়েছে তার দক্ষিণ দিকে।

■ পল্লী সেবক সংঘ

পল্লী সেবক সংঘের প্রথম অবস্থায় নাম ছিল 'বয়েজ এক্সারসাইজ ক্লাব'—একথা জানালেন তারাপদ চট্টোপাধ্যায়। ১৩৫৪ সালের ১লা বৈশাখ সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রতিষ্ঠানের নাম হল 'পল্লীসেবক সংঘ।' এক সময় খেলাধূলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করত। এখনও খেলাধূলার ক্ষেত্রে নানারকম কোচিং ক্যাম্প-এর ব্যবস্থা করে থাকে। এই ক্লাবের মঞ্চে প্রচুর নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে।

■ মহিলা সমিতি

পূর্ববঙ্গ থেকে বহু বাস্তহারা পশ্চিমবঙ্গে আসায় তাদের স্বনির্ভর করে তোলবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় 'মহিলা কর্ম মন্দির', (১৯৫১) মিস্ত্রীঘাটে, 'মহিলা শিল্প কুটির' (১৯৫০) সুরেন্দ্রনাথ গভঃ কলোনী এবং 'মহিলা সমবায় শিল্প কুটির লিঃ' (১৯৫৭) সুরেন্দ্রনাথ গভঃ কলোনী।। মহিলারা যাতে ভালভাবে প্রশিক্ষণ পেয়ে জীবিকা অর্জন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এই সব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। —শিখা মজুমদার।

■ পাড়ার কথা

মণিরামপুরের পাড়াগুলোর শ্রেণী বিন্যাস করলে দেখা যায় বেশিরভাগ পাড়া নামের পদবীর সঙ্গে যুক্ত—দে পাড়া, চৌধুরী পাড়া, ঘটক পাড়া, দাস পাড়া, মান্না পাড়া, সাধুখাঁ পাড়া। পেশার সঙ্গে যুক্ত কিছু পাড়ার নাম রয়েছে—বেনে পাড়া, কামার পাড়া, গোয়ালা পাড়া, কাজী পাড়া। কিছু নাম ক্রমশঃ হারিয়ে গেছে। 'ধিতাড়া' হারিয়ে গেছে জলকলের মধ্যে। 'সন্দলপুর' নাম আবার চাকচিক্যে ফিরে আসছে।

■ সুরেন্দ্রনাথ পল্লী

'সুরেন্দ্রনাথ পল্লী' মণিরামপুর গভঃ কলোনী নামেই পরিচিত। এখানে ছিল সবুজের সমারোহ। এখন দু'পাশে ঘর-বাড়ি। ছিল বাগান পর পর চারটে— গাঙ্গুলীদের বাগান, পণ্ডিতের বাগান, কাননদের বাগান এবং শফির বাগান। দুর্গা পুজা হয় যেখানে তার সামনে যে পুকুরটি আছে সেখানে প্রায় বছর পঁয়ত্রিশ আগে প্রখ্যাত সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষ সাঁতারের নানা কৌশল প্রদর্শন করেছিলেন। —বিমলেন্দু দাশগুপ্ত।

■ নতুন বাজার

মণিরামপুরে একটিই মাত্র বাজার— নতুন বাজার। এটি স্থাপিত হয় ১৯৩০ সালে। চন্দ্রমোহন সা এই বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিদিন সকালে এই বাজার বসে। এটি প্রধানতঃ খুচরা বাজার। সম্প্রতি উত্তর বারাকপুর পুরসভা এই বাজারের কিছু সংস্কার সাধন করেছে, কিছু পাকাঘর নির্মিত হয়েছে।

■ সংগ্রহালয়

মণিরামপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে সম্প্রতি গড়ে উঠেছে রাষ্ট্রগুরু সংগ্রহশালা মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে।

■ বাঁশি কেষ্ট ও বেহালা কেষ্ট

"আমার একটি কথা বাঁশি জানে, বাঁশিই জানে।
ভরে রইল বুকের তলা, কারো কাছে হয়নি বলা,
কেবল বলে গেলেম বাঁশির কানে কানে।।"

এই মণিরামপুর অঞ্চলের পথ চলা মানুষ কখনও কখনও বেহালা আর বাঁশির যুগলবন্দী শুনে কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াত। তারপর সুরের রেশ নিয়ে আবার পথ চলত।

সেকালের এই এলাকায় গানের আসরে একজন বাজাতেন বাঁশি, অন্যজন বেহালা। আড়-বাঁশি বাদক কৈলাসপতি মুখোপাধ্যায় এবং বেহালা বাদক কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যথাক্রমে বাঁশি ও বেহালা কেষ্ট নামে সুপরিচিত ছিলেন। প্রয়াত অশ্বিনী ঘোষের বাড়িতে প্রায়শই গানের মজলিস বসত। সেই আসরে দুজনেই উপস্থিত থাকতেন। দুজনেই ছিলেন হরিহর আত্মা। এলাকার বাইরেও নীলগঞ্জ, বারাসাত, নৈহাটি ইত্যাদি জায়গায় তাঁদের ডাক পড়ত। চন্দ্রমোহন সা'র ঠাকুর বাড়িতে, যাত্রার আসরে, জলসায় নিয়মিত বাজাতেন। প্রয়াত এই দুই শিল্পীর কথা আজো পুরানো বাসিন্দাদের রোমাঞ্চিত করে তোলে।

ফেরীঘাট

"ওরা চিরকাল/টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল।"

মণিরামপুরে পারাপারের জন্য ফেরীঘাটের সংখ্যা দু'টি—

■ দু'পয়সার ফেরীঘাট (মণিরামপুর-নিমাইতীর্থ ফেরী-সার্ভিস)

উত্তর বারাকপুর পুরসভায় এই ঘাটের ডাক হয় নিমাই তীর্থ ফেরীঘাট নামে। যদিও এই ঘাটটি দু'পসার ঘাট, ঘোষপাড়ার ঘাট, শেওড়াফুলির ঘাট, কলাহাটা ঘাট প্রভৃতি নামে পরিচিত। ৮১ নং বাসে দু'পয়সার ঘাট স্টপেজে নেমে পশ্চিম দিক বরাবর সোজা গেলেই এই ঘাট। এখন পারাপারের ভাড়া আর দু'পয়সা নেই, ৭০ পয়সা, টিকিট দেওয়ার রীতি চালু হয়েছে। এখন নৌকা বলতে, চলতি কথায় ভট্ভটি চলে। হাল বলতে লোহার বাঁকানো রড। তাড়াতাড়ি পার হওয়া যায়। একসময় পুরসভার নৌকা ছাড়াও কিছু প্রাইভেট নৌকা চলত। সেজন্য বেশি পয়সা দিতে হত। সে প্রথা অবশ্য ওঠে গেছে।

চৈত্র আর শ্রাবণ মাসে প্রচুর তীর্থযাত্রী জল নিয়ে তারকেশ্বর পায়ে হেঁটে যাবার জন্য এই ঘাট পারাপার করে। এই ঘাট পেরিয়ে যাওয়াই অনেকে সুবিধাজনক মনে করে। পূণ্যার্থীদের যতদূর সম্ভব সুযোগ সুবিধা দেবার কথা কর্তৃপক্ষ চিন্তা করে। পূণ্যার্থীদের কথা মাথায় রেখে কিছু বেকার ছেলেমেয়ে নানারকম সামগ্রী নিয়ে বসে। পুরদস্তুর মেলার মেজাজ গড়ে ওঠে বাসরাস্তা থেকে ঘাটের রাস্তা বরাবর। পূণ্যার্থীদের জল দান করবার জন্য বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থারও আগমন ঘটে।

■ চার পয়সার ঘাট

এই ঘাটের আসল নাম কানাই দেওয়ানের ঘাট। মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয় স্টপেজে নেমে পশ্চিমদিক বরাবর ভোলাগিরি আশ্রম ছাড়িয়েই এই ঘাট। এখন আর পারাপারের ভাড়া চার পয়সা নেই, ৭০ পয়সা। টিকিট দেবার প্রথা নেই। এখানেও ভটভটি চলে। চৈত্র এবং শ্রাবণ মাসে কিছু তীর্থযাত্রী এ পথ দিয়েও গঙ্গা পারাপার করে থাকে।

নাইতে যাবার ঘাট

"নদীর ঘাটের কাছে নৌকা বাঁধা আছে
নাইতে যখন যাই দেখি সে
জলের ঢেউয়ে নাচে।"

এই অঞ্চলে বেশ কিছু স্নানের ঘাট আছে—(১) দে পাড়ার ঘাট, (২) দু'পয়সার ঘাট (ঘোষ পাড়ার ঘাট), (৩) ঘটক পাড়ার ঘাট, (৪) দাস পাড়ার ঘাট, (৫) চার পয়সার ঘাট (কানাই দেওয়ান ঘাট), (৬) বালি ঘাট, (৭) মিস্ত্রী ঘাট (এখন জঙ্গলাকীর্ণ)। এছাড়াও ইটখোলার ঘাট বলে দুটি ঘাট রয়েছে। ইট খোলার লোকেরাই বেশির ভাগ সেখানে স্নান করে। মহিলাদের নিরাপদে স্নান করার জন্য রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ মণিরামপুরস্থিত বাড়িতে একটি বাঁধানো পুকুরঘাট করে দিয়েছিলেন।

মিস্ত্রীঘাটের গোড়ার কথা

"এই মণিরামপুর গ্রামটি পুণ্যভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। গঙ্গাদেবী এই গ্রামটি বাহুবেষ্টনে পূত দেহ করিয়া রাখিয়াছেন। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে গঙ্গার সলিল রাশি এই গ্রামকে অনন্যসদৃশ্য ভাগ্যে ধন্য করিয়াছেন। এই গ্রামের একাংশে 'মিস্ত্রীঘাট' নামে একটি স্নানের ঘাট ঘাট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার নির্মাণকাল সুনিশ্চিত না হইলেও ইহার প্রতিষ্ঠা ১৮৭৪ খ্রীঃ হয়িছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এই ঘাটের সন্নিহিত পূর্ব দিকে একটি সুবৃহৎ উদ্যান বাটিকা গঠিত হয়, যাহার ধ্বংসোন্মুখ অবয়ব এখনও আমরা লক্ষ্য করি। এই উদ্যান বাটিতা তৎকালীন ইংরাজ শাসিত ভারতের রাজধানী কলিকাতাবাসী এক ধনিক ব্যবহারজীবী নির্মাণ করেন। ইনি ধনবান, বিলাসী ও ধর্মপ্রাণ পুরুষ ছিলেন এবং গ্রামবাসীদের প্রতি হিতকামী ছিলেন। এই সকল কারণে তিনি তাঁহার উদ্যান বাটিকার নিকটে গঙ্গাতটে এক লৌহদেহ সোপানবলী নির্মিত করাইয়া দেন। বহু ব্যয়ে ও বহু প্রয়াসে সুদক্ষ মিস্ত্রী দল দিয়া ঘাটটির নির্মাণকার্য সমাপিত হওয়ায় গ্রামের লোকেরা ঘাটটিকে 'মিস্ত্রীঘাট' নামে পরিচিত করিয়াছিল।"

নিমাইতীর্থ ঘাট

নিমাই যিনি পরবর্তীকালে চৈতন্যদেব বা মহাপ্রভুরূপে বিদিত হয়েছেন তাঁর নাম থেকেই 'নিমাইতীর্থঘাট' নাম হয়েছে এই জনশ্রুতি চলে আসছে। প্রাচীন কাব্যেও এর উল্লেখ রয়েছে যে, শ্রী চৈতন্য এই ঘাটের ওপর দিয়ে ছত্রভোগ হয়ে পুরী রওনা হয়েছিলেন। নিমাইতীর্থ ঘাটের উল্লেখ রয়েছে বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' কাব্যে। কিন্তু বিভ্রান্তি হলো, এই কাব্য রচিত হয় ১৪৯৫ খ্রীঃ; আর নিমাই-র জন্ম ১৪৮৬ খ্রীঃ; অর্থাৎ নিমাই'র বয়স তখন প্রায় ৯ বৎসর। এই বয়সেই তার নামানুসারে নিমাইতীর্থ ঘাট এরূপ নাম হয়েছে—এ ধরনের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অন্য কোন নিমাই'র পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাছাড়া জনশ্রুতি যেভাবে পরম্পরায় চলে আসছে তাতে এ কথাই বলতে হয় মহাপ্রভু নিমাই'র নাম থেকেই এই ঘাটের নামকরণ হয়েছে। সেক্ষেত্রে বলা যায় 'মনসাবিজয়' রচনা কালের মধ্যেই কোনও বিভ্রান্তি রয়েছে।

মণিরামপুর শ্মশান ঘাট

উত্তর বারাকপুর পুরসভার অধীন মণিরামপুর শ্মশান ঘাট। এখানে কাঠের চিতাতেই মৃতদেহ সৎকার করা হয়। বেশিরভাগ মৃতদেহ কিছু দূরে রাণী রাসমণি ঘাটেই সৎকার হয় বৈদ্যুতিক চুল্লিতে।

পরিবহন

মণিরামপুর থেকে দু'পয়সা/চার পয়সা ঘাট পেরিয়ে শেওড়াফুলি ঘাট থেকে ট্রেন ধরে হাওড়া-কলকাতা-বর্ধমান-তারকেশ্বরের দিকে যাওয়া যায়। অটো/বাসে করে বারাকপুর স্টেশন পৌছে সেখান থেকে ট্রেন ধরে রাজধানী কলকাতা বা রানাঘাটের দিকে যাওয়া যায়। তাছাড়া বারাকপুর কোর্ট থেকে অল্প সময়ের ব্যবধানে ৭৮ নং বাস কলকাতার দিকে ছুটছে। মণিরামপুর ফিসারীর কাছ থেকে ৮১ নং বাস যাচ্ছে বারাসত। ৮৫নং বাস কাঁচড়াপাড়ার দিকে যাচ্ছে। দু'পয়সার ঘাট থেকে বারাকপুর স্টেশন অটো সার্ভিস চালু আছে, আর আছে দুটি ফেরি সার্ভিস—মণিরামপুর—নিমাইতীর্থ ফেরি সার্ভিস আর কানাই দেওয়ান ঘাটের (চার পয়সা) ফেরি সার্ভিস।

সাইকেল সার্ভিস

মণিরামপুর অঞ্চলে বেশ কিছু লোক ইছাপুরের কারখানায় ভোর না হতেই ডিউটিতে বেরিয়ে পড়ে। তাদের জন্য বাড়ির তৈরি দুপুরের খাবার বহন করে নিয়ে যায় মণিরামপুরের দু'জন সাইকেল আরোহী ঝড়, জল উপেক্ষা করে।

মণিরামপুর ও সদর বাজার অঞ্চলে রক্তদান শিবির

যুব সংস্কৃতি (ঘটকপাড়া মণিরামপুর) ১৯৯২ সালে প্রথম স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজন করে। ২০০০ খ্রীঃ পর্যন্ত মোট রক্তদান করেছে ৫২৫জন। এছাড়া চক্ষুদানের জন্য অঙ্গীকার করেছে ৫০জন এবং দেহদানের জন্য অঙ্গীকার করেছে ৫জন। এই সংস্থার ৪৬৭টি ক্রেডিট কার্ড লেগেছে রোগীর সেবায়। থ্যালাসেমিয়া শিশুদের ক্রেডিট কার্ড দিয়ে সাহায্য করে থাকে। এছাড়া যাঁরা রক্তদান শিবির করে থাকে— যুব সংঘ—সুরেন্দ্রনাথ পল্লী, ইউনিভার্স ক্লাব, জাগৃতি— সিদ্ধেশ্বরীতলা রোড, বেনিয়াপাড়া কালচারাল সোসাইটি, সিটিজেন্স ফোরাম—সদর বাজার, মিস্ত্রিঘাট বয়েজ ক্লাব।

বারাকপুর 'সেবা' কেন্দ্র : পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সদরবাজার এবং মণিরামপুর অঞ্চলে বিভিন্ন প্রাইমারী বিদ্যালয় শিশুশ্রমিক কল্যাণ বিদ্যালয়, পথশিশু এবং বার্ধক্যভাতা গ্রহীতাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং ঔষধ প্রদান বিনামূল্যে করে থাকে। এছাড়া বিনা খরচে চক্ষুদান শিবিরও করে থাকে। (তথ্য : *শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়*)

লালচাঁদ বড়াল : বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ লালচাঁদ বড়াল। তাঁর বাড়ি বারাকপুরের মণিরামপুরে। মণিরামপুরের বড় বাগানবাড়িতে নির্জনে করতেন সুরসাধনা। (তথ্য সংগ্রাহক . চন্দন চক্রবর্তী)

১৯৯১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী
মণিরামপুরের লোকসংখ্যা

মণিরামপুর অঞ্চলে পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা (১৮-২২)

ওয়ার্ড	মোট লোকসংখ্যা	পুরুষ	নারী	তপঃ জাঃ		তপঃ উপঃ		শিক্ষিত	
				পুঃ	নাঃ	পুঃ	নাঃ	পুঃ	নাঃ
১৮	৭২৬৭	৩৯৫৬	৩৩১১	৩৫৬	২৬২	৮	২	২৫৫৭	১৬৪১
১৯	৪২৩৭	২৩৩০	১৯০৭	২৭৪	২০১	৯৭	৯৭	১৭৩৫	১৩০৯
২০	৫২২২	২৮২৯	২৩৯৩	৪২২	৪০৭	৪৬	৩৭	২১৭৪	১৬৯৯
২১	২৩০৬	১২২৪	১০৮২	৬	৭	—	—	১০৭৯	৮৭০
২২	৩১৯৭	১৭৮৭	১৪১০	১৫৬	৫৯	২	৩	১৩৮১	১০৩১
৫	২২২২৯	১২১২৬	১০১০৩	১২১৪	৯৩৬	১৫৩	১৩৯	৮৯২৬	৬৫৫০

Source : Census 1991, W.B., Dist. Census Barrackpore, North 24 Pgs.

साइकिल पर भारत यात्री भिवानी में

([illegible] प्रतिनिधि)

[illegible] "Bengal for writing, Punjab for fighting, Madras for cooking & Bombay (City) for beauty." [illegible]

■ সাইকেলে ভারতভ্রমণ

মণিরামপুর বেনেপাড়ার শ্রী শচীনন্দন মুখোপাধ্যায় মালেশ্বর রাওকে সঙ্গী করে ১৯৫৮ সালের ২৬ জানুয়ারি বেনেপাড়ার গোবিন্দবাটী থেকে সাইকেলে চড়ে ভারত পরিক্রমা শুরু করেন। প্রায় সাড়ে তিন বছর পর পরিক্রমা শেষ করে মণিরামপুর ফিরে আসেন। তাঁর বয়স এখন ৭০-এর কাছাকাছি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তথেকে বহু অভিনন্দন বার্তা পেয়েছেন। এখন তিনি কেমন আছেন দায়িত্বশীল নাগরিকরা কি কোন খোঁজ রাখেন!

They were flagged off today from Patna by the newly-elected MP, Mr/ Ram Kripal Yadav for their next stoppage.

claming the expendition to be the first of its kind, the group leader, Mr Bhaduri said they would altogether cover a distance of 2,250 kms. their final destination, according to him, is Diamond Harbour where they hope to reach by July 15. The expendition, started off from Har-ki-Pauri on may 15, has so far covered various places including Kanpur. Allahabad, Varanasi and Patna.

Mr. Bhduri, who is a Unani doctor by profession, said that their "most strenuous" expedition was the longest in terms of distance. The team members are optimistice. The team members are optimistic that the succesful completion of this dare-devil act would enable their entry into the Guness Book of world Records.

– Patna, 21.6.93, The Hindustan Times.

■ সাঁতারে হরিদ্বার থেকে ডায়মণ্ডহারবার

মণিরামপুরের উত্তম রায় এবং কমলেশ ভাদুড়ি (যিনি টিউবের ভেলায় দলের মালপত্র নিয়ে সঙ্গী হয়েছিলেন) ১৫ মে ১৯৯৩ সালে হরিদ্বার থেকে সাঁতার শুরু করেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন হুগলী জেলার শেওড়াফুলি অঞ্চলের আরো দু'জন—কমল চক্রবর্তী এবং অরূপ চক্রবর্তী। গঙ্গা দূষণ, ড্রাগ-এ এসব বিষয়ে সচেতন করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। বহু কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। কোথাও গঙ্গায় সাঁতারানোর মত জল না পেয়ে নদীর বুকের উপর দিয়ে হাঁটতে হয়েছে।

প্রাচীন দুর্গাপুজো, ত্রিনাথ মন্দির, যাত্রাপালা ও শান্তশ্রী পল্লী

—শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়

মণিরামপুরের প্রাচীন দুর্গাপুজো

সেকালে মণিরামপুরে কয়েকটি বাড়িতে পারিবারিক দুর্গোৎসব হতো। সেই প্রাচীন দুর্গা পুজোয় বাড়ির এরং পাড়ার লোকেরা যোগ দিয়ে উৎসব আনন্দের শরিক হতেন। তখন যৌথ পরিবারের প্রচলন থাকায় পারিবারিক দুর্গাপুজো উৎসব মুখর হয়ে উঠতো। পারিবারিক দুর্গাপুজোর কথা বলতে গেলে প্রথমেই চৌধুরীপাড়ার চৌধুরী বংশের পুজোর কথা বলতে হয়। এই পুজোটি এখনও দেবেন চৌধুরীর বাড়িতে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। বেশ কয়েক পুরুষের এই পুজো।

ঘটকপাড়ায় পারিবারিক পুজো হতো দুটি। প্রথমটি রামলাল মুখার্জির বাড়িতে। পুজোর দালানে দুর্গা প্রতিমা শোভা পেত। আর দ্বিতীয় পুজোটি ছিল হৃষিকেশ ঘোষের বাড়িতে। বাঁশ বা পোস্টে দড়ি দিয়ে টাঙানো হতো ডেলাইট। তাঁর আলোয় ঝলমল করতো প্রতিমার মুখ।

গোয়ালাপাড়ার বিনোদ বিহারী ঘোষের বাড়িতে যে পারিবারিক পুজো চলতো তাতেও ঘরোয়া পরিবেশ নিয়ম নিষ্ঠার অভাব ছিল না। দুর্গা পুজোর ক' টি দিন প্রতিবেশীদের আনাগোনা থাকতো। আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থাও ছিল।

মণিরামপুরের সদানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে (বর্তমানে কেদার মুখার্জি রোড ও জগন্নাথ সিং রোডের সংযোগ স্থলে) পারিবারিক পুজো হতো। বাড়িতে একচালা প্রতিমা বিশাল পশ্চিমমুখী দুর্গা মণ্ডপে শোভা পেত। দুর্গা মণ্ডপের স্তম্ভগুলোর খিলানের কারুকাজ অপূর্ব ছিল। এখানে দীন দরিদ্র সেবার ব্যবস্থা ছিল। এই পুজো বন্ধ হয়ে গেছে তিন পুরুষ আগে।

সাধুখাঁ পাড়ার পারিবারিক দুর্গা পুজোয় ছিল মানুষের অবাধ গতি। দান ধ্যান, আতিথেয়তা ছিল এই পুজোয়। দেবীর আগমণের ক' টি দিন আগে থেকেই সাজ সাজ রব বাড়িতে। এই বাড়ি হৃদয়নাথ সাধুখাঁর। ধূপ ধুনোর গন্ধ চোখ ধাঁধানো আলোর জৌলুস নিয়ে হৈ হৈ করে কেটে যেত চারদিন।

সদর বাজার অঞ্চলে গোলা মহলের প্রমোদ কুমার দাসের বর্তমান প্রমোদ ভবন' এ পারিবারিক দুর্গা পুজো উদ্‌যাপিত হতো। ডাকের সাজ একচালা প্রতিমা ঝাড়বাতির আলোয় ঝলমল করতো। এখানেও দরিদ্র নারায়ণ সেবা হতো।

বেনেপাড়ায় রামপদ হালদারের বাড়িতে পারিবারিক দুর্গাপুজো হতো। দেবী ডাকের

সাজের। দীন দরিদ্রের সেবা হতো। ঠাকুর দালানে ঝাড়বাতি শোভায় চারিদিক আলোকিত হতো। বড় তালপাতার রঙিন পাখা, বিভিন্ন রং-এর চিনে বাজারের রকমারি আকৃতির ফুল টাঙানো থাকতো সেখানে। পুজোর শেষে যাত্রার আনন্দও ছিল।

সদর বাজার গোলামহলে জোড়া শিবমন্দিরের সম্মুখে দুর্গাপুজো আজও হয়ে থাকে। এই পুজো ১৯২৮ সালে রাজেন্দ্রলাল আচার্য, রাধারমণ হালদার, ভোনানাথ নন্দী, শম্ভুনাথ নন্দী, বিপিন নন্দী, অধরচন্দ্র দাস ও অন্যান্য কয়েকজনের উদ্যোগে শুরু হয়।

ত্রিনাথ মন্দির

মণিরামপুর কামারপাড়ায় এই ত্রিনাথ মন্দির। এই মন্দিরের শিল্প কারুকার্য আকর্ষণীয়। কালী ব্যতীত অন্যান্য দেব দেবীর মূর্তি শ্বেত পাথরের। মহাবীরের মূর্তি লাল রঙ করা। শিল্প নৈপুণ্য দেখার মত। মন্দিরের ৭টি চূড়া। গেটের ওপরে ৩টি। এছাড়া দুটি হাতির মূর্তি সামনে আছে। ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়।

ত্রিনাথ মন্দিরে উৎসব হয় জন্মাষ্ঠমী, শিব রাত্রি, মকর সংক্রান্তি, অক্ষয় তৃতীয়ায়। মন্দির চত্বরে, অক্ষয় তৃতীয়ায় মেলা বসে ৭ দিন।

যাত্রাপালা

মণিরামপুরে চন্দ্র মোহন সা ঠাকুর বাড়িতে মণিরামপুরের যাত্রা পালার ধারা কোনক্রমে জিইয়ে রেখেছে নব মহুয়া নাট্য সংস্থা। এই ঠাকুর বাড়ি শতবর্ষ পূর্বে চন্দ্রমোহন সা প্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুর বাড়িতে শ্রীশ্রীমদন মোহন জিউয়ের বিগ্রহ আছে। তাঁর বংশধরেরা অতীতে প্রতি বছর রাস উপলক্ষে পুতুল নাচ, যাত্রাপালা, তর্জা, নাটক ও কীর্তনের মাধ্যমে উৎসব পালন করতেন। ৭/৮ দিন মহানন্দে স্থানীয় অধিবাসীরা উৎসবে মাতোয়ারা হতেন। বর্তমানে সেই জৌলুস নেই। অনুষ্ঠানের দিন সংক্ষিপ্ত। তবে ঠাকুর বাড়ি রঙচঙ, পূজা অর্চনা রাসের সময় হয়।

১৯৩০ সাল থেকে স্থানীয় মদন মোহন নাট্য সংঘ এখানে যাত্রা পরিচালনা করেছে। পরবর্তী সময়ে স্থানীয় ও বহিরাগত কিছু নাট্য সংস্থার মানুষেরা এখানে নাটক ও যাত্রা করেছে। সদর বাজারের স্বামীজী ক্লাবও এখানে যাত্রা, নাটক করে গেছে। শৌখিন নাট্য সমাজ, বটতলা স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্যরা ঠাকুর বাড়ির প্রাঙ্গণে অভিনয় করেছে। নব মহুয়া নাট্য সংস্থা ১৯৭২ সালে স্থাপিত হয়। প্রতি বছর জানুয়ারিতে একটি করে পালা মঞ্চস্থ হয়। মূলত যাত্রাপালা সদস্যরাই করে থাকেন। নব মহুয়া নাট্য সংস্থার সদস্যগণ ১৯৭২ সালে প্রথম যাত্রাপালা করেন।

সদরবাজার গোলামহলের জোড়া শিবমন্দির

এই মন্দিরটি দেবীপ্রসাদ আগরওয়ালা ১৯১৮ সাল নাগাদ প্রতিষ্ঠা করেন। অষ্টধাতুর

পঞ্চাননের বিগ্রহ পাশে স্থাপিত আছে রাধাগোবিন্দ। এই মন্দির প্রাঙ্গণে দুর্গাপুজো, কালীপুজো ছাড়াও কয়েকবছর জগদ্ধাত্রীপুজো হয়েছিল।

শান্তশ্রী পল্লী

'শান্তশ্রী পল্লী সমবায় আবাসন সমিতি লিমিটেড' এক কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি। প্রথমে এর রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা ছিল ১২২ নং বাকর মহল সদর বাজার পোঃ ও থানা বারাকপুর। এখন ফ্রিঞ্জ রোডের পাশে 'শান্তশ্রীপল্লী' তার স্থায়ী ঠিকানা করে নিয়েছে। বারাকপুর কোর্ট থেকে উত্তর বারাকপুর পুরসভা যাওয়ার পথে ফ্রিঞ্জ রোড পড়ে। পূর্বে এখানে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে চাষবাস চলতো। আর পথের পাশে জংলী নির্জল এলাকায় চোর ডাকাতের ভয় ছিল। ফ্রিঞ্জ রোড ধরে কিছুটা পূর্বে এগিয়ে গেলে ফের বামদিকে পথ গেছে। সেখানে কালভার্টের ওপর ধীরেন ডাকাত বসে থাকত। এই বছর ৩৫ আগের কথা বলছি। পথ চলতি ফ্যাক্টরি বাবুরা এবং অন্যান্য পথিকদের মধ্যে আগ্রহ দেখা যেত এক বৃদ্ধের হাতে অর্থ দিতে। ভয়ে না ভক্তিতে তা বলতে পারবো না। শৈশবে পথের দুপাশে ঘন বাঁশবন ঝোপঝাড়ের মাঝে শিয়াল দেখে দলবেঁধে শ্রাবণ মাসে নবাব গঞ্জের ঝুলন মেলায় একাধিকবার যেতাম। আমি কিন্তু ভয়ে ভয়ে বৃদ্ধের দিকে দেখতাম। সে কথা বলতো না, স্থির চোখে চেয়ে থাকতো। সাবেক জনশ্রুতি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় একবার ধীরেন ডাকাত পুলিশের জালে ধরা পড়ে। তার অনুপস্থিতিতে মাটির তলায় লুকানো সম্পদের ওপর বোম পড়ে এবং পরবর্তী সময়ে সে আর সম্পদের হদিশ না পাওয়ায় তার মনের পরিবর্তন হয়। ডাকাতি ছেড়ে দেয় সে। তারপর আশ্চর্য তার অভয়ে ছিনতাই কমে য়ায়। তার মৃত্যুর পরে ছায়াঘন নির্জন পথে যখন ফের রাহাজানি শুরু হয়। ফ্যাক্টরির বাবুরা তখন দলবদ্ধ হয়ে সাইকেলে যাতায়াত করতে থাকে।

১৯৪০ সালে বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটি আইন অনুসারে 'শান্তশ্রী পল্লী সমবায় আবাস সমিতি লিমিটেড' রেজিস্ট্রি হয়েছিল। শান্তশ্রীপল্লী সার্থক হয়েছে শান্ত সৌন্দর্যপূর্ণ পরিবেশের জন্য। পথগুলো প্রশস্থ। কিছু পথ এখনও কাঁচা। সোসাইটির অনুকূলে প্রথম জমি অধিগ্রহণ হয় ১৯৬৮ সালে। প্রশস্থ পথের দুপাশে সারিবদ্ধ সাজানো বাড়ি। সামনে ছোট ছোট ফুল গাছের জটলা। এখানে সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত ও কয়েকটি বাড়িতে উচ্চ মধ্যবিত্তের বাস। এখানে আনুমানিক হাজার মানুষের বসবাস। অথচ যাতায়াত ও জলের যথেষ্ট অভাব। পল্লীটি পলতা মৌজার এলাকায় পড়ে।

শান্তশ্রী পল্লীর শুরুতেই যাঁর অক্লান্ত শ্রম ও আগ্রহ ছিল তিনি নিরঞ্জন ঘোষ এবং পরবর্তীকালে মনোরঞ্জন দাশ প্রমুখ। শান্তশ্রী পল্লীর আশপাশে আরও ক'টি জনবসতি গড়ে উঠেছে। তাদের নাম রামকৃষ্ণপল্লী, আজাদ নগর, আদর্শনগর। এসবই উত্তর বারাকপুর পৌরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত।

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট ছড়াকার

তৃতীয় অধ্যায়

○ ছাউনী শহর

Cantonment Board Administration

Cantonments are divided into three classes depending on the civil population residing therein. The local Government set up consists of a Cantonment Board which was a mixed representation. The Officer Commanding, the Station is the President of Cantonment Board. In addition three ex-officio members and nominated official and elected members constitute the Board. The number of elected and nominated members on the Board varies. The Cantonment Board is responsible for the civic administration of the Cantonment and exercises various regulatory powers. The President is vested with specific duties the under the Cantonments Act. The Executive Officer acts as the Secretary of the Board and has got well-defined executive powers to be ex-cercised in his own right. He is invariably an officer of the Indian Defence Estates Service. The powers of supervision and control on the Board are allocated concurrently to the Director, Defence Estates, the Command and the GOC-in-Chief, the Command in some matters. The high powers of control are exercised by the Central Government.

Date of Establishment of the Cantonment Board–1765

Area	:	**917.57 acres**
Population	:	**Civil–19,931 as per 1991 census.**
No of Institutions maintained by the cantonment Board for Civil population	:	**Two Primary Schools** **One Public Library** **One Cantonment General Hospital.**

Source : Office of the Cantonment Board, Barrackpore

বারাকপুরের দু'টি সিপাহী বিদ্রোহ

প্রথম বিদ্রোহ ১৮২৪ খ্রীঃ

কানাইপদ রায়

মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে বারাকপুরের ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের ৩৩ বছর আগেই ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে বড় মাপের একটি সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে গিয়েছিল এই বারাকপুরেই। ব্রহ্মদেশে যুদ্ধের জন্য সেনা পাঠানোর নির্দেশ আসে বারাকপুর সেনা ছাউনীতে। কিন্তু ৪৭ নং বেঙ্গল ইন্‌ফ্যানট্রি যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করল। গাড়ীর অভাবের জন্য সিপাহীদের জাহাজে করে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করা হলে সিপাহীদের মধ্যে দানা বাঁধল অসন্তোষ। সেই সময় সিপাহীদের বিশ্বাস ছিল সমুদ্র অর্থাৎ কালাপানি পার হলে তাদের জাতধর্ম নষ্ট হবে। সে কারণে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যুদ্ধে যাবে না কিছুতেই। ঐতিহাসিক J.W. Kaye লিখেছেন, —In 1824, during the Burmese War, Bengal troops were needed to take part in the operations, but a difficulty arose as the transport. The Sepoys had not enlisted to serve beyond the seas, but only in countries to which they could march. The regiments were therefore marched to the frontier station of Chittagong and there assembled for the landward invasion of Burmah. Several corps had already marched, and the 47th Bengal Infantry had been warned for foreign service, and was waiting at Barrackpur whilst preparations were being made for its march. Meanwhile the British troops had sustained a disaster at Ramu, a frontier station between Chittagong and Arakan, and the news, grossly exaggerated, reached Lower Bengal. Strange stories found their way into circulation as to the difficulties of the country to be traversed, and the prowess of the enemy to be encountered. The willingness which the Sepoys had shown to take part in the operations beyond the frontier began to subside, and they were eager to find a pretext for refusing to march on such hazardous service. This excuse was soon

found. There was a scarcity of available carriage-cattle for the movement of the troops. Neither bullocks nor drivers were to be hired, and extravagant prices were demanded for wretched cattle not equal to a day's journey. The utmost efforts of the commissariat failed to obtain the needful supply. In this conjuncture, a lie was circulated through the Sepoy lines at Barrackpur, that as the Bengal regiments could not be marched to Chittagong for want of cattle, they, in defiance of their caste feelings, would be put on board ship and carried to Rangoon accross the Bay of Bengal. Discontent developed into oaths of resistance, and the regiments warned for service in Burmah vowed they would not cross the sea."

কর্নেল কার্টরাইট, যিনি ছিলেন ৪৭ নং রেজিমেন্টের কম্যান্ডে, সিপাহীদের যানবাহন যোগাড় করে চট্টগ্রাম রওনা হবার জন্য বোঝালেন। সিপাহীরা না যাবার জন্য অজুহাত দেখাতে লাগল—বলদ গাড়ীর ব্যবস্থা করতে হবে কোম্পানীকেই; তাদেরই খরচা বহন করতে হবে ইত্যাদি। এটা ঘটনা যে, দেশীয় সৈন্যদের মাইনে ছিল কম, আবার সেই মাইনের থেকেই উর্দি কেনা ছাড়াও আরো অনেক বিস্তর খরচ করতে হত।

৩০ অক্টোবর প্যারেডের সময় ৪৭ নং রেজিমেন্ট রীতিমত বিদ্রোহ করল —পরিষ্কার জানিয়ে দিল, ডবল বাটা দেওয়া না হলে কিছুতেই তারা ব্রহ্মদেশ যাবে না।

১ নভেম্বর প্যারেড শুরু হলে সিপাহীরা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সিপাহীদের এরকম ঔদ্ধত্য দেখে কম্যান্ডার ইন্ চিফ্, এড্ওয়ার্ড প্যাগেট্, ইংরাজ গোলন্দাজ এবং গভর্নর জেনারেলের রক্ষী বাহিনীর একদল সেনা নিয়ে ছুটলেন বারাকপুর। পরদিন গোরা সৈন্যদের সামনে বিদ্রোহী বাহিনীর সিপাহীদের দাঁড় করিয়ে গোলা নিক্ষেপ করা হল। যারা ধরা পড়ল তাদের হল ফাঁসী। আর যারা পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিল তাদের অনেকেই হুগলীর জলে প্রাণ বিসর্জন দিল। ৪৭ নং রেজিমেন্ট সেনা তালিকা থেকে বাদ পড়ল।

সম্প্রতি ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ নিয়ে কিছু অপ্রকাশিত তথ্য প্রকাশ পাচ্ছে। বিন্দী তিওয়ারী নাকি এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিল। এপ্রসঙ্গে 'সংবাদপ্রতিদিন'-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন —

শুক্রবার ■ ১৬ এপ্রিল ১৯৯৯ মহানগর

বারাকপুর ক্যান্টনমেন্টের ঐতিহাসিক নথি □ সংঘাত, গুলি, ফাঁসি

বিন্দির নেতৃত্বে সিপাহি বিদ্রোহ ৩৩ বছর আগেই ?

■ দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহ

বেঙ্গল আর্মির ৩৪ নং পদাতিক বাহিনীর সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ বারাকপুরে সামরিক কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে প্রথম শহীদ হলেন মহাবিদ্রোহের। বারাকপুরের বিদ্রোহের কিছুদিনের মধ্যেই ১০ মে মীরাট; ১১ মে দিল্লি, ২৩ মে বেনারস, এলাহাবাদ, কানপুর; ৩০ মে লক্ষ্ণৌ; ৩১ মে বেরিলি; ৫ জুন আগ্রা; ১৪ জুন ঝাঁন্সী প্রভৃতি স্থানে সিপাহী বিদ্রোহ গণবিদ্রোহের রূপ নেয়।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত যে বিদ্রোহকে নিয়ে বিদ্রূপ করেছেন, মার্কস্ যে বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছেন, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার যাকে সামরিক অভ্যুত্থান বলেছেন, সেই বিদ্রোহের শুরুটা কিভাবে হয়েছিল?

২৯ মার্চ, ১৮৫৭। ৩৪ নং পদাতিক বাহিনীর এক সিপাহী মাস্কেট নিয়ে এদিক ওদিক পায়চারী করছে আর চিৎকার করে বলছে, 'প্রথম ইংরেজ যাকেই দেখব তাকেই গুলি করব।' এই সিপাহী হল যুবক মঙ্গল পাণ্ডে। কিসের জন্য তাঁর এই ক্ষোভ? তাঁর কথাবার্তা থেকে ক্ষোভের কারণ ধর্মীয় বলে মনে হলেও ধর্ম ছিল নিছকই অজুহাত মাত্র। ইংরেজ অপশাসনের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে ধর্মের অজুহাত দিয়ে আঘাত করতেই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল মঙ্গল পাণ্ডে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বারাকপুর ছিল ফৌজের প্রেসিডেন্সী বিভাগের হেড কোয়ার্টার। এর প্রধান ছিলেন অভিজ্ঞ অফিসার জন্ হিয়ারসে। তিনি সিপাহীদের আচার ব্যবহার ভাল বুঝতেন। তাদের ভাষায় কথা বলতে পারতেন। ভাল হিন্দী বলতে পারতেন। সেই সময় মাস্কেটের বদলে

সিপাহীদের এন্‌ফিল্ড রাইফেল দেবার পরিকল্পনা চলছিল। এই রাইফেলে টোটা ব্যবহার করতে হলে টোটার উপরের কার্তুজ প্রথমে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিতে হত। কিন্তু সিপাহীদের সন্দেহ এই কার্তুজ গরু আর শুয়োরের চর্বি দিয়ে তৈরী। অতএব, জাত যাবে। এই সন্দেহ আরো ঘনীভূত হল একটি ঘটনায়। দমদম ছাউনীর এক খালাসী, এক ব্রাহ্মণ সিপাহীর লোটা থেকে জল ঢেলে খেতে গেলে জাত যাবে এই ভয়ে ব্রাহ্মণ সিপাহী লোটা থেকে জল দিতে অস্বীকার করল। "জাতের বড়াই আর করতে হবে না। গরু আর শুয়োরের চর্বি দিয়ে সরকার টোটা তৈরী করেছে। সেই টোটাই তোমাদের দাঁতে কেটে ব্যবহার করতে হবে"—সেই খালাসী একথা জানানো মাত্র সিপাহীদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল। গুজব রটে গেল সিপাহীদের খ্রীষ্টান করা হবে। সিপাহীরা উঠল তেতে। বারাকপুরের একটা টেলিগ্রাফ অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হল। ৫ ফেব্রুয়ারী গোপন বৈঠকে বসলেন সিপাহীরা। ঠিক হল মৃত্যু বরণ করবে, তবু জাত খোয়াবে না।

৯ ফেব্রুয়ারী হিয়ারসে সব সিপাহীদের প্যারেডে ডেকে বোঝালেন কোন মতেই তাদের ধর্ম নষ্ট করা হবে না। কিন্তু সে কথায় কে কর্ণপাত করে! ইতিমধ্যে ২৭ ফেব্রুয়ারী বহরমপুরে সিপাহীরা বিদ্রোহ করে, যদিও সেখানে কোন হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেনি এই সংবাদে বারাকপুরে সিপাহীদের মধ্যে উত্তেজনা চাপা থাকল না। ১৯ নং বাহিনীকে ভেঙ্গে দেওয়া হবে ঠিক হলেও বিদ্রোহীদের বারাকপুরের দিকে মার্চ করার জন্য হুকুম করা হল। এখানকার সিপাহীরা ২১নং এ ঘটনা জানল এবং আরো জানল যে, বিদ্রোহীদের শাস্তি দেবার জন্য এক রেজিমেন্ট গোরা সৈন্য আনা হয়েছে, তখন তাদের বিশ্বাস দৃঢ় হল সরকার বল প্রদর্শন করেই টোটা ব্যবহার করতে বাধ্য করবে। একটা আতঙ্ক ক্রমশঃ ছড়াতে লাগল, আর মুখে মুখে ঘুরতে লাগল একটা কথা 'Gora log aya' the Europeans have come'.

২৯ মার্চ ১৮৫৭ মঙ্গল পাণ্ডে প্যারেড গ্রাউণ্ডে দাঁড়িয়ে অন্য সিপাহীদের গোরাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার জন্য চিৎকার করে ডাকছে। অন্য সিপাহীরা চুপচাপ। সার্জেন্ট মেজর হিউসন জমাদার ঈশ্বর পাণ্ডেকে হুকুম করল বিদ্রোহী সিপাহীকে বন্দী করার জন্য। জমাদার সে হুকুম তালিম করল না। কামানের পাশে লুকিয়ে মঙ্গল পাণ্ডে হিউসনের দিকে গুলি ছুঁড়ল। সেদিনের কত বড় সাংঘাতিক ঘটনা! এই বারাকপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে শ্বেতাঙ্গদের রাজত্বে একজন শ্বেতাঙ্গ মেজরের উপর প্রথম গুলি চালনার স্পর্ধা দেখাল মঙ্গল পাণ্ডে। গুলি হিউসনের গায়ে লাগেনি। সে মাটিতে পড়ে গেল। এরই মধ্যে হাজির হল লেফ্‌টেনান্ট ব। মঙ্গল পাণ্ডে তাঁকে লক্ষ্য করে

দ্বিতীয় গুলি ছুঁড়ল। ব ঘোড়াসমেত মাটিতে পড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার উঠে দাঁড়িয়েই কোমর থেকে তরবারি উঁচিয়ে ধরলেন। মঙ্গল পাণ্ডেও তরবারি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল ব-এর উপর। হিউসনও তরবারি নিয়ে ছুটে এল। সিপাহীরা চুপচাপ। কোন আদেশ বা আবেদনে তারা সাড়া দিল না। শেষে এক মুসলমান আর্দালি শেখ pithu দুই সাহেবকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল। মঙ্গল পাণ্ডে কিন্তু আবার কামানের পাশে পজিশন করে নিল।

এর মধ্যে জেনারেল হিয়ারসে এসে পড়েছে। তার সঙ্গে দুই ছেলে আর মেজর রস। সে জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডেকে আদেশ করল বিদ্রোহীকে ধরতে। জমাদার বলল, 'ওর বন্দুকে গুলি আছে, আমাদের গুলি করবে।' হিয়ারসে আবার হুকুম দিয়ে নিজেই বিদ্রোহীর দিকে এগিয়ে গেল। তার ছেলে বলল, 'বাবা লোকটা তোমার দিকে তাক করেছে'। হিয়ারসে জানাল, ''If I fall, John rush upon him and put him to death.'' মঙ্গল পাণ্ডে শেষ পর্যন্ত বেগতিক বুঝে মাস্কেটের নল নিজের বুকে ঠেকিয়ে ঘোড়া টিপল। আত্মহত্যা হল না। জখম হয়ে পড়ে গেল। তার গায়ের আগুন নিভিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। কোর্টমার্শালের রায়ে দেওয়া হল দণ্ডাদেশ — ''to suffer death by being hanged by the neck until he be dead.'' ৮ এপ্রিল ভোরবেলায় মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসী হয়ে গেল। ক'দিন বাদে ঈশ্বরী পাণ্ডেরও হল ফাঁসী। ৩৪ নং রেজিমেন্ট ভেঙ্গে দেওয়া হল।

মঙ্গল পাণ্ডে কোন ধর্ম যুদ্ধের নায়ক নন। তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থা এই বিদ্রোহের জন্য দায়ী। ঠিক কথা, মঙ্গল পাণ্ডের ডাকে কেউ সাড়া দেয়নি, তার মানে এই নয় তাদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল না। পদাতিক বাহিনীর একজন সিপাহী মাসে বেতন পেত সাত টাকা আর অশ্বারোহী বাহিনীর একজন সওয়ার পেত মাসে সাতাশ টাকা। সেই টাকাতে নিজের উর্দি, ঘোড়া প্রতিপালনের খরচও চালাতে হত। শুধু কি তাই, ''বিশ্বস্ততার সঙ্গে ত্রিশ বছর কাজ করার পর সে যে পদমর্যাদাই পাক না কেন, ইংলন্ড থেকে সদ্য আসা সবচেয়ে নিম্নপদস্থ সেনাপতির উদ্ধত হুকুম তাকে মেনে চলতে হবে।'' সুতরাং সিপাহীদের মধ্যে বঞ্চনা যে ছিল তাতো স্পষ্ট। কিন্তু তবুও সবাই এই বিদ্রোহে সামিল হতে পারেনি। সবাইতো সমাজটাকে ধাক্কা দিতে পারে না। কেউ পারে কেউ পারে না, যারা পারে ইতিহাস তাদের আলিঙ্গন করে রাখে।

মঙ্গল পাণ্ডে কি তার ঐতিহাসিক মূল্য পেয়েছে? বিদ্রোহের সময়ই পেয়েছে বিদ্রূপ। একালে যখন দেখি মঙ্গল পাণ্ডের মৃত্যু দিন নীরবে চলে যায়, কোন দৈনিক সংবাদপত্র একটা লাইনও তার নামে উৎসর্গ করে না, তখন মনে হয় ইতিহাসের একি নির্মম পরিহাস! অতীত আর বর্তমানের মধ্যে একি সমঝোতা!

■ সিপাহী বিদ্রোহ এবং তৎকালীন সাময়িক পত্র (সংগৃহীত)

সংবাদ প্রভাকর

সংবাদ। ১৪.২.১২৬৪/২৬.৫.১৮৫৭

"সংপ্রতি এতদ্দেশীয় সিপাহি সেনা দ্বারা যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে তাহার নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের প্রতি ভক্তি ও অভিপ্রায় প্রকাশের জন্য এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা গত দিবস হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজে যে সভা করিয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, শ্রীযুত রায় হরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি অনেকানেক মহাশয়েরা উপস্থিত হইয়াছিলেন, শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সকল অবধারিত হয়, অন্যান্য বিবরণ সকল অবধারিত হয়, অন্যান্য বিবরণ সকল আগামিতে প্রকাশ করিব অদ্য স্থানাভাব হইল।

১) এই সভা শ্রবণ করত অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন যে এতদ্দেশীয় কয়েকদল পদাতিক সৈন্য গবর্ণমেন্টের বিরোধি হইয়া স্থানে স্থানে অত্যাচার করণে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং তাহারদিগের এই অসচ্চরিত্র এবং ব্যবহার জন্য সভার ঘৃণা ও ভয়।

২) এতদ্রাজ্যের প্রজামণ্ডলী সিপাহিদিগের এই সমস্ত অত্যাচারের প্রতি কোনরূপ সহায়তা না করাতে গবর্ণমেন্টের প্রতি তাহারদিগের অত্যন্ত ভক্তি হইয়াছে তজ্জন্য এই সভা অত্যন্ত পুলকিত এবং আনন্দিত হইয়াছেন, যেহেতু তাঁহারা একাল পর্যন্ত যে প্রকার রাজভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এতদ্বারা তাহা আরো সংপূর্ণরূপেই প্রকাশ পাইয়াছে।

৩) কতিপয় সিপাহি সেনা দুর্জ্জনগণের কুপরামর্শে ও মিথ্যা ভয় প্রদর্শন দ্বারা যে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছে, তজ্জন্য এই সভা সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছে, যেহেতু এই ভ্রমের কোন কারণ নেই।

৪) এই বিদ্রোহ সময়ে দেশের শান্তিরক্ষা নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের প্রতি যদ্যপি কোনপ্রকার সাহায্য প্রদান করিতে হয় তবে এই সভা এরূপ অবধার্য্য করিতেছেন যে মহারানীর এতদ্দেশীয় সমুদয় প্রজা তজ্জন্য প্রাণপণে সাহায্য করা আপনারদিগের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য বোধ করিবেন।

৫) এই সভার বিবরণ সর্ব্ব সাধারণের বিদিতার্থ এতদ্দেশীয় প্রচলিত ভাষায় অনুবাদিত হইয়া সর্বত্র প্রেরণ করা হয়।

৬) এই সভার বিবরণের এক অনুলিপি সভাপতি মহাশয় স্বাক্ষর পূর্বক ভারতবর্ষের শ্রীযুত অনরবিল গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের সমীপে প্রেরণ করা হয়।"

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত । ৭.৩.১২৬৪ / ২০.৬.১৮৫৭

"কয়েকদল অধার্ম্মিক অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হিতাহিত বিবেচনা—বিহীন এতদ্দেশীয় সেনা অধার্ম্মিকতা প্রকাশপূর্ব্বক রাজবিদ্রোহী হওয়াতে রাজ্যবাসী শান্ত স্বভাব অধন সধন প্রজামাত্রেই দিবারাত্র জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন, "এই দণ্ডেই হিন্দুস্থানে পূর্ব্ববৎ শান্তি সংস্থাপিত হউক, রাজ্যের সমুদয় বিঘ্ন বিনাশ হউক। হে বিঘ্নহর! তুমি সমুদয় বিঘ্ন হর, সকল উপদ্রব নিবারণ কর, প্রজা বৎসল সুধার্ম্মিক সুবিচারক ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের জয় পতাকা চিরকাল সমভাবে উড্ডীয়মান কর। অত্যাচারি অপকারি বিদ্রোহকারি দুর্জ্জনদিগকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান কর — যাহারা গোপনে গোপনে অথবা প্রকাশ্যরূপে এই বিষমতর অনিষ্ট ঘটনার ঘটক হইয়া উল্লেখিত জ্ঞানান্ধ সেনাগণকে কুচক্রের দ্বারা কুপরামর্শ প্রদান করিয়াছে ও করিতেছেন তাহারদিগ্যে দণ্ডদান কর। তাহারা অবিলম্বেই আপনাপন অপরাধ—বৃক্ষের ফলভোগ করুক।"

".... ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের অধীনতায় অধুনা দুর্ব্বল ভীরু বাঙালি ব্যূহ যেরূপ সুখসচ্ছন্দতা সম্ভোগপূর্ব্বক সানন্দে বাস করিতেছেন, কস্মিন্‌কালে তদ্রূপ হয় নাই, রামরাজ্য আর কাহাকে বলে? এই রাজ্যইতো রাম রাজ্যের ন্যায় সুখের রাজ্য হইয়াছে, আমরা যথার্থরূপ স্বাধীনতা সহযোগে পদ, মান, বিদ্যা এবং ধর্ম, কর্ম্মাদি সকল প্রকার সাংসারিক সুখে সুখি হইয়াছি; কোন বিষয়েই ক্লেশের লেশমাত্র জানিতে পারি না, জননীর নিকট পুত্রেরা লালিত ও পালিত হইয়া যদ্রূপ উৎসাহে ও সাহসে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া অন্তঃকরণকে কৃতার্থ করেন আমরাও অবিকল সেইরূপ পৃথিবীশ্বরী ইংলন্ডেশ্বরী জননীর নিকটে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালিত হইয়া সর্ব্বমতে চরিতার্থ হইতেছি।

"........ হে বঙ্গদেশীয় মহাশয়গণ। আমরা আর অধিক কি নিবেদন করিব? সুযোগ্য পরমবিজ্ঞ অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞ বিচারদক্ষ সর্ব্বাধ্যক্ষ গবর্ণর জেনারেল শ্রীযুত লর্ড কেনিং বাহাদুর তোমারদিগের অকপট প্রভুভক্তিতা, কৃতজ্ঞতা, সুশীলতা, মনের অখলতা, নির্ম্মলতা এবং সচ্চরিত্রতার বিষয় বিশিষ্টরূপেই অবগত হইয়াছেন, কারণ বাঙালি জাতি কাঙালি অপেক্ষাও দুর্ব্বল অত্যন্ত ভীত সাহসহীন, মাছ, ভাত খাইয়া শরীর ধারণ করে, অস্ত্রের নাম শুনিলেই কাঁপিতে থাকে, যাহারা আপনারা আপনার দিগের শরীর রক্ষা করিতে পারে না তাহারা কি আবার কস্মিনকালে অরির-ভাব ধারণ করিয়া প্রবলতা প্রকাশ করিতে পারে? যে পর্য্যন্ত এদেশে ইংরাজের প্রভুত্ব হইয়াছে সেই পর্য্যন্ত তোমরা প্রভুভক্তরূপে বিখ্যাত হইয়া আসিতেছে, এই মহদ্‌গুণের প্রভাবে উপযুক্ত মত রাজানুগ্রহ ও প্রসাদ লাভ করিতেছে, এই কৃতজ্ঞতা ধর্ম্ম জন্য ধর্ম্ম তোমারদিগের ক্রমেই মঙ্গল করিবেন। এবং লর্ড বাহাদুর অপ্রসন্ন হইয়া যথাযোগ্য কৃপা বিতরণে কখনই কৃপণতা করিবেন না, তিনি প্রসন্ন হইয়া ভবিষ্যতে অধিক দয়া বিতরণ করিবেন।

..... পিপীড়া আপনার মৃত্যুর নিমিত্তই পক্ষ ধারণ করে। অশ্বতরী আপনার নাশের নিমিত্তই গর্ভ ধারণ করে, কেশে ঘাস নিজে সংহার পাইবার জন্যই পুষ্প ধারণ করে। অধুনা সিপাহিদিগের সমর সজ্জা আপনার দিগের নিপাতের নিমিত্ত সেইরূপ হইয়াছে তাহাতে সংশয় কিঃ যে অবোধ পর্ব্বতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে সে ব্যক্তি সেই লোষ্ট্রাঘাতে আপনিই নিহত হয়। যদি তৃণের বাতাসে পর্ব্বতকে চঞ্চল করিতে পারিত, যদি চটক পক্ষি চঞ্চু দ্বারা সমুদ্রকে শোষন করিতে পারিত, যদি মেশ শাবক শৃঙ্গাঘাতে পৃথিবীকে রসাতল দিতে পারিত, তবে একদিন সিপাহিদিগের যুদ্ধানুষ্ঠানে আমরা ভয় করিতে পারিতাম, ইহাতে ভয়ের বিষয় কি আছে?

.... হে বাঙালি মহাশয়েরা। এ বিষয়ে আপনারদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে না, অস্ত্র ধরিতে হইবে না, আপনারা সকলে একান্তচিত্তে কেবল রাজপুরুষগণের মঙ্গলার্থ স্বস্ত্যয়ণ করুন। পরম পরাৎপর পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করুন, সকল প্রকারে মহারাণীর জয় হউক, শুভ হউক, লর্ড বাহাদুরের অভিলাষিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া সর্ব্বতোভাবে সুখী হউন। বিদ্রোহানল এখনি নির্ব্বাণ হউক।"

সিপাহী বিদ্রোহকে নিয়ে 'সংবাদ প্রভাকর'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত বিদ্রূপাত্মক ছড়া। ৭.৩.১২৬৪। ২০.৬.১৮৫৭

"জয়জয় জগদীশ, জগতের সার।
লহ লহ লহ নাথ, প্রণাম আমার।।
করি এই নিবেদন, দীন দয়াময়।
বাঞ্ছাফল পূর্ণ কর, হয়ে বাঞ্ছাময়।।
চিরকাল হয় যেন, ব্রিটিসের জয়।
ব্রিটিসের রাজলক্ষ্মী, স্থির যেন রয়।।
এমন সুখের রাজ্য, আর নাকি হয়।
শাস্ত্র মতে এই রাজ্য, রামরাজ্য কয়।।
*　　*　　*　　*
বিদ্রোহি সেফাইগণ, করি নিবেদন।
ছাড় দ্বেষ রনবেশ, কর সম্বরণ।।
এতদিন অধীনতা করিয়া স্বীকার।
কৃতজ্ঞতা মহাধর্ম্ম, করেছ প্রচার।।
ব্রিটিস সমর শিক্ষা, শিখে সমুদয়।

বাহুবলে কত দেশে, করিয়াছ জয়।।
কতবার পুরস্কার, পাইয়াছ তার।
গলেতে পদক আছে, চিহ্ন সবাকার।।
এখন তোমরা কার, কুচক্রেতে ভুলে।
করিতেছ অত্যাচার, রাজ প্রতিকূলে?।।
*   *   *   *
কার কথা শুনে সবে, সেজেছ সমরে?
পিপীড়ার পাখা উঠে, মরিবার তরে।।
এখনই ছেড়ে দেও, মিছে ছেলে খেলা।
আকাশের উপরেতে, কেন মারো ঢেলা।।
*   *   *   *
যে সব "সেফাই" আছে ব্রিটিসের বশ।
একমুখে কি কহিব, তোমাদের যশ।।
ভূপতির প্রিয় হোয়ে, প্রিয় ব্যবহারে।
পুরস্কার পাবে তার, গুণ অনুসারে।।"

সম্বাদ ভাস্কর

সম্পাদকীয়। ২৪ জানুয়ারি ১৮৫৭

"........হিন্দু সিপাহিরা কহে ইংরাজেরা কৌশলক্রমে তাহারদিগকে খ্রীষ্টিয়ান করিতে বসিয়াছেন, তাহারা ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারিবেক না, কাগজমণ্ডিত যে টোটার মধ্যে গুলিবারুদ থাকিত সিপাহিরা হস্ত দ্বারা তাহার মুখ খুলিয়া বন্দুকে গুলি বারুদ পরিপূর্ণ করিত এইক্ষণে সেনাপতিরা কহেন হস্ত দ্বারা কৌটার মুখ খুলিয়া বন্দুকে গুলি বারুদ পুরিতে অধিক বিলম্ব হয়, দুই হস্ত সংযুক্ত না করিলে সে কর্ম্ম সম্পন্ন করা যায় না অতএব দন্ত দ্বারা কৌটার মুখ ছিঁড়িয়া বন্দুকে গুলি বারুদ পুরিতে হইবেক, সিপাহিরা কহে কৌটার ভিতর চর্ব্বি থাকে, দন্ত দ্বারা কাগজ কাটিতে হইলে তাহারদিগের জাতি নাশ হইবেক, প্রথমতঃ দমদমাস্থ সিপাহিরা এই আপত্তি করিয়াছিল ইহাতে সেনাপতিরা উত্তর করিলেন "দানাপুরের সিপাহিরা এইরূপ করিতেছে তোমরা কেন করিবা না? ইহাতে দমদমাস্থ সিপাহিরা দানাপুরস্থ সৈন্যশিবিরে পত্র লিখিয়াছিলেন, দানাপুরীয়েরা উত্তর লিখিল "আমরা ইহা স্বীকার করি নাই এবং প্রানান্তেও করিব না।" দানাপুর শিবির হইতে এই উত্তর আসিলে চানকাদি স্থানীয় সৈন্য শিবিরে সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়িল ইহাতেই প্রায় সর্ব্বস্থানীয় হিন্দু সিপাহীরা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে আর ইংরাজদিগের অধীনে যুদ্ধ করিবেক না,......"

সম্বাদ ভাস্কর

সংবাদ। ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭ বারাকপুর

"উক্ত স্থানীয় হিন্দু সিপাহিরা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের স্বজাতীয় বাহিনীদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া পরামর্শ করিয়াছে তাহারা প্রাণান্তেও ব্রিটিসাজ্ঞায় কর্ম করিবেক না, গবর্ণমেন্ট এতৎ সম্বাদ শ্রবণে অত্যন্ত ভাবিত হইয়াছেন এবং ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের কয়েকজন মান্য সাহেবকেও বারাকপুরের সিপাহিদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহারা বাহিনী সদনে গিয়া কৌশল ক্রমে তাহারদিগের মনোমালিন্য দূরীকরণ করিবেন, আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছিলাম গবর্ণমেন্ট গৃহ বিচ্ছেদ নিবারণে মনোযোগী হউন কিন্তু ইংরাজ রাজ তখন তাহা শুনেন নাই, এইক্ষণে বিপদে ঠেকিয়া বাহিনীদিগের তোষামোদপূর্ব্বক গৃহবিচ্ছেদ উচ্ছেদ নিমিত্ত চেষ্টা পাইতে হইতেছে, পরমেশ্বর রাজপুরুষদিগের চেষ্টা সফল করুন"।

সম্বাদ ভাস্কর। ২০.৬.১৮৫৭

"........ বৃটিস বিধৃত ভারতবর্ষবাসী প্রজাসকল নির্ভয় হও, 'ছেলেধরা' একটা কথামাত্র শুনিয়াছিলে, সিপাহীধরা প্রত্যক্ষ কর, গত বুধবার গঙ্গাতীরে বহুলোক দণ্ডায়মান ছিলেন তাঁহারা দেখিয়াছেন হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ী, পাঁচশত সিপাহী ধৃত হইয়া আসিয়াছে, কলিকাতাবাসীদিগের আর ভয় নাই, যে সকল বিদ্রোহীরা দিল্লী প্রদেশে শিবির স্থাপন করিয়াছিল তাহারা দুইবার হাজির হইয়া গাজীউদ্দিন স্থানে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল, রাজসৈন্যরা তাহাদিগকে কচুকাটা করিয়াছে। অবশিষ্টেরা রণে পলায়নপর হইয়াছে।"

সংবাদ প্রভাকর, সম্বাদ ভাস্কর ছাড়াও সেই সময়কার হরিশ মুখার্জীর 'হিন্দু পেট্রিয়ট', শ্যামানন্দ সেনের 'সমাচার সুধাবর্ষণ' সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন না করার পাশাপাশি রাজশক্তির জয়গান গেয়েছে অকপটে।

লেখক পরিচিতি ঃ অধ্যাপক

ঋণ স্বীকার ঃ সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১ম খণ্ড)—বিনয় ঘোষ

‘মঙ্গলপাণ্ডের প্রেতাত্মা যেন ভাসতে লাগলো’

(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়’র ‘সেই সময়’ উপন্যাস থেকে সংগৃহীত)

মঙ্গলপাণ্ডের মৃত্যুর পর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়’র লেখণীতে তা সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে।

“মঙ্গলপাণ্ডের প্রেতাত্মা যেন ভাসতে লাগলো বারাকপুর সেনানিবাসের বাতাসে। চৌত্রিশ নং ইনফ্যানট্রির সিপাহীদের সকলেই নিরস্ত্র করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে উত্তর ভারতে। বাকী সিপাহীদের মুখগুলিও যেন থমথমে মনে হয়। যদিও তারা সকলেই সমবেতভাবে নতুন করে আনুগত্যের শপথ নিয়েছে। তবু ইংরেজ অফিসাররা তাদের মুখের দিকে যখন তখন ভ্রু-কুঞ্চিত করেন। অদ্ভুত এই এসিয়াটিকদের মুখ। এমন ভাবলেশহীন যে কিছুতেই মনের কথা টের পাওয়া যায় না। অফিসারদের কোয়ার্টারে অতি বিশ্বস্ত আর্দালি, সহিস ও বাবুর্চিদের যেন আর তেমন বিশ্বস্ত মনে হয় না এখন। এতদিন পর মনে হয়, ওদের প্রত্যেকের মুখের সঙ্গেই মঙ্গল পাণ্ডের মুখের যেন কিছুটা মিল আছে। ওরা কি গোপনে নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করে?

এই ঘটনা গোপন রইলো না, ব্যারাকপুর থেকে ক্রমে কলকাতাতেও ছড়ালো। মঙ্গল পাণ্ডেকে সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ঈশ্বরী পাণ্ডের ফাঁসী কার্যকর করতে কয়েকদিন দেরি হলো। ফাঁসীর হুকুম দেবার এক্তিয়ার ঠিক কার, তাই নিয়ে একটা প্রশ্ন দেখা দিল। আর যত দেরি হয়, ততই গল্প ছড়ায়। কলকাতায় বসে এই সংবাদ জেনে বিরক্ত হলেন গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং। কঠিন শাস্তি যদি দিতেই হয়, তবে তা অতি দ্রুত সমাধা করাই উচিত। বিলম্ব হলে দুর্বলতাই প্রকাশ পায়। দেশী লোকেদের সব সময় বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, ইংরেজ শাসনে কোনো প্রকার অস্থিরচিত্ততা বা সংশয়ের স্থান নেই।

খবরটি প্রথম সীমাবদ্ধ রইলো কলকাতার ইংরেজদের মধ্যে। সুখী, বিলাসী ইংরেজ সমাজে গোপন মৃদু ত্রাসের স্রোত প্রবাহিত হয়ে যায়। কেউ সহজে মুখে কিছু বলে না, কিন্তু চোখে চোখে কথা হয়। সত্যি একজন দেশী সিপাহী ইংরেজ সেনানায়কদের হত্যা করার জন্য গুলি ছুঁড়েছিল? মনুষ্যাধম এই জাতির কোনো একজনের এমন সাহস হয়? অন্য সিপাহীরা নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তারা ভয়ে

কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করেনি? একশো বছর আগে বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লা আক্রমণ করেছিল কলকাতা, তখন সব ইংরেজকেই এই শহর ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। ঠিক একশো বছর আগে।

ক্রমে এই গোপন ত্রাস আর শুধু মনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, কানাকানি হয়। হিন্দুস্থানে, কোম্পানিদের রাজ্যসীমা বড় বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। এত বড় রাজ্য শাসনের জন্য দেশী সিপাহী নিয়ে সৈন্য গড়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু কতখানি বিশ্বাস করা যায় তাদের? মঙ্গল পাণ্ডে হয়ে গেল এক বিভীষিকার প্রতীক। মঙ্গল বাদ দিয়ে শুধু পাণ্ডে , তাও ইংরেজরা পাণ্ডে ঠিক মতন উচ্চারণ করতে পারে না। হলো পাণ্ডি। এই পাণ্ডির মতন দুশমন ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে কতজন আছে? যদি সহস্র সহস্র হয়?

মঙ্গল পাণ্ডের ঘটনার পর কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে, ঈশ্বরী পাণ্ডেরও ফাঁসী হয়ে গেছে, তারপর আর কোনো রকম গোলযোগ দেখা যায়নি। তবু ঘটনাটি ভোলা গেল না। রাজধানী কলকাতার সুরক্ষার জন্য জোরদার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত নয়? ইংরেজ সমাজের অনেকের মধ্যেই এ কথা গুঞ্জরিত হতে লাগলো।

খবরটি কিছুদিনের মধ্যে বাঙালীদের মধ্যেও ছড়ালো। প্রতিক্রিয়া হলো মিশ্র ধরনের। কারুর কাছে ঘটনাটি অত্যন্ত বিস্ময়কর, কারুর কাছে এমন কিছুই না। মঙ্গল পাণ্ডে কী তীব্র নেশাগ্রস্ত কিংবা উন্মাদ ছিল? একমাত্র কোনো বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তির পক্ষেই এমন নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া সম্ভব। কিন্তু বাকি সিপাহীরাও নীরব এবং নিষ্ক্রিয় ছিল কেন? মঙ্গল পাণ্ডে ব্যর্থ হলেও এর পেছনে কোনো পরিকল্পনা ছিল কি?

একটি তথ্য অবশ্য বেশ মনে দাগ কাটলো বাঙালী সমাজে। পলাশী যুদ্ধের পর ঠিক একশো বছর কেটেছে। এ কথা ইংরেজরাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। ঠিক একশো বছর, এর কি কোনো গূঢ় মর্ম আছে? ঠিক একশো বছর পার হয়ে আবার কোনো গুরুতর ঘটনা ঘটবে?''

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ

Marx এবং Engels

মার্কস্ এবং এঙ্গেল্স্ ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকে 'প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ' বলেছেন। বারাকপুরের বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁরা লিখেছেন—"The revolt of the Bengal army being, beyond doubt, intimately connected with the Persian and Chinese wars.

The alleged cause of the dissatisfaction which began to spread four months ago in the Bengal army was the apprehension on the part of the natives lest the government should interfere with their religion. The serving out of cartridges, the paper of which was said to have been greased with the fat of bullocks and pigs, and the compulsory biting of which was, therefore, considered by the natives as an infringement of their religious prescriptions, gave the signal for local disturbances. On the 22d of January an incendiary fire broke out in cantonments a shorts distance from Calcutta. On the 25th of February the 19th Native Regiment mutinied at Berhampore, the men objecting to the cartridges served out to them. On the 31st of March that regiment was disbanded at the end of March the 34th Sepoy Regiment, stationed at Barrackpore, allowed one of its men to advance with a loaded musket upon the parade-ground in front of the line and, after having called his comrades to mutiny, he was permitted to attack and wound the Adjutant and SergeantMajor of his regiment. During the hand-to-hand conflict, that ensued, hundreds of sepoys looked passively on while others participated in the struggle, and attacked the officers with the butt ends of their muskets. Subsequently that regiment was also disbanded."

'The first war of Independence' (1853-59) – Marx and Engels—থেকে সংকলিত।

'সিপাহী বিদ্রোহ হল হাইজাম্প'

জহর সেন

"কখনও হাঁটি হাঁটি পা পা, কখনও দৌড়, কখনও হাইজাম্প, কখনও লঙ্‌জাম্প, নানাভাবে সমাজে পরিবর্তন আসে। ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব, ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব এবং ১৯৪৯ সালের চিন বিপ্লব, এগুলি হলো সমাজের লঙ্‌জাম্প। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ হলো হাইজাম্প। বহরমপুরে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে ২৬ ফেব্রুয়ারী, বারাকপুরে ঘটে ২৯ মার্চ। ৮ এপ্রিল মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি হয়। কালক্রমে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল দিল্লি, কানপুর অযোধ্যা, বিহার, ঝাঁসী, রাজপুতানা, মধ্যভারত, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে। ১৮৫৭ সালের ১০ মে মীরাটে সেনাবাহিনী ঘোষণা করে, "দিল্লী চলো"। এই তারিখ থেকেই সিপাহী বিদ্রোহ হয় রাজনৈতিক তাৎপর্যমণ্ডিত।

বর্তমান কালের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিদ্রোহের দুটি বৈশিষ্ট্য স্মরণীয়। প্রথমত, সে-সময় ধর্ম সাম্প্রদায়িকতা এতটুকুও ছিল না। সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর পরম্পরা ছিল দৃঢ়মূল। নিঃসন্দেহে বলা যায়, ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে ধর্ম সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে হিন্দু মুসলমান সমস্যা ভারতবর্ষে ছিল না। এমনকি সিপাহী বিদ্রোহের সময়েও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একটি নজিরও কোথাও মেলেনি, তৎকালীন ইংরেজ প্রশাসনের শত প্ররোচনা ও চেষ্টা সত্ত্বেও। নানাসাহেবের পাশে ছিলেন আজিমুল্লা খাঁ, ঝাঁসীর রাণীর ছিল আফগান অনুচর এবং বাহাদুর খাঁর সহচর ছিলেন শোভারাম।

দ্বিতীয় স্মরণীয় বিষয় হলো, হিন্দু মুসলমান সবাই মেনে নিয়েছিল বাহাদুর শাহ-ই ভারতবর্ষের সম্রাট। মনে রাখতে হবে, বিদ্রোহের প্রথম দিকে বিদ্রোহী সেনাদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু। মোগল-মারাঠা লড়াই ইতিহাসে সুবিদিত। কিন্তু পেশোয়া নানাসাহেব দিল্লীর বাহাদুর শাহকেই ভারতবর্ষের সম্রাট বলে মেনে নিয়েছিলেন। নানাসাহেবের মুদ্রায় বাহাদুর শাহের নাম অঙ্কিত ছিল। তাঁর আদেশ বাহাদুর শাহের নামেই প্রচারিত হয়েছিল। হিজরী ও সম্বৎ ছিল একত্রে পাশাপাশি মুদ্রিত। হতে পারে, বাহাদুর শাহ দুর্বল, পঙ্গু ও ব্যক্তিত্বহীন। কিন্তু তিনি ছিলেন বাবর ও আকবরের বংশধর। বাবর বিদেশী নন, ভারতীয়। তাঁদের শেষ বংশধর বাহাদুর শাহও বিদেশী নন, ভারতীয়। সিপাহী বিদ্রোহের এই উত্তরাধিকার আমাদের চেতনাকে পুষ্ট করেছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে দেশ জুড়ে ছড়িয়েছিল আতঙ্ক। বিনা বিচারে বন্দী ছিল শত সহস্র মানুষ। সরকারি জিঘাংসা ছিল মাত্রাধিক। রাজশক্তি ছিল নির্মম, নিষ্ঠুর। মঙ্গল পাণ্ডে প্রাণ দিলেন স্ব-ধর্ম রক্ষার জন্য। তিনি ছিলেন জীবন্ত

সমাজশক্তির প্রতীক।.....”

সিপাহী বিদ্রোহের শতবর্ষ আগে ঘটেছিল পলাশীর ষড়যন্ত্র। এ কাহিনী সুপরিচিত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরেও জুড়িয়ে আছে রাষ্ট্র ও সমাজের বিপর্যয়ের কাহিনী। কবি নবীন সেনের ‘পলাশীর যুদ্ধ’ মহাকাব্যে বর্ণিত হয়েছে সমাজপতিদের ষড়যন্ত্র। রায়দুর্লভ, মীরজাফর, জগত শেঠ, রাজবল্লভ ও কৃষ্ণচন্দ্র রায়। কিন্তু পাঁচজনের আড়ালে বসেছিলেন একজন। তিনি রাণী ভবাণী। নবীন সেনের ভাষায়,

“একটি রমণীমূর্তি বসিয়া নীরবে,/গৌরাঙ্গিনী, দীর্ঘগ্রীবা, আকর্ণ নয়ন,—/শুকতারা শোভে যেন/আকাশের পটে,/শোভিছে উজলি জ্ঞান গর্বিত বদন।”

রাণী ভবাণীর বক্তব্য ছিল, নবীন সেনের ভাষায়,

“আমার কি মত? তবে শোন মহারাজ
অসহ্য দাসত্ব যদি, নিষ্কোশিয়া অসি
সাজিয়া সমর সাজে নৃপতি সমাজ
প্রবেশ সম্মুখ রণে।”

তখন রাষ্ট্রব্যবস্থা বিপর্যস্ত। রাজনীতি কালিমালিপ্ত। সমাজ ভগ্নপ্রায়। কিন্তু দানের মহিমায় ও হৃদয়ের প্রসারতায় দুটি নাম জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে তখন বাংলার ইতিহাসে। হাজী মহম্মদ মহসীন এবং রাণী ভবাণী। তাঁরা ছিলেন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরম্পরার প্রতীক। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানাতে সংরক্ষিত দলিলপত্রের মধ্যে একজন গবেষক রাণী ভবানীর সাহায্যপুষ্ট পশ্চিমবঙ্গের একটি সুদীর্ঘ তালিকা পেয়েছেন। সৈদাবাদ নিবাসী সদাশিব ভট্টাচার্য শাস্ত্র ব্যাখ্যাকার হিসাবে পুরুষানুক্রমে রাণী ভবাণীর বৃত্তি পেয়েছেন। বড়নগর অঞ্চলে যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম হলো ঃ মহাদেব ন্যায়বাগীশ, শ্রীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত (১৭৬৯), কৃষ্ণজীবন ন্যায়লঙ্কার (১৭৭৬), রামসুন্দর তর্কবাগীশ (১৭৯২), রূপেশ্বর শর্মা (১৭৬২-১৭৯৩), সদানন্দ বিদ্যালঙ্কার, শিবচন্দ্র শর্মা, (১৭৬২-১৭৯৩), সদানন্দ বিদ্যালঙ্কার, শিবচন্দ্র শর্মা, জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন্দ, হরিরাম চক্রবর্তী, রত্নেশ্বর তর্কবাগীশ (১৭৫৪) এবং রামকান্ত সার্বভৌম (১৭৯২)। সৃজনধর্মী সমাজশক্তির অম্লান প্রতীক ছিল প্রায় শতাধিক বৈষ্ণব আখড়া। এগুলিও রাণী ভবাণীর বদান্যতা থেকে বঞ্চিত হয়নি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অবশ্য বংশানুক্রমিক বৃত্তি বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছিল। আমার বক্তব্য হলো, রাজশক্তি যখন উদাসীন বা বিরূপ বা বিধ্বংসী, এদেশে সমাজশক্তি তখন ছিল সক্রিয় এবং সৃজনশীল।”

[কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং গবেষক জহর সেন পত্রিকা সম্পাদকের অনুরোধে একটি দীর্ঘ তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন। সেখান থেকে বর্তমান প্রসঙ্গের জন্য কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল।]

দেবীপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

—— ভূধর চন্দ্র ভট্টাচার্য

এখন হইতে প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশের স্থান বিশেষে পলাশী প্রাঙ্গণে "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্ব্বরী রাজদণ্ড রূপে।" ইংরাজ বণিক বাঙ্গালাদেশের অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এমনই সুলভে এত দুর্লভ রাজ্য হস্তগত করিয়া ইংরাজ উচ্চকিত হইয়া বেশ কিছুকাল রাজশক্তি পরিচালনায় তৎপর হয়েন নাই। কলিকাতা তাহাদের শক্তিকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইল।

নদীর তটে কলিকাতা নগরী। অনুতট উজান যাইতে যাইতে ইংরাজ একটি গ্রামকে মনোহারিত্বে দ্বিতীয় স্থান দিলেন। সেইকালে ইংরাজ জাতি ভারতীয়দের সহিত সৌহার্দ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভাবতীয়গণের সহিত ব্যবসায়, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সহযোগিতা করিতেন। ক্রমশঃ বারাকপুরে একটি ইংরাজ সেনানিবাস গঠিত ও কলিকাতা নগরীতে একটি দুর্গ নির্মিত হইল।

বারাকপুর রাজশক্তির স্পর্শ পাইয়া দিনে দিনে ঋদ্ধিমান হইতে লাগিল। যে সকল ইংরাজ বারাকপুরের সেনানিবাস সংক্রান্ত ব্যাপারে থাকিতেন, তাঁহারা ভারতীয়দের সহিত প্রায় যোগাযোগ শূন্যই ছিলেন। কিন্তু বহু ইংরাজ বণিক বারাকপুরের মনোহর পরিবেশ ছাড়িতে পারিলেন না। ইহারা ভারতীয়গণের সহিত ক্রমশঃ মেলামেশা করিতে আকৃষ্ট হইলেন।

কালক্রমে বারাকপুরে শহর ইংরাজদের একটি উপনিবেশরূপে পরিণত হইল। বহু বাঙ্গালী গৃহস্থ ইংরেজদের সহিত ব্যবসা আরম্ভ করিয়া ধনে বিপুল ও মানে অতুল হইয়া উঠিলেন। এইভাবে ইংরাজ সম্প্রদায় যখন বারাকপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হইলেন তখন বহুসংখ্যক বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী ইহাদের সহিত ব্যবসা করিয়া প্রচুর অর্থ অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, এই ভারতীয়গণ কেহই ইংরাজী শিক্ষিত ছিলেন না। তাঁরা কোন প্রকারে ইঙ্গিত, ইশারায় নিজেদের মনোভাব বিনিময় করিতেন।

এইরূপ অবাঙ্গালী ব্যক্তি একজন ছিলেন, তাঁহার নাম দানবীর দেবীপ্রসাদ আগরওয়ালা। ইংরাজ বণিক এবং রাজপুরুষ উভয় সম্প্রদায়ের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। বারাকপুরবাসী ইংরাজ সম্প্রদায়, বণিক হউক বা রাজপুরুষ হউক, কেহই ভারতীয় ভাষার সহিত পরিচিত ছিলেন না, যদিও ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করিবার প্রয়োজন যে গভীর ছিল, তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিতেন। কাজেই তাঁহারা ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সাহায্যে হিন্দী বা বাংলা শিখিতে আরম্ভ

করিলেন। একজন ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী ভদ্রলোক দেবীপ্রসাদ বাবুর দোভাষী হইয়া পড়িলেন। এই ভদ্রলোক দেবীপ্রসাদবাবুকে ইংরেজের সহিত ঘনিষ্ঠতা ঘটাইয়া দিতে তৎপর হইলেন।

এই যুগে ইংরাজ সম্প্রদায় যাঁহারা ভারতে বাস করিতেছিলেন তাঁহারা ভারতীয়দিগকে অর্থে, পদে ও পদবীতে পুরস্কৃত করিবার জন্য কার্পণ্য করিতেন না। দেবীপ্রসাদবাবু ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ হইলেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়ী। স্বীয় অধ্যবসায় ফলে ব্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তাঁহার হৃদয়টি ছিল কুসুমের মত কোমল এবং পরদুঃখ কাতর।

ঐশ্বর্য্য ও পুত্র যেন সমস্থলবর্তী হয় না। দেবীপ্রসাদবাবু প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হইলেও তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। যখন দেবীবাবু একদিকে প্রাচুর্যে ও অন্যদিকে সন্তান না থাকায় অভাবের মধ্যে কাতর হইয়া আছেন তখন সেই ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালী যুবক দেবীবাবুকে যেন মন্ত্রদীক্ষা দিলেন যে তাঁহার সম্পত্তি লোকহিতে বিনিযুক্ত করাই শ্রেয়ঃ। দেবীবাবুও তাহাই গ্রহণ করিলেন।

তৎকালে বারাকপুর, মণিরামপুর গ্রামের বাঙ্গালী গৃহস্থগণকে তাহাদের পোষ্যদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হইলে দূরস্থিত বারাকপুর সরকারী বিদ্যালয়ে অথবা নবাবগঞ্জের স্কুলে পাঠাইতে হইত। যে বাঙ্গালী যুবক দেবীপ্রসাদবাবুর পরামর্শদাতা রূপে কার্য্য করিতেছিলেন তাঁহার নাম শ্রীক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য। এই ক্ষেত্রমোহন বাবুই দেবীবাবুকে পরামর্শ দিলেন তাঁহার অগাধ সম্পত্তিটি একটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠায় বিনিযুক্ত করতে। পরদুঃখ কাতর, দানবীর দেবীপ্রসাদবাবু তাঁহার উইলে এই ব্যবস্থাই করিলেন। ইহার অল্প দিন পরেই এই সদাশয় মহান ব্যক্তির পরলোক গমন ঘটে। উক্ত ক্ষেত্রমোহন বাবু তখন সেই উইলের কার্যকরীরূপে প্রয়াস করিতে লাগিলেন যে, বারাকপুর সদর বাজারে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হউক।

সেই সময় মণিরামপুর গ্রামে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাস করিতেন। তিনি 'বেঙ্গলী' নামে একখানি ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। ক্ষেত্র বাবু সুযোগ বুঝিয়া সুরেন্দ্রনাথের মনে প্রভাব ছড়াইয়া দিলেন যে, দেবীপ্রসাদ আগরওয়ালা মহাশয় বিপুল সম্পত্তি উইলে ব্যবস্থা করিয়া একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু ও ক্ষেত্রবাবু উভয়ে বহু প্রয়াস করিয়া স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তখন ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ। উক্ত ক্ষেত্রবাবু ঐ বিদ্যালয়ের প্রথম সেক্রেটারি নিযুক্ত হইলেন।

লেখক পরিচিতি ঃ অধ্যাপক (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)

সৌজন্য ঃ স্মরণিকা দেবীপ্রসাদ উচ্চবিদ্যালয় পুনর্মিলন উৎসব, ১৯৭৮

দেবীপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যালয়ে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ক্লাস শুরু হয় ১৯৮৪ সাল থেকে। বর্তমানে এই বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সম্পাদক হলেন শ্রী সমরেন্দ্র মোহন সান্যাল।

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

সুপ্রিয় মুন্সী

বারাকপুরের গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয় মহাত্মা গান্ধীর জীবন, কর্মধারা ও চিন্তার উপর গড়ে উঠা একটি জীবনীমূলক সংগ্রহালয়। ইং ১৯৬৬ সালের ৭মে তারিখে এটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। সংগ্রহালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য, গান্ধী সম্পর্কিত যাবতীয় জিনিষপত্রের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন এবং সংগ্রহালয় পদ্ধতিতে তাঁর জীবন, কর্মধারা ও চিন্তার বিশ্লেষণ, গবেষণা; ও সম্ভব হলে আরও বিকশিত করার প্রচেষ্টা করা।

সংগ্রহালয়ের বর্তমান সংগ্রহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় গান্ধীজী ও ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে বহু আলোকচিত্র (প্রায় হাজারখানেক), গান্ধীজীর লেখা কিছু অরিজিনাল চিঠি ও প্রায় আঠাশ হাজার চিঠির ফোটোকপি, তাঁর ব্যবহৃত কিছু দ্রব্য যা তাঁর প্রকৃতি ও দৈনন্দিন আচরণের কথা মনে করিয়ে দেয়। তিনি দু'হাতে সমান লিখতে পারতেন, কারণ রোজই তাঁর বহু লিখতে হত ও ডান হাত ক্লান্ত হয়ে গেলে তিনি বাঁ হাতে লিখতেন, অদ্ভুত অদ্ভুত ঠিকানায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে তাঁর নামে আসা কিছু চিঠির নমুনা (তাঁর লোকপ্রিয়তা অনায়াসেই বুঝিয়ে দেয়), দেওয়াল চিত্র, তৈলচিত্র প্রভৃতি। সংগ্রহালয়ের বিশেষ সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে প্রখ্যাত শিল্পী প্রয়াত সতীশ সিংহ মহাশয়ের শেষ ছবি—গান্ধীজীর পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি (তৈলচিত্র) ও অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম-কৃত ১০০ ফুটেরও অধিক (রানিং) দেওয়াল চিত্র, যার মাধ্যমে গান্ধীজীবন ও চিন্তাধারা এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন অধ্যায় প্রভৃতি দেখানো হয়েছে এবং বিভিন্ন জাতীয় নেতার কণ্ঠস্বরের রেকর্ড, স্বদেশী গানের বহু রেকর্ড, গান্ধীজীর সংস্পর্শে এসেছিলেন এরূপ বহুজনের গান্ধী সম্বন্ধে স্মৃতিকথা।

সংগ্রহালয়ে বর্তমানে পাঁচটি প্রদর্শন-কক্ষ আছে। সংগ্রহালয়ের একটি প্রধান অঙ্গ ও আকর্ষণ এর গ্রন্থাগারটি। কেবল গান্ধীজীর লেখা ও তাঁর সম্পর্কিত সব নয়, রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, পরিসংখ্যান, স্বাধীনতা আন্দোলন, জীবনীমূলক-পুস্তকাদি, নৃতত্ত্ব, সাহিত্য ও শিল্প প্রভৃতি বহু বিষয়ের উপর এর সংগ্রহ খুবই উপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ, উচ্চ গবেষণার পক্ষেও সমান উপযোগী। বর্তমানে পুস্তকের সংখ্যা প্রায় সাড়ে সাত হাজারের মত। এছাড়াও এখানে গান্ধী সম্পাদিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, তাঁর লেখা

ও তাঁকে লেখা প্রায় আঠাশ হাজার (২৮,০০০) চিঠির ফোটোকপি, বিভিন্ন ধরণের পত্র-পত্রিকা সংরক্ষিত হয়েছে ও হচ্ছে। গবেষণার কাজের সুবিধার জন্য গ্রন্থাগার সংলগ্ন একটি আবাসস্থলও আছে।

সংগ্রহালয়ের একটি নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদিও আছে। গান্ধী জীবন ও চিন্তাধারা, সমসাময়িক বিষয়াদি ও সমস্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপর সভা, আলোচনা, সেমিনার প্রভৃতির আয়োজন এখানে করা হয়ে থাকে। এই সংগ্রহশালা দেখতে কোনো টিকিট লাগে না। বুধবার বাদে সব দিন খোলা থাকে ১১টা থেকে ৫টা পর্যন্ত।

লেখক পরিচিতি ঃ কঃ বিঃ, বিদ্যাঃ বিঃ ও এশিয়াটিক সোসাইটির সাম্মানিক অধ্যাপক; বর্তমানে বারাকপুর গান্ধী স্মরাক সংগ্রহালয়ের সম্পাদক

চোদ্দ মহলের ফর্দ

১৮৮৭ সালে গোরাদের বাজার করবার জন্য গড়ে ওঠে সদরবাজার এবং আর্দালি বাজার। আর এই দুই বাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল কিছু মহল। সাধারণভাবে মহল বলতে যা বোঝায় সেই অর্থে মহল নয়। মহল বলতে প্রকৃতপক্ষে বোঝায়। "a division of a Talluk or district, yielding revenue according to assessment..." আসলে এগুলি ছিল কিছু মহল্লা অর্থাৎ অঞ্চল। গোরাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করা হত এই সব মহল থেকে।

সদর বাজারকে কেন্দ্র করে সেসব মহল গড়ে উঠেছিল সেগুলো হল ঃ আলিগোল মহল, কুঁজরা মহল, গোলা মহল, ছপ্পর মহল, বাকার মহল, বাজাজ মহল, মরিয়ম মহল, মুচি মহল, মুটিয়া মহল এবং মুরগি মহল।

আর্দালি বাজারকে কেন্দ্র করে যেসব মহল গড়ে উঠেছিল সেগুলো হল — টিকিয়া মহল, লকড়ি মহল, লোটারী মহল এবং সব্জি মহল। এই মহলগুলোর নাম থেকে স্পষ্ট যে, এইসব মহলের লোকজন বিশেষ বিশেষ পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিল। কেউ কেউ এই সব মহলের নাম রহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

Muslims in Sadar Bazar area

Md. Ghayasuddin

"Muslims of Monirampur and especially of Sadar Bazar are urdu speaking. They are originated from Bihar and Uttar Pradesh migrated or switched over to Bengal in 1854 during the war of Independence of Kunwar Singh, from Balia district of U.P. and Arrah of Bihar. Among those migrated Non-Bengalees, were Muslims as well as Hindus. They permanently settled here, and with them a quite different culture flourished in Sadar Bazar and part of Manirampur. Those people were mostly backward and uneducated the localities of Sadar Bazar have been named after different professional identity, such as Bazaz Mohal (estate of cloth sellers) Mochi Mohal (estate of Coblers), Kunjra Mohal (estate of vegetables and fish monger) etc.

Muslims of this locality, in absence of their proper education and lack of employment have passed half of the century in great distress and misery. However, in between adverse and unfavourable situation, the Muslims are trying their hard to overcome the poverty and illiteracy.

Muslims of the locality amidst the surrounding of the Bengalee culture, have been maintaining their own culture. They celebrate Idulfiter, Iduzzoha and Moharram festival quite comfortably. On those occasions they put on their traditional colourful dresses.They decorate their localities with flag-chains and lightings. They observe Muharram and in the memory of Imam Hussain's martyrdom they display mock warfare."

Identity of the writer : Teacher

Hindi Culture in Sadar Bazar area

Gobind Prasad Yadav

Barrackpore Cantonment has two civilian localities and in between them is situated the military establishment. The Eastern locality is known as Orderly Bazar situated near Barrakpore Chiriamore. Originally poor Muslims and Hindus served as orderly for the British rulers. They mainly lived in these localitis hence identified as Orderly Bazar. It has Looteri Mohal, Lakri Mahal, Sabji Mahal etc. These areas have a mixed population of Hindustani and Muslim living together peacefully. They speak a common dialect as the populace of Sadar Bazar but in their domestic life they speak the Bhojpuri language.

The Western locality is Sadar Bazar. In Sadar Bazar we find many separate settlements known as Mahals, like Gola Mahal, Aligole Mahal, Mochi Mahal, Bazaz Mahal etc.

The Urdu education started much earlier in Sadar Bazar area, the Hindi edcuation started in 1930. There is Sadar Bazar Hindi U.P. School. Then there came Arya Samaj School, Harijan School, Cantonment Primary School (Sadar Bazar).

Once the Arya Samaj played a very active role in spreading education—girls' education, social consciousness, nationalism among the local Hindusthani. They fought against superstition and exploitations. They established one Hindi library in the Sadar Bazar area with free Hindi teaching centre in Bazaz Mahal in 1946. Another library was opened by the Hindi Sahitya Parishad with active efforts of Sri

Haridas Bhagat, Niranjan Saha beside Keshari Market of Sadar Bazar.

'Vijnan Doot' was published by me in 1981. It is the first Govt. Registered Hindi Science magazine ever published from Eastern India. I also published Yadu Sangam. Late Sailendra Nath Das also published Hindi magazine.

'Acchyut-Kanya' – a Hindi drama was played in Motia Mahal in 1948-49. Kawalis of Hira and Panna Bose, Sitatram Singha were very popular in the early fifties and sixties.

Late Meghu Gowala shall be remembered for his active role in football game. He founded the Chitaranjan Club in 1930. It is heard that he even sold his cattle to procure money for club and players.

Hindi-speaking people take part in festivals like Holi, Diwali, Chata Poojas Durga and Kali Poojas.

Identity of the Writer : Teacher & Researcher

সদর বাজার

১৮৮৭ সালে সদর বাজার স্থাপিত হয়। এই বাজার বারাকপুর থানার অন্তর্গত। প্রধানতঃ গোরাদের বাজারের জন্যই এই বাজার স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে সদর বাজার যেখানে বসে সেখানে কিন্তু শুরুতে এই বাজার বসত না। বারাকপুর কোর্টের কাছে বাসস্ট্যাণ্ডের মোড়ে এই বাজার বসত ভোর চারটে থেকে। গোরারা বাজার করার পর কালা আদমীরা বাজার করতে পারত। মাছ, মাংস পরীক্ষা করে আসার পর বিক্রির জন্য ছাড়পত্র পেত।

চতুর্থ অধ্যায়

তথ্য ও পরিসংখ্যানে বারাকপুর (সংগৃহীত)

উত্তর বারাকপুর পৌরসভা — এক ঝলক

Area : 12.22 sq.km

Total Population (91 census) 1,00,661 (This excludes population of Defence estates and added areas of Panchayat & Neighbouring Municipality)

No. of holding	: 19662 (approx)		
No. of Schools	Primary		
	Bengali	49	
	Hindi	5	
	Urdu	1	55
No. of Schools	Secondary (Class X)	15	
	Higher-Secondary (Class XI-XII)	6	
	Junior (Class VIII)	5	26
No. of College			1
Water Supply	Total length of pipe line - (75000 mtr)		
	Hand tubewell - 510 Nos.		
	Pump house - 16 Nos.		
Roads	Metalled Road Length	66 km	
	Kutcha Road Length	82 km.	
	Brick Pavement Length	34 km.	

No. of Latrines	Ganga Action 1352 Nos. Pour flush 1861 CUDP-III 1464 + 8th Plan 82 Nos. - 1546 Septic Tank 9500 Service Privy NIL Bathing Ghat 14 Nos. Burning Ghat 3 Nos.
No. of Ambulance	2 Nos. (another sanctioned under IPP-VIII-HP)
No. of other Vehicle	1 (Jeep)
No. of Conservancy Vehicles	Tractor 5 Nos. Trailors 2 Nos. Lorry 2 Nos. Power Tiller 1 Nos. Rickshaw Van 3 Nos. Cesspool Cleaner 1 Nos.
No. of Health Administrative Unit	4
No. of Charitable Dispensaries	5 (including 1 Homeodispensary and the subsidiary dispensary at Nayabasti)
No. of Hospital	1 (another is proposed under IPP-VII-HP)
No. of ESOPD	1 (another ESOPD is proposed under IPP-VIII-HP)
No. of Polyclinic	1
No. of Laboratory	2
No. of Night Emergency Service Wing	1

Source : North Barrackpore Municipality.

উত্তর বারাকপুর পৌরসভার লোকসংখ্যা

(১৯৯১ আদম সুমারি অনুযায়ী)

	Ward No.	Block No.	Male	Female	Total
CHARGE I	1	(1 to 5)	1479	1245	2724
	2	(6 to 16)	3006	2779	5785
	3	(17 to 30)	4025	3856	7881
	4	(31 to 38)	2569	2086	4655
	5	(39 to 49)	3135	2959	6094
	6	(50 to 56)	2335	2151	4486
	7	(57 to 66)	2902	2680	5582
	8	(67 to 75)	3362	2751	6113
	9	(76 to 82)	2126	1935	4061
	10	(83 to 93)	3313	2943	6256
	11	(94 to 111)	5165	4930	10,095
CHARGE II	12	(1 to 5)	1586	1463	3049
	13	(6 to 9)	1037	962	1999
	14	(10 to 11)	462	417	879
	15	(12 to 18)	1758	1546	3304
	16	(19 to 22)	967	924	1891
	17	(23 to 29)	1813	1710	3523
	18	(30 to 41)	3956	3311	7267
	19	(42 to 48)	2330	1907	4237
	20	(49 to 57)	2829	2393	5222
	21	(58 to 61)	1224	1082	2306
	22	(62 to 67)	1787	1410	3197
			53,166	**47,440**	**100,606**

Source : Census 1991, W.B. Dist. Census Handbook-North 24 Pgs.

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতিবিজড়িত ১২৫ বছর অতিক্রান্ত উত্তর বারাকপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান এবং উপ-পৌরপ্রধানদের তালিকা ১৮৭৫ সাল থেকে

(রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ দীর্ঘ ৩৪ বছর উত্তর বারাকপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান ছিলেন)

CHRONOLOGICAL LIST OF CHAIRMEN

Capt. N. Hopkinson
Chairman from 1st April, 1875 to 3rd March, 1880.

Major. N. Hopkinson
Chairman from 4th March, 1880 to 1st May, 1881.

Capt. J. F. Revett
Chairman from 2nd May, 1881, to 2nd Feb, 1882.

Major. W. R. Bright
Chairman from 3rd Feb, 1882 to 1st Aug, 1882.

Major H. C. Creak
Chairman from 2nd Aug, 1882 to 4th April, 1883.

Major W. Hopkinson
Chairman from 5th April, 1883 to 20th Jan, 1885.

Mr. S. N. Banerjea
Chairman from 21st Jan, 1885 to 1st May, 1889.

Lt. P. M. O''Laughlen
Chairman from 2nd May, 1889 to 18th Feb. 1891.

Hon. Sir S. N. Banerjea
Chairman from 19th Feb, 1891 to 15th Oct, 1921.

Mr. B. T. Marik

Chairman from 16th Oct, 1921 to 4th June, 1922.

Mr. B. S. Banerjea

Chairman from 5th June, 1922 to 3rd Nov. 1934.

Mr. G. B. Mandal

Chairman from 4th Nov. 1934-1948.

Mr. Bhudhar Bhattacharjee	1948-1950
Mr. G. B. Mandal	1950-1952
Mr. C. R. Mitra	1952-1960
Mr. R. B. Mandal	1960-1965
Mr. S. D. Mukherjee	1967-1981
Mr. M. M. Nath	10.7.1981—

CHRONOLOGICAL LIST OF VICE-CHAIRMEN

Mr. Kailash Chandra Roy Chowdhury : 01.04.1875-01.05.1881
Mr. Shyama Charan Banerjee : 02.05.1881-02.1882
Mr. Kailash Chandra RoyChowdhury : 03.02.1882-20.01.1885
Mr. Ramanath Dey : 21.01.1885-18.02.1891
Mr. Bhuban Mohan Neogy : 19.02.1891-16.03.1894
Mr. Nabin Chandra Bose : 17.03.1894-23.06.1900
Mr. Bhaba Taran Marik : 24.06.1900-20.11.1911
Mr. Gadadhar Mandal : 16.11.1916-20.10.1921
Mr. Bhaba Taran Marik : 21.11.1921-04.05.1925
Mr. Surendra Nath Mukherjee : 05.05.1925-25.05.1929
Mr. Phanindra Nath Chatterjee : 26.05.1929-30.04.1932
Mr. Moni Mohan Marik : 07.05.1932-03.11.1934
Mr. M. S. Bhattacharya : 04.11.1934-27.03.1943
Dr. B. K. Ghosh, From : 28.03.1943

Mr. Madhusudan Bhattacharjee	1943-48
Mr. Anil Bhattacharjee	1948-52
Mr. Pasupati Mandal	1952-56
Mr. R. B. Mandal	1956-60
Mr. S. D. Mukherjee	1960-66
Mr. L. N. Ghosh	1966-81
Mr. S. M. Sanyal	1981-95
Mr. K. N. Mukherjee	20.6.1995 —

Source : North Barrackpore Municipality.

উত্তর বারাকপুর পৌরসভা—অতীত এবং বর্তমান

উত্তর বারাকপুর পৌরসভা ১৮৬৯ সালে গঠিত হয়। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল গারুলিয়া। পরবর্তীকালে ১৮৯৬ সালে গারুলিয়া পৃথক পৌরসভা হিসাবে পরিগণিত হয়। সেসময় এই পৌরসভার আয়তন ছিল সাড়ে পাঁচ বর্গমাইল এবং ১০টা ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিল নোয়াপাড়া, ইছাপুর (২টি ওয়ার্ড) নবাবগঞ্জ (৩টি ওয়ার্ড), পলতা, ধিতাড়া, মণিরামপুর এবং গাঁতি।

বর্তমানে এই পৌরসভার আয়তন ১২.২২ বর্গ কিমি. এবং মোট ওয়ার্ড ২২টি।

লোকসংখ্যা

সেকাল				একাল			
সাল	মোট	পুং	নাঃ	সাল	মোট	পুং	নাঃ
১৮৮১	১১,১৬৬			১৯৮১	৮১,২৯০	৪৩,১০২	৩৮,১৮৮
১৮৯১	১৩,২৩৪	৭,১৬৬	৬,০৬৮	১৯৯১	১,০০,৬০৬	৫৩,১৬৬	৪৭,৪৪০

বারাকপুর মহকুমার পৌরসভাগুলিতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার

পৌরসভার নাম	প্রতিষ্ঠার তারিখ	আয়তন	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১
উত্তর বারাকপুর	১.৪.১৮৬৯	৮.৪২	১২,৬০০	১১,৮৪৭	১৫,৪৩৩	১৬,২৫৮	২৬,৯৬৬
				−০৫.৯৮	+৩০.২৭	+০৫.৩৫	+৬৫.৮৬
বরানগর	১.৪.১৮৬৯	৭.১২	২৫,৪৩২	২৫,৮৯৫	৩২,০৮৪	৩৭,০৫০	৫৪,৪৫১
				+০১.৮২	+২৩.৯০	+১৫.৪৮	+৪৬.৯৭
নৈহাটি	৬.১৮৬৯	৪.৩৫	২৩,৭৫৩	১৮,২১৯	২৩,২৮৬	৩০,৯০৮	৪২,২০০
				−২৩.৩০	+২৭.৩১	+৩২.৭৩	+৩৬.৫৩
দঃ দমদম	৩.৯.১৮৭০	১০.৬৯	১০,৯০৪	১২,৮৭৪	১৪,০৩০	১৮,৪৭১	২৫,৪১৮
				+১৮.০৭	+৮.৯৮	+৩১.৬৫	+৩৯.৮৮
উঃ দমদম	১০.৯.১৮৭০	১৯.৪২	৯,৯১৬	৮,৮৬৫	৮,২২৪	৪,৫৩৫	৫,৯৭৪
				−১০.৮০	−৭.২৩	−৪৪.৮৬	+৩১.৭৩
টিটাগড়	১.৪.১৮৯৫	৩.২৪	১৬,০৬৫	৪৫,১৭১	৫২,৪৫১	৪৯,৫৮৪	৫৭,৪১৬
				+১৮১.১৮	+১৬.১২	−৫.৪৭	+১৫.৮০
গারুলিয়া	১.৫.১৮৯৬	৬.৪৮	৭,৩৭৫	১১,৫৮০	১৩,০৯৬	১৪,০৩৩	২০,১৫০
				+৫৭.০২	+১৩.০৯	+০৭.১৫	+৪৩.৫৯
ভাটপাড়া	১.৭.১৮৯৯	১৫.৮৫	২১,৫৪০	৫০,৪১৪	৬৫,৬০৯	৮৪,৯৭৫	১,১৭,০৪৪
				+১৩৪.০৫	+৩০.১৪	+২৯.৫২	+৩৭.৭৪

পৌরসভার নাম	প্রতিষ্ঠার তারিখ	আয়তন	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১
উত্তর বারাকপুর	১.৪.১৮৬৯	৮.৪২	৩২,১৭৩	৫৬,৬৮৩	৭৬,৩৩৫	৮১,৭৫৮	১.০০,৬০৬
			+১৯.৩১	+৭৬.১৮	+৩৪.৬৭	+০৭.১০	+২৩.০৫
বরানগর	১.৪.১৮৬৯	৭.১২	৭৭,১২৬	১,০৭,৮৩৭	১,৩৬,৮৪২	১,৭০,৩৪৩	২,২৪,৮২১
			+৪১.৬৪	+৩৯.৮২	+২৬.৯০	+২৮.৪৮	+৩১.৯৮
নৈহাটি	৬.১৮৬৯	৪.৩৫	৫৫,৩১৩	৫৮,৪৫৭	৮২,০৮০	১,১৪,৬০৭	১,৩২,৭০১
			+৩১.০৭	+০৫.৬৮	+৪০.৪১	+৩৯.৬৩	+১৫.৭৯
দঃ দমদম	৩.৯.১৮৭০	১০.৬৯	৬১,৩৯১	১,১১,২৮৪	১,৭৪,৩৪২	২,৩০,২৬৬	২,৩২,৮১১
			+১৩৭.৬৯	+৮১.২৭	+৫৬.৬৬	+৩২.০৮	+১.১১
উঃ দমদম	১০.৯.১৮৭০	১৯.৪২	১২,১৫৬	৩৮,১৪০	৬৩,৮৭৩	৯৬,৪১৮	১,৪৯,৯৬৫
			+১০৩.৪৮	+২১৩.৭৫	+৬৭.৪৭	+৫০.৯৫	+৫৫.৫৪
টিটাগড়	১.৪.১৮৯৫	৩.২৪	৭১,৬২২	৭৬,৪২৯	৮৮,২১৮	১,০৪,৫৩৪	১,১৪,০৮৫
			+২৪.৭৪	+৬.৭১	+১৫.৪২	+১৮.৫০	+৯.১৪
গারুলিয়া	১.৫.১৮৯৬	৬.৪৮	২৮,৩০৪	২৯,০৪১	৪৪,২৭১	৫৭,০৬১	৮০,৯১৮
			+৪০.৪৭	+০২.৬০	+৫২.৪৪	+২৮.৮৯	+৪১.৮১
ভাটপাড়া	১.৭.১৮৯৯	১৫.৮৫	১,৩৪,৯১৬	১,৪৭,৬৩০	২,০৪,৭৫০	২,৬৫,৪১৯	৩,১৫,৯৭৬
			+১৭.২৭	+৯.৪২	+৩৮.৬৯	+২৯.৬৩	+১৯.০৫

পৌরসভার নাম	প্রতিষ্ঠার তারিখ	আয়তন	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১
কামারহাটি	৪.৯.১৮৯৯	১০.৯৬	১৩,২১৬	১৮,০১৫	২৩,০১৮	৩০,৩৩৪	৪২,৭৪৫
				+৩৬.৩১	+২৭.৭৭	+৩১.৭৮	+৪০.২৬
পাণিহাটি	১.৪.১৯০০	১৯.৪০	১১,১৭৮	১১,১১৮	১০,১৬১	১১,৬৯৯	২৭,৪১০
				–০.৫৪	–৮.৬১	+১৫.১৪	+১৩৪.২৯
হালিশহর	১.৭.১৯০৩	১০.১০		১৩,৪২৩	৭,৩১৮	১৬,৭৭০	২৫,৮০৪
					–৪৫.৪৮	+১২৯.১৬	+৫৩.৮৭
বারাকপুর	১.৪.১৯১৬	১৩.৬৩			২২,৪৬০	১৪,৪১৩	২১,৭৭৩
						–৩৫.৮৩	+৫১.০৭
কাঁচড়াপাড়া	১.১০.১৯১৭	১২.৭২			১০,৩৩২	১৫,০০৫	২৪,০১৫
						+৪৫.২৩	+৬০.০৫
খড়দহ	১.৪.১৯২০	৬.৮৭			৫,৪৮৬	৬,০১৮	৯,৫৬৮
						+০৯.৭০	+৫৮.৯৯
দমদম	১.৪.১৯২৯	৩.১১				৫,৩৫০	৭,৬২২
							+৪২.৪৭
নিউ বারাকপুর	১৬.৮.১৯৬৫	১৭.১৭					

পৌরসভার নাম	প্রতিষ্ঠার তারিখ	আয়তন	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১
কামারহাটি	৪.৯.১৮৯৯	১০.৯৬	৭৭,২৫১	১,২৫,৪৫৭	১,৬৯,৪০৪	২,৩৪,৯৫১	২,৬৬,৮৯৯
			+৮১.৫৭	+৬২.৪০	+৩৫.০৩	+৩৮.৬৯	+১৩.৫৯
পাণিহাটি	১.৪.১৯০০	১৯.৪০	৪৯,৫১৪	৯৩,৭৪৯	১,৪৮,০৪৬	২,০৫,৭১৮	২.৭৫,৯৯০
			+৮০.৬৪	+৮৯.৩৪	+৫৭.৯২	+৩৮.৯৬	+৩৪.১৬
হালিশহর	১.৭.১৯০৩	১০.১০	৩৪.৬৬৬	৫১,৪২৩	৬৮,৯০৬	৯৯,৩৬৬	১,১৭,৫৩৯
			+৩৪.৩৪	+৪৮.৩৪	+৩৪.০০	+৪৪.২১	+১৮.২৯
বারাকপুর	১.৪.১৯১৬	১৩.৬৩	৪২,৬৩৯	৬৩,৭৭৮	৯৬,৮৮৯	১,১৫,৫১৬	১,৪২,৫৫৭
			+৯৫.৮৩	+৪৯.৫৮	+৫১.৯২	+১৯.২৩	+২৩.৪১
কাঁচড়াপাড়া	১.১০.১৯১৭	১২.৭২	৫৬,৬৬৮	৬৮,৯৬৬	৭৮,৭৬৮	৯৮,৮১৬	১,১১,৬০২
			+১৩৫.৯৭	+২১.৭০	+১৪.২১	+২৫.৪৫	+১২.৯৪
খড়দহ	১.৪.১৯২০	৬.৮৭	১৮,৫২৪	২৮,৩৬২	৩৬,৬৭৯	৫০,২০২	৮৮,৩৫৮
			+৯৩.৬০	+৫৩.১১	+২৯.৩২	+৩৬ ৮৭	+৭৬.০০
দমদম	১.৪.১৯২৯	৩.১১	১৪,০০২	২০,০৪১	৩১,৬৬৩	৩৩,৬০৪	৪০,৯৬১
			+৮৩.৭১	+৪৩,১৩	+৫৬.৪৯	+০৭.১৫	+২১.৮৯
নিউ বারাকপুর	১৬.৮.১৯৬৫	১৭.১৭			৩২,৫১২	৪৬,৫৩০	৬৩,৭৯৫
						+৪৩.১২	+৩৭.১১

Source : (Census, 1991,West Bengal District Census Hand book-North 24 Pgs., Bengal District Gazetters-24 Pgs.-O' malley and W.B. Dist. Gazatteers-24 Pgs.-94.) Compiled by Kanai Pada Roy-Editor, Nagar Periye

বারাকপুর মহকুমার পোস্ট অফিসের তালিকা

BARRACKPORE

List of Post Offices under Barrackpore Head Post Office		PIN
1.	Barrackpore	743101
2.	Anandapuri	743102
3.	Athpur	743128
4.	Anandmath	743145
5.	Bagermore	743145
6.	Barrackpore Bazar	743101
7.	Barrackpore Govt. House	743101
8.	Barrackpore Vivekananda Math Park Road	743101
9.	Barrackpore R.S.	743187
10.	Bengal Enamel	743122
11.	Benodnagar	743145
12.	Bhatpara	745123
13.	Bishalakhighat	743188
14.	Brahmasthan	743188
15.	Chandmari Road	743145
16.	ESD (Machinary)	743124
17.	Feeder Road	743127
18.	Fingapara	743129
	i)Dogachia	
19.	Garulia	743133
20.	Ghoshpara Road	743101
21.	Golghar	743125
22.	Gorifa	743166
	i) Kuliagarh	
	ii) Madarpur	
	iii) Mamudpur	
23.	Guptarbagan	743125

24.	Halisahar	743134
25.	Hazinagar	743135
	i) Jetia	
	ii)Malancha	
26.	Ichapur	743144
27.	Ichapur Nawabganj	743144
28.	Ichapur Rifle Factory	743144
29.	Jaffarpur	743102
30.	Jagatdal	743125
31.	Kampa	743193
32.	Kanchrapara	743145
	i) Barajaunpur	
	ii) Chandua	
	iii) Majhipara	
	iv) Salidaha	
33.	Kelabagan	743194
34.	Kanchrapara Loco shop	743145
35.	Kankinara	743126
	i) Keotia	
	ii) Kushdanga	
	iii) Madral	
	iv) Narayanpur	
	v) Padmalavpur	
36.	Kanthadhar	743144
37.	Kowgachi	743127
38.	LalKuthi	
743135		
39.	Metal & Steel Factory	743144
40.	Monirampur	743101
41.	Mulajore	743127
42.	Muktarpur	743123
43.	Naihati	743165
	i) Purnanandapally	
44.	Nabanagar	743136
45.	Naihati Ananda Bazar	743165
46.	Nayapally	743101
47.	Nilganj Bazar	743120

i) Beraberia
ii) Sewli Telinipara
iii) Suryapur

48.	Nonachandanpukur	743102
49.	Orderly Bazar	743101
50.	Ordnance Factory Estate Postal Savings Bureau	743144
51.	Pinkal	743133
52.	Palasi	743195
53.	Panpara	743187
54.	Ramghat	743166
55.	Ramlakshmi Basti Lane	743194
56.	Shyamnagar	743127

i)Gurdah
ii)Mandalpara
iii)Purbabidyadharpur
iv)Paltapara

57.	Talpukur	743187
58.	Titagarh	743188

i)Bandipur
ii)Patulia

BELGHARIA

	List of Post Offices under Belgheria Head Post Office	PIN
1.	Belgharia	700056
2.	Agarpara	743177
3.	Ariadah	700057
4.	Baguihati Super Market	700059
5.	Balaramdharma Sopan	743121
6.	Bangodaya	743176
7.	Basudebpur	700056
8.	Bijoypur	743178
9.	Belgharia Mohini Mills	700056
10.	Birati	700051

	i)Sultanpur	
11.	Dakshineswar	700076
12.	Deshapriyanagar	700056
13.	East Belgharia	700083
14.	Elias Road	700058
15.	Ghola Bazar	743170
	i)Ghola	
16.	Italgacha	700079
17.	Jeliapara	743155
18.	Kamarhati	700058
19.	Kamarhati Mills	700058
20.	Khardah	743155
21.	Nandan Nagar	700083
22.	Natagarh	743175
	i)Karnamadhabpur	
23.	Nawadapara	700057
24.	Nimta	700049
25.	Panchanantala	743175
26.	Panihati	743176
27.	Pansila	743180
	i)Kalyannagar	
28.	Prafulla Kanan	743511
29.	Rahara	743186
30.	Rajbari Colony	700081
31.	Ramchandrapur	743178
32.	Rathtala	700056
33.	Sodepur	743178
	i)Chandpur Leningarh	
	ii)Jugberia	
34.	Sodepur Govt. Housing Estate	743178
35.	South Belgharia	700056
36.	Sukchar	743179
37.	Surya Sen Nagar	743155
38.	Texmaco	700056
39.	Tirtha Bharati	743178
40.	Udaipur	700049

বারাকপুর মহকুমার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বাজার

প্রথম পর্যায়ে তিনটি থানা ঃ বারাকপুর, নোয়াপাড়া এবং টিটাগড়

বাজারের নাম	শুরু (সাল)	বাজার বসার দিন	প্রধান কৃষিজ সামগ্রী	পাইকারী/ খুচরা	প্রত্যহ গড় উপস্থিতি
সদর বাজার	১৮৮৭	প্রত্যহ সন্ধ্যা	চাল, মাছ, মাংস এবং সব্জী	খুচরা	১০০০
শান্তি বাজার	১৯৪৮	প্রত্যহ	চাল, সব্জী, আলু মাছ, টাটকা ফল মশলা ইত্যাদি	খুচরা	২০০০
তালপুকুর বাজার	১৯২৩	প্রত্যহ সকাল	ঐ	ঐ	৩০০০
গারুলিয়া বাজার	১৯১৭	প্রত্যহ	সব্জী, আলু, মাছ চাল ইত্যাদি	পাইকারী এবং খুচরা	২০০০
নতুন বাজার	১৯৩০	প্রত্যহ সকাল	সব্জী, আলু, মাছ চাল, মাংস ইত্যাদি	খুচরা	৯০০
আর্দলি[১] বাজার	১৮৮৭	সোমবার এবং শুক্রবার	সব্জী, আলু, মাছ চাল ইত্যাদি	পাইকারী এবং খুচরা	১৫০০
নবাবগঞ্জ বাজার	১৯২৫	প্রত্যহ	চাল, সব্জী, আলু, মাছ, টাটকা ফল মশলা ইত্যাদি	খুচরা	৫৫০০
টিটাগড় বাজার	১৯১০	প্রত্যহ (সন্ধ্যা)	চাল, সব্জী, আলু, মাছ, টাটকা ফল মশলা ইত্যাদি	ঐ	৪৮০০

১ বর্তমানে এই বাজারের অস্তিত্ব নেই

সূত্র ঃ West Bengal District Gazetters– 24 Parganas– Edited by Dr. Barun De, March '94

সংগীতচর্চায় মণিরামপুর ও সদর বাজার

স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এই মণিরামপুরে কবে, কখন এবং কে প্রথম সংগীত সাধনা শুরু করেছিলেন সে সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে শোনা যায় প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ রাইচাঁদ বড়াল পরিবার এই এলাকাতেই বসবাস করতেন। একটা সময় মণিরামপুরের বিভিন্ন এলাকায় পারিবারিক সংগীতচর্চা গড়ে উঠেছিল। মণিরামপুর গোয়ালাপাড়া নিবাসী প্রয়াত অশ্বিনী কুমার ঘোষের বাড়ি ছিল সংগীত চর্চার প্রাণকেন্দ্র। বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীরা সেকালে তাঁর বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত করতেন।

মণিরামপুরে সংগীত চর্চায় এর পরই বিশ্বনাথ ঘোষের নাম এসে পড়ে। তিনি অশ্বিনী ঘোষের সুযোগ্য পুত্র ছিলেন। জন্ম .১৯২৮ খ্রীঃ। ছেলেবেলায় পিতা ছাড়াও রানাঘাট নিবাসী সংগীতাচার্য নগেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে সংগীত শিক্ষা লাভ করেন। 'নাড়া' বাঁধেন চৌদ্দ বছর বয়সে লাহোরের বিখ্যাত শিল্পী আমানত আলি ও ফতে আলির কাছে। তাঁর মধুর কণ্ঠস্বরের জন্য ভাতখণ্ডে সংগীত বিদ্যাপীঠ (লক্ষ্ণৌ) তাঁকে 'সংগীত বিশারদ' এবং প্রয়াগ সংগীত সমিতি (এলাহাবাদ) তাঁকে 'সংগীত প্রবীণ' (এম. মিউজিক) উপাধিতে ভূষিত করে। 'সংগীত তীর্থ' নামে সংগীত বিদ্যালয়ের তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। তখন শাস্ত্রীয় সংগীতের আসর তাঁর উদ্যোগে কখনও রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউটে আবার কখনও টিটাগড় টাউন হলে বসতো। ভারতের বিশিষ্ট শিল্পীরা আসতেন সেই সব অনুষ্ঠানে।

সেকালে সংগীতের চলমান ধারাকে বজায় রাখতে প্রতিনিয়তই যাঁরা উদ্যোগী ছিলেন তাঁদের মধ্যে সুজিত বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। তিনি মূলতঃ ক্লাসিক নৃত্যশিল্পী। অল্প বয়সেই উদয়শংকরের নৃত্যশিল্পের প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠেন। বিশ্বভারতীতেও (শান্তিনিকেতন) কিছুদিন শিক্ষা লাভ করেন। নৃত্যাচার্য প্রহ্লাদ দাসই ছিলেন তাঁর সংগীত গুরু। এগার বছর বয়সে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা করে বারাকপুর সদর বাজারে নিজের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করলেন 'কলাভবন সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র'। যোগ দেন 'গীতায়ন'-এ নৃত্য শিক্ষক হিসেবে পরবর্তীকালে।

মণিরামপুর এলাকায় প্রথম প্রতিষ্ঠিত সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র 'গীতায়ন'। এর প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বেনিয়া পাড়ায়। পরে ১৯৬০ খ্রীঃ স্বর্গীয় নৃত্যকালী হালদারের গৃহে 'গীতায়ন' স্থানান্তরিত হয়। গীতায়নের সম্পাদক ডঃ অরূপ কুমার হালদার অত্যন্ত সংস্কৃতি পিপাসু উৎসাহী মানুষ। তরুণ প্রতিভাবান শিল্পীদের খুঁজে বের করে জনসমক্ষে তুলে ধরার

প্রয়াসী ছিলেন। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ‘গীতায়ন ক্যাসেট কোম্পানী’। ‘সুরের সুরভি’ নামে আধুনিক বাংলা গানের একটি ক্যাসেট এই কোম্পানির উদ্যোগে প্রকাশ হয় ‘১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে’। তথ্য সংগ্রাহকও ক্যাসেটির সঙ্গে সংপৃক্ত ছিল। গীতায়নের সঙ্গে যুক্ত প্রবীণ কণ্ঠ শিল্পী অজিত চক্রবর্তীও এককালে বিশ্বনাথ ঘোষের ছাত্র ছিলেন।

মণিরামপুর নিবাসী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ও একজন সংগীত সাধক। তিনি মূলতঃ উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশন করে থাকেন।

সদর বাজার নিবাসী শ্যামসুন্দর বোস তবলাবাদক হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত। পাড়ি দিয়েছেন বিদেশেও।

বর্তমানের প্রতিষ্ঠিত নৃত্যশিল্পী প্রদীপ্ত নিয়োগী এই এলাকার মানুষ। সুজিত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম সংগীত গুরু। পরবর্তীকালে অমলাশংকর, উদয়শংকর কালচারাল সেন্টারে যুক্ত হন। সরকারি চাকুরি ছেড়ে দিয়ে আত্মনিয়োগ করেন নৃত্যে। পাড়ি দিয়েছেন বিদেশেও একাধিকবার। কত্থক শিখেছেন রামগোপাল মিশ্রের কাছে। ১৯৭৮ খ্রীঃ গড়লেন ‘সাহানা’ সংগীত শিক্ষালয়। শিল্পী অনুরাধাকে পেলেন সহধর্মিনী হিসেবে।

সুভাষ মল্লিক সদর বাজারে থাকেন। তিনি রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী। বিশ্বনাথ ঘোষের কাছে প্রথম সংগীত শিক্ষা শুরু হয়। পরবর্তীকালে কলকাতার ‘দক্ষিণী’, রনো গুহঠাকুরতা এবং সুবিনয় রায়ের কাছে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা লাভ করেন।

‘মুদ্রা’ সংগীত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা তিমির রায়। তিনিও নৃত্য শিল্পী। জগন্নাথ মিশ্রই তাঁর প্রথম নৃত্য গুরু।

তপন ভট্টাচার্যের জন্ম এক সংগীত পরিবারে। ১৯৮৬-৮৭ সালে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংগীতে স্নাতোকত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ‘গীতালী’ নামে সংগীত শিক্ষায়তনের তিনিই পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা।

প্রতিশ্রতিসম্পন্ন শিল্পী শুভজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় থাকেন সদর বাজারে। তাঁর সংগীত গুরু নারায়ণ ভট্টাচার্য (বারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের শিক্ষক)। বর্তমানে পণ্ডিত জয়ন্ত বসুর কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম চলছে।

আর একজন প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন শিল্পী বুলবুল মজুমদার (সরকার)। বর্তমানে স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ে সংগীত শিক্ষিকার কাজে ব্রতী আছেন। এরা ছাড়াও এলাকায় সংগীত চর্চায় যাঁরা নিযুক্ত আছেন তাঁরা হলেন—কৃষ্ণা ঘোষ, স্বপ্না ব্যানার্জি, উত্তম ঘোষ, সলিল ব্যানার্জি, প্রদীপ চক্রবর্তী প্রমুখ। মণিরামপুর প্রাচীন জনপদ হওয়া সত্ত্বেও, দীর্ঘদিন ধরে এখানে সুরতালের সাধনা চললেও সংগীত জগতে কোন ‘ঘরানা’ গড়ে তুলতে পারেনি এখনও পর্যন্ত।

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক

মণিরামপুরে গ্রন্থপ্রকাশের আলোকে কয়েকজন ব্যক্তিত্ব

—— অরিন্দম ঘোষ

মণিরামপুরের সাহিত্যচর্চায় গ্রন্থ রচনা করে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই যার নাম মনে আসে তিনি শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়। বিশিষ্ট কবি। শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থগুলি হল— 'দুরতরঙ্গ', 'রঙিন মাছের ঘর', 'মীরণের ছবি', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'। এছাড়াও লিখেছেন রহস্য উপন্যাস 'হাজার বুদ্ধের গুপ্ত ধন'। লেখালেখি করেছেন বিশিষ্ট সংবাদপত্র 'আজকাল', 'নগর পেরিয়ে', 'আজ বসন্ত' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাগুলিতে। সম্পাদনা করছেন "আকাশগঙ্গা" পত্রিকা। শম্ভুনাথের কবিতা মণিমুক্তার মত নিজের আলোকেই আলোকিত। তিনি একজন সম্পূর্ণ অর্থেই কবি। তাঁর কবিতায় নিসর্গ চেতনা আমাদের বুঝিয়ে দেয় আর একজন জীবনানন্দ আমরা পেয়ে গেছি। নিসর্গকে ভালোবাসাই তাঁর জীবনের শেষ কথা।

অধ্যাপিকা ড. শিখা দত্তের সৃষ্টির জগৎ হল 'বহ্নিশিখা', 'শুদ্ধ সমর্পণ' (কাব্যগ্রন্থ), 'আধুনিক বাংলা কবিতার চিত্রকাব্যচর্চা' ইত্যাদি গ্রন্থ। ডঃ দত্ত 'উদ্দীপন', 'মহাদিগন্ত', 'নগর পেরিয়ে', 'দশ নাবিক' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাতে লিখেছেন।

ডঃ রাধারমণ জানার গ্রন্থগুলি হল—'পালিভাষা সাহিত্য, বৌদ্ধদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ' এবং 'ঝঙ্কার' (গীতিগ্রন্থ)। তিনি 'নগর পেরিয়ে' পত্রিকাতেও লিখেছেন।

এই অঞ্চলে বিশিষ্ট ছড়াকার শিবনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত শিশুসাহিত্যের ভান্ডারের, রসদগুলি হল— 'ছড়ার ফুলঝুরি', 'হাসির মেলায় খুশির খেলায়' (যৌথভাবে)। যেসব উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকায় তিনি লিখেছেন 'যুগান্তর', 'বর্তমান', 'সংবাদ প্রতিদিন', 'বঙ্গলোক', 'নগর পেরিয়ে', 'গণশক্তি' 'আজ বসন্ত' প্রভৃতি। ভ্রমণ কাহিনী 'পাহাড় যখন ডাকে' এবং 'সময়ের হাত ধরে' প্রকাশের পথে।

বিশিষ্ট ছড়াকার স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ 'যেতে যেতে' এবং শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যৌথভাবে প্রকাশ করেছেন ছড়াগ্রন্থ 'হাসির মেলায়, খুশির খেলায়'। লিখেছেন বড় কাগজের পাশাপাশি ছোট পত্র-পত্রিকাতে— যুগান্তর, শুকতারা, বর্তমান, সংবাদ প্রতিদিন, বঙ্গলোক, নগর পেরিয়ে, সাহিত্যালোক, আজ বসন্ত ইত্যাদি। নন্দদুলাল রায়চৌধুরীর প্রচ্ছদযুক্ত গ্রন্থ 'পত্রদূত' প্রকাশিত হতে চলেছে।

শিখা রায় (দত্ত ভৌমিক) এবং শুভেন্দু দত্ত ভৌমিক, যুগ্মভাবে লিখেছেন তাঁদের কাব্যগ্রন্থ "এইতো সময়"। তাপসী ব্যানার্জির কাব্যগ্রন্থ "স্বরলিপির পংক্তিমালা"। বৃন্দাবন

দেবনাথের উপন্যাস 'নন্দিতা' একটি বাস্তবধর্মী আখ্যান।

মণিরামপুর অঞ্চলে আর একজন বিশিষ্ট লেখক হলেন নারায়ণচন্দ্র সাহা। যদিও তিনি সম্প্রতি অন্যত্র বসবাস করছেন কিন্তু তাঁর সব রচনাই মণিরামপুরে থাকাকালীন সৃষ্টি করেছেন। তাঁর লেখা উপন্যাসগুলি হল : 'আমার দুধমা', 'রূপ আলেয়া', 'তৃষিতা তৃণা', 'স্বপ্নের অলোরেখা', 'পদ্মাপারের প্রিয়া'। এছাড়া তিনি 'নগর পেরিয়ে', 'পদ্মা-গঙ্গা' প্রভৃতি পত্রিকাতেও লেখালেখি করছেন।

অধ্যাপক কানাই পদ রায়ের গ্রন্থ—"উত্তর চব্বিশ পরগণার সেকাল একাল"। এই বইটি ছাড়াও সম্পাদনা করেছেন "বারাকপুরের সেকাল একাল" (প্রথম খণ্ডও দ্বিতীয় খণ্ড)। তাঁর রচিত কয়েকটি কাব্য পুস্তিকার নাম—'শিবির', 'অবেলা', 'ফুলফুটলে আমি', 'পঞ্চায়েতের ছড়া'। 'নগর পেরিয়ে' পত্রিকার তিনিই হলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

এই অঞ্চলে তুষার পাল, প্রখ্যাত বার্মি লেখক পি. আউং খিন-এর অল্প অবলম্বনে লিখেছেন নাটক 'কেক'। তুষার পাল "নগর পেরিয়ে"-র একজন লেখক। "নগর পেরিয়ে" পত্রিকার অপর একজন লেখক, কবি ও নাট্যকার শংকর আচার্য। তাঁর রচিত নাটক 'জীবনের কথা'। তাঁর লেখা আর একটি গল্পগ্রন্থ 'এক মুঠো জীবন'।

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট কবি

কাঠখোদাই শিল্পে শঙ্কর বসু

সদরবাজার নিবাসী মণিরামপুর স্বামী মহাদেবানন্দ বিদ্যায়তনের শিক্ষক শঙ্কর বসু কাঠখোদাই শিল্পের মধ্য দিয়ে তাঁর শিল্পীমনের পরিচয় রেখেছেন। 'ট্র্যাডিশনাল আর্টের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মহিষাসুরমর্দিনী, গণেশ থেকে শুরু করে আমাদের মাটির কাছাকাছি মাতৃদুগ্ধ পানরত শিশু... অথবা একটা উঁচু সিংহাসনের দিকে হাজারো মানুষের সংগ্রামী আরোহন' এধরনের কিছু কাঠের ভাস্কর্যে তাঁর সূক্ষ্ম শিল্পবোধ ফুটিয়ে তুলেছেন। একটি মাত্র কাঠের খণ্ড খোদাই করে তিনি তাঁর এই ভাস্কর্য গড়ে তুলছেন। 'টেকনিকের দিক দিয়ে শিল্পী একান্ত বাধ্য না হলে কাঠে জোড়া দেন না। পারফেকশনই শিল্পীর পুরস্কার।'

(আজকাল, ২৩ জুন ১৯৯৭)



मंगल पांडे

कैलाश बैरकपुरी

---भारत की धरती पर बैरकपुर में ब्रिट्रिश हुकूमत के खिलाफ पहला बिगुल बजाने वाले फौजी 'मंगल पांडे' ३४ वी० रेजीमेंट को अंग्रेजों ने फाँसी पर चढ़ा दिया था, लेकिन इस क्रांतिकारी ने आजादी की लड़ाई का जो बीज १८५७ में बोया उसने १९४७ तक एक वटवृक्ष का आकार ग्रहण कर लिया। हिन्दुओं ने हाथ में गंगाजल और मुसलमानों ने कुरान लेकर सशस्त्र क्रांति की कसम खाई। १८५७ की इस क्रांति को 'नेशनल एण्ड रिलीजस वार' का नाम दिया था।

"वीरवर मंगल पांडे ने ब्राह्मण कुल में जन्म तो अवश्य ग्रहण किया था, किन्तु वे कर्म से क्षत्रिय ही थे, अपने साथियों में भी उनकी ख्याति एक शूरवीर सैनिक के रूप में ही थी।

असीम साहस के धनी समरांगण में महान पराक्रमी, विशुद्ध चरित्र के स्वामी एवं पापकर्म से पूर्णतः घृणा करने वाले किन्तु स्वधर्म के लिए प्राणों पर खेल जाने को आतुर इस तेजस्वी युवक का दिल स्वदेश-प्रेम की पावन अग्नि से धधक रहा था" (१८५७ का भारतीय स्वतंत्रता समर, पृष्ठ-१०८)

'विनायक दामोदर सावरकर' ने अपनी इसी पुस्तक में 'मंगल पांडेय' के विचारों, भावनाओं और स्वाधीनता के लिए उनकी आकुलता का जिक्र करते हुए लिखा है– "किन्तु अपने देश बाँधवों का अपमान मुँह पर ताले जड़कर सहन कर लेना और किंकर्तव्यविमूढ़ बने रहकर देखते रहना बैरकपुर की भारतीय सेना ने स्वीकार नहीं किया। इन सैनिकों में से वीरवर मंगल पांडे की तलवार ने अपने राष्ट्र की अपमान की इस दुःखद बेला में भी म्यान में बंदी बने रहने से स्पष्टतः इन्कार कर दिया। १९ वी० रेजीमेंट के समान ही ३४ वी० रेजीमेंट ने कंपनी सरकार की सेना से निष्कासित हो जाने को श्रेयस्कर माना। इस रेजीमेंट को प्रत्येक देशभक्त सैनिक की यही ईच्छा थी कि यह रेजीमेंट भी तोड़ दी गई तो नितांत शुभकार्य होगा किन्तु नीतिज्ञ और विचारवान नेताओं ने उन्हें एक माह तक धैर्य धारण करने का परामर्श दिया

ताकि सहयोगियों से आवश्यक परामर्श किया जा सके। बैरकपुर से विभिन्न स्थानों पर स्थित रेजीमेंटों को पत्र भी भेजे गये, जिसमें क्रांति की शुभघड़ी का निर्धारण करने के संबंध में परामर्श मांगा गया। किन्तु इधर "मंगल पांडे का खड़्ग तो अपनी धैर्य की सीमा तोड़ चुका था।" (उपर्युक्त पृष्ठ - १०७)

एक बात मैं स्पष्ट करूँगा कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की लहर 'वाइसराय लार्ड कर्जन' के जमाने में जोर पकड़ रही थी। क्रांतिकारियों के गुट में नानासाहब, तांत्या- टोपे, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह आदि थे। क्रांतिकारियों ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार तथा क्रांति के आह्वान के लिए 'कमल का फूल' तथा 'रोटी' को माध्यम बनाया था। यह माध्यम गाँव गाँव में घुमाया जाता था। अंग्रेजी फौज के भारतीय सैनिकों में विद्रोही भावनायें छाने के लिए यह बात स्पष्ट की गई की बन्दूक के कारतूसों में "गाय और सुअर" की चर्बी है जिसे सचमुच मुँह से लगाकर खींचना पड़ता है। तय किया गया था कि क्रांति का विस्फोट विभिन्न सथानों पर ३१ मई १८५७ को किया जायेगा, लेकिन 'मंगल पांडेय' ने २८ मार्च को ही रणभेदी बजा दी।

मंगल पांडेय की भूमिका– जैसा कि स्पष्ट है कि मंगल पांडेय ३४ वी० रेजमेंट की ५ वी० कंपनी के सैनिक नं०- १४४६ थे। एक रात नाइट डयुटी के वक्त पांडे ने अपने अंग्रेजी अफसर से कहा - "सर अंग्रेजी सेना के रहने के लिए बैरक और हम हिन्दुस्तानियों के लिए तम्बू क्यों ? खाने पीने की व्यवस्था अंग्रेजी सिपाहियों की हमलोगों से अच्छी क्यों है ? जब कि हम एक ही सरकार के आदमी है। उस अफसर ने 'मंगल' को डपटते हुए कहा– "ब्लाडी तुमलोग काला आदमी हो। तुमलोगों को वहीं ठीक है"। दोनों में टकरार बढ़ी और 'मंगल' ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। 'मंगल पांडे' को २८ दिन की सजा सुना दी गई। इसी दौरान एक दिन 'बाघ' नाम के एक अफसर ने 'मंगल पांडे' की कमर में रस्सी बांधी और उसे 'पिठ्ठु' (एक प्रकार सेना दंड)लादकर रस्सी हाथ में पकड़े घोड़े पर सवार हो गया। अफसर की तलवार खींचकर उसे मारना चाहा। एक हिन्दुस्तानी अफसर ने पांडे का हाथ पकड़ लिया।

हिन्दुस्तानी अफसर के इस कृत्य नें आग में घी डालने का काम किया। 'मंगल' पागल सा हो गया। उसने कई सिपाहियों की बन्दूकें छीनकर उन्हें घायल कर दिया और कई अफसरों को मारा। लेफ्टिनेंट बाघ, कर्नल व्हीलर, शेख पल्टू आदि उसका निशाना बने। कई सैनिकों ने मिलकर 'पांडे' को पकड़ा



মঙ্গল পাণ্ডে
জয়পুর মিউজিয়ামে রক্ষিত এই ছবিটি এঁকেছেন 'PIM-JEE'। এই ছবিটিকে মঙ্গল পাণ্ডের প্রকৃত ছবি বলে দাবি করা হয়। 'ধরমযুগ' (সাপ্তাহিক হিন্দি) পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিতহয়। কৈলাশ বারাকপুরী'র সূত্রে প্রাপ্ত।

उसे पीटा और घायलावस्था में के बैरकपुर के 'बेस हास्पीटल' में भर्ती कर दिया। ४ अप्रैल १८५७ को 'मंगल पांडेय' का कोर्ट मार्शल हुआ। कलकत्ते के फोर्ट विलियम में सूबेदार मेजर जवाहरलाल तिवारी की अध्यक्षता में १४ भारतीय अफसरों की एक अदालत बैठी। डिप्टी जज एडवोकेट कैप्टेन हेज ने मुकदमें की दलीलें पेश की। राष्ट्रद्रोह का अभियोग लगाया गया और मंगल पांडेय को फांसी की सजा सुना दी गई। ८ अप्रैल १८५७ को बैरकपुर के 'लाट बगान' में एक बरगद के पेड़ से लटका कर फांसी दे दी गई।

कई विद्वानों ने 'मंगल पांडेय' की जीवनी पर प्रकाश डाला है। इसमें "दुर्गा प्रसाद गुप्त" द्वारा लिखित वर्णन अधिक मान्यता प्राप्त है। 'गुप्त' जी के अनुसार 'पांडे' का जन्म उत्तर प्रदेश के ग्राम 'नगवा' में १९ दिसम्बर १८३६ में हुआ। इनके पिता का नाम 'जगन्नाथ पांडेय' तथा दादा का नाम शिवनारायण पांडे था। मंगल पांडे के वंशज अभी भी नगवा में है। 'मंगल पांडेय' की याद में बैरकपुर स्थित पश्चिम बंगाल पुलिस ट्रेनिंग का नाम 'लाट बगान' से बदलकर 'मंगल पांडे उदयान' हो गया है। यहाँ बैरकपुर में 'मंगल पांडेय पार्क, मंगल पांडेय सरणी, मंगल पांडे विद्यालय, मंगल पांडे चौक (प्रस्तावित चिड़िया) आदि को बनाया गया है।

लेखक परिचिति : पगकार, गीतकार एवं कवि है

अरदली बाजार

हरि प्रसाद साव

अर्डर्ली 'अंग्रेजी शब्द है' अर्डर्ली का अर्थ हुक्म को पालन करने वाला आज्ञाकारी। 'अर्डर से अर्डर्ली' पाने की अर्डर को वहन करने वाला।

१७५७ युद्ध के बाद जब अंग्रेज दक्खिन की ओर सुतानाटी गाँव जाने के लिए १०० कि०मी० चले तो थक कर इसी बैरकपुर के गंगा नदी के किनारे पड़ाव डाल दियें। यहाँ के जलमार्ग, वन के दृश्य उन्हें बहुत लुभाया। कारण यातायात के लिए गंगा नदी, फल-फूलों से भरे वन, बड़े बड़े शागौन के विशाल वृक्ष, हरिली की सुन्दरता को देखकर ब्रिटिशगण मुग्ध होकर अपना कैम्प डाले। यहीं कैम्पों में सैनिक रहने लगे।

उस समय फूस और बाँस से घर बनते थे। अब वही बड़ा सा घर लाट साहेब का घर है। जो अब भी गंगा के किनारे है। घर बनाना, कैम्प बनाने के लिए कुछ स्थानीय लोगों को रखा गया। बैरक में काम करने के लिए, नाई, धोबी, ववर्ची, वेहरा (अर्दली) वगैरह भर्ती कियें गयें।

इसी बैरक के पूर्व ओर काले लोगों के रहने के लिए (भारतीयों को अंग्रेज, ब्लाकमैन कहकर पुकारते थे) आठ-दस फूस के घर बनाये गये। जिसमें केवल सरकारी कर्मचारी ही रहते और इनके यहाँ काम करते थे। अब भी वे घर फालवर लाईन नाम से जाने जाने हैं। जिसमे केवल सरकारी कर्मचारी ही रहते हैं।

दिवस बीते, वर्ष बीते देखते ही देखते यह छोटासा गाँव अर्डली बाजार बन गया। पुलिस तथा सेना में नौकरी के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ आकर बस गयें।

अर्डर्ली में सप्ताह में दो बार सोमवार और शुक्रवार को हाट लगते थे। दूर-दूर गाँव के लोग यहाँ पर आकर मिट्टी का तेल, नमक, मसाले और कपड़े खरीदते थे। उस समय का अर्डर्ली बाजार छोटे-छोटे छप्परों के घर का था। अब पक्के मकान दो-तीन तल्ले के हैं। एक ईसाई सम्प्रदाय का दो तल्ला खुबसुरत मकान 'रेमण्डटावर' नाम से है। जनसंख्या लगभग छः हजार तक

है। आठ-दस बंगाली परिवार यहाँ स्थायी रूप से बास करते हैं। ईसाई, मद्रासी, यहाँ बसे हैं । एक चौथाई मुसलमान हैं। एक कृष्णा मंदिर, एक शिवालय एवं दो मषिजदें यहाँ हैं। देश के आजादी के बाद अब यहाँ तीन प्राईमरी स्कूलें हैं। लेकिन यहां कोई चिकित्सालय न होने से जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अर्डर्ली बाजार के उत्तर में हवाई जहाज मरम्मत करने का हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स कारखाना, एरोड्राम, और एयरफोर्स कैंप है।

लेखक परिचिति : बिशिष्ट कवि

पहली गोली बिन्दी तिवारी ने चालाई थी

गत पहली जनवरी बैरकपुर के भगत सिंह पार्क में एक मासिक पत्रिका 'सामाजिक न्याय समाचार' के लोकार्पण के वक्त बैरकपुर छावनी के अध्यक्ष माननीय ब्रिगेडियर एस. चौधरी जी ने, जहां मुख्यातिथि भारतीय भाषा परिषद के डॉं. प्रभाकर श्रोत्रिय जी भी मौजूद थे, सभी को यह कहकर चौंका दिया कि १८५७ के मंगल पांडेय के पहले इसी बैरकपुर में बिंदी तिवारी ने १८२५ में आजादी के लिये पहली गोली चलाई। वो थी (तिवारी) बैरकपुर छावनी के एक फौजी (सिपाही) थे। वैसे बैरकपुर स्थित 'रेसकोर्स' के पास बिंदा बाबा का अभी भी मंदिर है जौ विंदी तिवारी थे, जहां स्थाई रूप से पुजारी नियुक्त है। उस मंदिर से संलग्न एक बजरंगबली का भी मंदिर है।

मैने ब्रिंगडियर एस. चौधरी से मिलकर साक्षात्कार के जरिये पूरी कथा सरकारी दस्तावेज के अनुसार सुनी और टेप रिकार्डर में टेप किया ताकि कोइ भी शब्द या प्रसंग छूट ना जाये और लिख डाला। बात १८२४ की है। उस वक्त बैरकपुर में तीन नेटिव इनफेंट्री की बटालियन इंडियन ग्रुप के नाम से जानी जाती थी। सारी फौज ईस्ट यू.पी. और बिहार की थी, जिसमें अधिकतर संख्या ब्राह्मणों की थी। इसके बाद राजपूत भी कुछ थे और कुछ मुस्लिम भी थे।

१३/१०/१८२४ को तीनों इनफेंट्री को जिन्हें कोर कहा जाता था, को आदेश दिया गया कि सभी को 'चिटगांव' मार्च करना है। उस समय फौजियों के दिमाग में एक बात यह थी कि उनकी कुछ प्रथानुसार जैसे वे 'ब्रह्मपुत्र' नदी के उस पार जायेंगे तो उनका धर्म नष्ट हो जायेगा। वो लोग ये मांग कर बैठे कि अगर हमें जाना ही पड़ेगा तो हमलोगों को बैल और वैलगाड़ियां मुहैया

करायी जाये, क्योंकि उन दिनों फौजियों को बैल और बौलगाड़ियां खरीदनी पड़ती थीं। उन्होनें यह भी मांग की कि हमारा 'नैकसाथ' (पीठ पर लादने वाला थैला) जिनके लिये उनकी तनख्वाह से दो रूपये के हिसाब से काटा गया था (उन दिनों दो रूपये एक मायने रखता था) उन्हें तथा नैकसाथ सरकारी खर्चे से मिलना चाहिए। अंग्रेज इन हिन्दुस्तानी सिपाहियों के प्रति इतने लापरवाह रहते थे कि उनकी छोटी-छोटी लापरवाही सैनिकों की विद्रोह पर ले आई और अंग्रेज आदत के मुताबिक आदेश पर आदेश दिये जा रहे थे। ये फौजी उन आदेशों को मानने से इनकार कर रहे थे, इनमें सक्रिय भूमिका ४७ नेटिव इनफेंट्री की थी और उनमें एक सिपाी था 'बिंदी तिवारी।' उन्होंने यह कह दिया कि हमलोग १३ नहीं २३ अक्टूबर को जायेंगे तो उनके कमांडिंग अफसर ने उन्हें ४०००/- (चार हजार) रूपये बैल और बैलगाड़ी खरीदने के लिये दिये, लेकिन दूसरा सावाल यह उठा कि बैलगाड़ी चलाने वाला भी होना चाहिए? अपनी मांग पूरी न होने के वजह से इनलोगों ने जाने से इनकार कर दिया। यह सब अंग्रेजों के लापरवाही के कारण हुआ। ऐसी हालत में गवर्नर (राज्यपाल) उन दिनों बैरकपुर के गवर्नर हाउस में रहते थे। यह गवर्नर हाउस बैरकपुर में आज भी है और आज के गवर्नर (पश्चिम बंगाल के) भी कभी कभी आकर थोड़ी देर के लिये रहते हैं। ये सारी बातें गवर्नर के कान नें गयी, तो उन्होने कमांडर इन चीफ मेजर जनरल डालवेल को समस्याओं से निपटने के लिये कहा। इधर इन तीनों बटालियनों ने ३०/१०/१८२४ को जाने से बिलकुल इनकार कर दिया तो खलबली मंच गयी। डालवेल ने दमदम जहां इनका तोपखाना था, से तोपखाना बटालियन मंगा ली और कलकत्ता से एक बटालियन जो पलता जा रही थी, बुला लिया गया और भी एक बटालियन बुला ली गयी। उन्हें बैरकपुर लाट बगान में रखा गया राजभवन के पास और बांकी फौजें बैरकपुर बेस अस्पताल के पास रखी गयी। तोपखाना अरदली बाजार के पास एयरफोर्स के सामने रखा गया। तब अचानक हुआ यह कि उसी तोपखाने से एकाएक फायर होना शुरू हो गया। इस समय वहां के अफसर तो थे ही नहीं, क्योंकि अफसर विद्रोहियों के डर से इधर उधर भाग गये थे और इस तरह तोपखाने के हमले से बाहर से आई फौजें भागने लगीं। कुछ सैनिक तो पास के हुगली नदी में भागते हुए डूबकर मर गये।

कुछ ही दिन बाद अंग्रेजों ने इस विद्रोह के लिये इनके विरूद्ध 'कोर्ट मार्शल' विठा दिया। बारह विद्रोही सैनिकों को फांसी का आदेश दिया गया और बाकी को जेल की सजा हुई। बाद में दो साल बाद जेल वाले कैदियो की सजां माफ

हो गयी और ३/११/१८२४ को उन बारह जनों में एक सिपाही के नाम की गड़बड़ी के बजह से ११ सिपाहियों (हिन्दुस्तानी) को कटघरा बनाकर बैरकपुर पैरेड ग्राउंड में फांसी लगा दी गयी और सबकी लाशें पास के हुगली नदी में फेंक दी गयीं। बाद में उस तोपखाने वाले विद्रोह की अंग्रेजों ने अच्छी तरह तहकीकात की तो उन्हें पता चला कि ३१/१०/१८२४ से १/११/१८२४ तक दो दिनों तक जो चार्ज संभाल रहा था, वह सिर्फ एक प्लेन सिपाही ही था और वह दे दिन का अपनी मर्जानुसार कमांडिंग अफसर बन गया था। उसका नाम था बिंदी तिवारी। यह विद्रोह था। जिस अंग्रेज अफसर ने इस केस की तह तक खोज की उन्होंने रिपोर्ट दी कि ये विद्रोह गलत नहीं था, क्योंकि ३१/१०/१८२४ को विद्रोहियों ने अंग्रेज सरकार को एक पत्र दिया था जिसका सारांश यह है कि 'हमारा जनेऊ (जिन्हें वो तुनुर कहते थे) बहुत पुराना हो गया है, तीन धागों के गंदा होने के बावजूद हम पहनना चाहते हैं।' कहने का तात्पर्य यह था कि आप हमारे धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। पहले तो लफड़ा था 'बैल की सवारी का' दूसरी और हमें तो नाव पर सफर करने को कहा जा रहा था।

३/११/१८२४ को सभी ११ जनों को तो फांसी हो गयी थी। सिर्फ बिन्दी तिवारी भाग गये थे। अंग्रेजों ने यह घोषणा कर दी कि जो उस भागे सिपाही को पकड़ेगा उसे सरकार की ओर से १० (दस) रूपये इनाम मिलेगा। (उन दिनों दस रूपये की एक अलग हैसियत होती थी)। उसी बीच ७/११/१८२४ को रात के वक्त बिंदी तिवारी अपने एक साथी से मिलने आया। किसी ने यह भेद जाहिर कर दिया। और बिंदी तिवारी पकड़े गये। उससे पूछा गया कि अपने दो दिन तक कमांड का भार संभाला था। तिवारी जी ने हां कहकर स्विकार किया। सभी को तो मामूली फांसी हुई थी, लेकिन बिंदी तिवारी को जंजोरों में जकड़ कर फांसी लगायी और बाकी बागियों को नसीहत देने के लिए फांसी का कटघरा पूरा का पूरा उखाड़कर लाश सहित, जहां फिलहाल बिन्दी तिवारी उर्फ बिन्दा बाबा का मंदिर है वहां सामने रास्ते पर लगा दिया गया। रिकार्ड के अनुसार दो महीने तक उनकी लाश चील कैवे खाते रहे।

इसी बीच भारतीय सिपाहियों ने उन्दें शहीद घोषित कर दिया। रात को चुपके चुपके वे सिपाही वहां फूल, माला आदि रख आते थे, कभी कभी अगरबत्ती वगैरह भी जला जाते थे,। अंत में अंग्रजों ने देखा कि अब विद्रोह दूसरा रंग ले सकता है, तब झटपट उन्होंने लाश को पास के हुगली नदी में फेंकवा दिया। ये सारी बातें लिखित एवं सरकारी रिकार्ड में है। लेकिन स्थानीय

लोगों में बिंदी तिवारी उर्फ बिंदा बाबा के प्रति एक किंवदंती है कि फांसी के बाद विदाबाबा की आत्मा बहुत महकती रही। अंग्रेजों को भी काफी सताती रही। अंत में यूपी से बिन्दाबाबा की माताजी को बुलाकर जब उनका श्राद्ध वगैरह किया गया, तब जाकर उनकी आत्मा शांत हुई और उसी समय भारतीय फौजियों द्वारा उनकी मंदिर की स्थापना हुई। मूर्ति लगी। यह मंदिर आज भी है, विंदाबाबा पूजे जा रहे हैं। लोगों की वहां मनौतियां भी पूरी होती हैं। कुछ ने तो अपने बच्चे का मुंडन भी वहां उस मंदिर में करा दिया है।

बैरकपुर छावनी का यह पहला विद्रोह था। यह भारतवर्ष में पहला विद्रोह माना जाना चाहिए। क्योंकि बिन्दी तिवारी से मंगल पांडे प्रेरित होकर विद्रोह किये १८५७ में। आज विंदाबाबा का नाम बैरकपुर में ही लोग जानते है। जबकि पूरे हिन्दुस्तान को जानना चाहिए था। यह घटना इतिहास में अविदित ही रह गयी है। बैरकपुर की इसी बलिदानी मिट्टी से १८५७ की ज्वलायें धधकीं। मंगल पांडे पैदा हुए। बैरकपुर में ही राष्ट्रगुरू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी जन्मे, बैरकपुर सबडिवीजन में बंदेमातरम् के रचयिता बंकिम चंद्र बाबू का जन्म हुआ। इससे प्रेरित होकर पूरे भारतवर्ष में एक से बढ़कर एक शहीद पैदा हुए और हंस हंस कर फांसी पर झूले। अंत में १५ अगस्त १९४७ को हम आजाद हो गये और क्रांतिकारियों और पूरे देशभक्त सपूतों के लिये बैरकपुर बन्दनीय बन गया।

कैलाश बैरकपुरी

Courtesy–विश्वमित्र २६ जनवरी १९९७

নেহরু ক্যানসার সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড কেয়ার

লালকুঠি বাস স্ট্যান্ড থেকে পশ্চিমে হাঁটাপথে মিনিট তিনিকের পথ। ডানদিকে বিশাল ভবন—এটাই "নেহেরু ক্যানসার সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড কিয়ার"। ১৯৫৯ সালের ২৫ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় এই "চেস্ট ক্লিনিকের" ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

পরে ১৯৬৩ সালের ২ জুলাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এর উদ্বোধন করেন। কিছুকাল চলবার পর বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৯৪ সালের ১লা অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এসে পুনরায় চালু করেন। ১৯৯৭ এসেছিলেন রাজ্যপাল রঘুনাথ রেড্ডি ''আলট্রাসোনোগ্রাফি' বিভাগের উদ্‌ঘাটন করে দিয়ে যান।

তথ্য : প্রলয় ভট্টাচার্য

বারাকপুর জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্সটিটিউটের আরম্ভ কথা

—— তারাশংকর ঘোষ

ইতিবৃত্ত

কোন যুগে, কবে থেকে বাংলায় পাট চাষ শুরু হয়েছে, তা সঠিক নিরূপিত হয়নি। কবিকঙ্কন চণ্ডী লেখার কাল ১৫৭৫ বা কাছাকাছি; তাতে চট ও চটের থলির উল্লেখ আছে। আইন-ই-আকবরীতে (১৫৯০) তথ্য আছে যে বর্তমান রংপুর জেলায় সেকালে পাট থেকে চট ও থলি তৈরি হতো এবং বাংলার বাইরে রপ্তানী হতো। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পট্টবস্ত্রের উল্লেখ আছে; কিন্তু পট্টবস্ত্র পাট থেকে কি না, সে বিষয়ে পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট মতভেদ। প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার-এর মতামত মূল্যবান; তাঁর মতামতের সারকথা পাঠক-পাঠিকা পাবেন 'জুট ইন ইন্ডিয়া' নামক সংকলনে; সঙ্কলকত্রয়—বি সি কুণ্ডু, কে সি বসাক ও পি বি সরকার। এঁরা নিজ নিজ গবেষণার ক্ষেত্রে যশস্বী। সিল্ক বা সিল্ক জাতীয় যে কোনও উজ্জ্বল বস্ত্রকেই 'পট্টবস্ত্র' বলা হতো; এটাই তাঁদের বক্তব্য।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রিষড়ায় ভারতের প্রথম পাটকল স্থাপিত হলো। ১৭৪০কে যদি ধরি চেষ্টার শুরু, তবে ১৮৫৪কে ধরা যায় লক্ষ্মীলাভের আরম্ভ; এই দীর্ঘ সময়ে ইংরেজরা বহু বাঙালি ও ভারতীয়দের সাহায্য পেয়েছেন; তাঁদের অবদান সম্পর্কে কিছুই এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। ১৮৫৪ থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত পাটশিল্পের অনেক টানাপোড়েন চলেছে; অবশেষে জয়যাত্রা শুরু। ১৯৪৭-এর মধ্যে কলকাতার আশেপাশে ভাগিরথীর দু'ধারে পাটকলের সংখ্যা হলো ১০৮টি।

আঠারশ সত্তর সাল বা তার কিছু আগে থেকেই মিলমালিকরা দেখলেন, যে

লিনবিথগো; উনি ছিলেন রয়াল কমিশনের সদস্য। এসেই খোঁজ করলেন ইন্ডিয়ান সেনটরাল জুট কমিটি গঠনের কী হলো! সাজসাজরব উঠলো; তড়িঘড়ি ১৯৩৬ সালে 'আই সি জে সি' গঠিত হলো। সদস্য হলেন শ্রমিক ও কৃষকদের দু'জন প্রতিনিধি, মনোনীত বিজ্ঞানী, আই জে এম এ-এর একাধিক প্রতিনিধি, ভারত সরকারের মনোনীত পদস্থ কর্মচারী একজন। কমিটির চেয়ারম্যান হলেন পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় কৃষি বিভাগের এডিশনাল সেক্রেটারী; ভাইস চেয়ারম্যান হতেন আই জে এম এ—এর একজন—প্রায়শঃই ইংরেজ বা স্কট। কমিটির অফিস হলো ৪ নম্বর হেস্টিংস স্ট্রিট (এখন কিরণ শঙ্কর রায় রোড)। কমিটির সেক্রেটারী হলেন একজন আই সি এস-এর সদস্য।

জুট কমিটি টালিগঞ্জে স্থাপন করলেন জুট টেকনলজিকাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী; উদ্দেশ্য : পাট বয়ন শিল্পের উত্তরোত্তর উন্নতিসাধন। হেস্টিংস স্ট্রিটেই স্থাপিত হলো মার্কেটিং ও ইকনমিকস সম্পর্কে গবেষণার সংস্থা। ১৯৩৯ সালে ঢাকা শহরের উপকণ্ঠ তেজগাঁয় জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী গঠিত হলো এবং প্রথম ডিরেকটর হলেন জে এস প্যাটেল। ফিনলো এবং এন সি বসু যেখানে শেষ করেছিলেন, প্যাটেল সেখান থেকে শুরু করলেন। প্রথমেই তিনি পূর্বসূরীদের কাজের একটি অনবদ্য রিভিউ করলেন রবার্ট লালমোহন ঘোষ-এর যুগ্ম প্রচেষ্টায়। প্যাটেল ১৯৪৫-এ চলে গেলে ১৯৪৬-এ ডিরেক্টর হন বি সি কুণ্ডু। ১৯৪৭-এর আগস্ট মাসে দেশভাগ হয়ে গেল, হলো ভারত ও পাকিস্তান। আই সি জে সি ঢাকার ল্যাবরেটরী ও গবেষণার দায়দায়িত্ব পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত করলেন। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৭-এর মধ্যে জুট কমিটির আমলে জে এ আর এল-এ যে কাজ হয়েছিল পরবর্তী পরিচ্ছদগুলিতে তার সারাংশ রয়েছে। ঐ সময়ে রবার্ট লালমোহন ঘোষ ছিলেন প্রজাতি উন্নয়ন বিভাগের নেতৃত্বে; সহকর্মী ছিলেন বিধুভূষণ দাশগুপ্ত, আশুতোষ সান্ন্যাল ও শান্তিজীবন ঘোষ। তাঁদের প্রচেষ্টায় তিনটি অতিপ্রসূ তোষা ও তিনটি গুটিপাট প্রজাতি সৃষ্টির কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়ে এসেছিল— এমন সময় দেশবিভাগ হয়ে গেল। বিষাদ ও অনিশ্চয়তায় সকলের মন ভারাক্রান্ত। অধিকাংশ বিজ্ঞানী ডিসেম্বর ১৯৪৭-এর মধ্যে ভারতে চলে গেলেন বিভিন্ন সংস্থায়; অসমাপ্ত কাজ শুরু হলো পশ্চিমবঙ্গের চুঁচুড়ার ধান্য গবেষণা কেন্দ্রে; অস্থায়ী গবেষণাগার স্থাপিত হলো হুগলী শহরের 'রাইকস হাউস'-এ। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পাটকৃষি গবেষণা থেমে না থাকলেও ভবিষ্যৎ ছিল কুয়াশায় ঢাকা অনিশ্চিত। সেই অনিশ্চিত অবস্থা কাটিয়ে তদানীন্তন ডিরেক্টর বি সি কুণ্ডুর অক্লান্ত চেষ্টায় ১৯৫৩ সালে বারাকপুরের সন্নিকটে নীলগঞ্জে পুনর্গঠিত হলো জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট। এ কাজে তিনি যাঁদের সহায়তা পেয়েছিলেন তাঁরা হলেন বিধানচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা ও সর্দার বাহাদুর দাতার সিংহ।

সৌজন্য : পাট কৃষি গবেষণা ও প্রয়োগ

সদরবাজারের রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব

বারাকপুর সদরবাজার গোলামহল এলাকার শ্রীমতি সীমা দাশগুপ্তকে শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য মাননীয় রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণন ১৯৯৬ খ্রীঃ সি সি আর টি শিক্ষক পুরস্কার প্রদান করেন। তিনি কাঁচড়াপাড়া কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত।

রাষ্ট্রগুরুর বসতবাড়িতে ফলক



৬ অগস্ট ২০০০ মণিরামপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বাসভবনে একটি স্মৃতি-ফলকের আবরণ উন্মোচন করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাননীয় শ্রী প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি মেমোরিয়াল কমিটির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ড. ফুলরেণু গুহ, সাংসদ শ্রী তড়িৎবরণ তোপদার, শ্রী মদনমোহন নাথ (মেমোরিয়াল কমিটির সভাপতি), উত্তর বারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান শ্রী মধুসূদন ঘোষ, শ্রী সমরেন্দ্র মোহন সান্যাল (কমিটির সহ-সভাপতি), শ্রী শিবধন মুখার্জি (কমিটির সহ-সভাপতি) এবং মহাদেবানন্দ কলেজের অধ্যক্ষ ড. দীপক সেনগুপ্ত, অধ্যাপক সুপ্রিয় মুন্সী (সহ-সভাপতি), কেদারনাথ মুখার্জি, সন্তোষ দত্ত, স্বপ্না চ্যাটার্জি, রোটারিয়ান শেখর ব্যানার্জি, স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং কানাইপদ রায় (মেমোরিয়াল কমিটির সম্পাদক)।



মিস্ত্রীঘাট সন্দলপুর দরগা

বারাকপুর পুরসভা

বারাকপুর পুরসভা গঠিত হয় ১৯১৬ খ্রীঃ ১ এপ্রিল। এর আগে উত্তর বারাকপুর ও দক্ষিণ বারাকপুর এই দুটি পৌরসভা ১৮৬৯ খ্রীঃ গঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে দক্ষিণ বারাকপুর পুরসভা ভেঙে টিটাগড়, খড়দহ ও পানিপাটি পুরসভার সৃষ্টি হয়। এর প্রথম পুরপ্রধান ছিলেন সৈয়দ আহম্মদ (তথ্য তিমিরবরণ বিশ্বাস)। বর্তমান পুরপ্রধান সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৯১ সালে লোকগণনা অনুযায়ী বারাকপুর পুরসভার লোকসংখ্যা

(Includes Institutional and Houseless Population)

(Barrackpur)	মোট	পুরুষ	মহিলা	তঃ জাঃ		তঃ উঃ	
				পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
Ward 1	9,893	5000	4893	1303	1249	67	64
Ward 2	6,289	3243	3046	67	64	27	28
Ward 3	6490	3317	3173	169	151	51	47
Ward 4	7039	3592	3447	229	206	...	...
Ward 5	5960	3156	2804	133	109	...	...
Ward 6	1703	857	846	51	53	1	1
Ward 7	12,102	6172	5930	300	276	...	...
Ward 8	10610	5480	5134	251	224	275	246
Ward 9	6738	3439	3299	146	140	11	9
Ward 10	6988	3995	3393	207	203	48	51
Ward 11	5332	2904	2428	31	30	...	..
Ward 12	6047	3156	2891	217	196	...	...
Ward 13	13,139	6498	6641	356	265	67	75
Ward 14	4480	2337	2143	203	166	...	...
Ward 15	6482	3987	2495	286	213	36	2
Ward 16	5808	3042	2776	122	89	2	3
Ward 17	3850	2110	1740	76	59	3	4
Ward 18	9883	5882	4001	907	742	49	33
Ward 19	4428	2369	2059	99	95	34	32
Total	133265	70136	63129	5153	4537	671	585
Jafarpur (O.G.)	9292	.4827	4465	647	632	157	114

Courtesy : District Census Handbook–Census of India 1991

2000-2001 আদমসুমারী অনুযায়ী বারাকপুর পুরসভার লোকসংখ্যা

Ward No	Total Population	Male	Female
1	4432	2234	2198
2	6656	3356	3300
3	7051	3684	3367
4	6844	3413	3431
5	7849	3987	3862
6	5367	2766	2601
7	6584	3320	3264
8	8520	4348	4172
9	1777	896	881
10	4907	2472	2435
11	8010	4106	3904
12	5919	2991	2928
13	4478	2453	2025
14	5288	2728	2560
15	3749	1909	1840
16	3489	1819	1670
17	8509	4382	4127
18	8235	4530	3705
19	3273	1685	1588
20	8283	4832	3451
21	9625	6228	3397
22	4905	2532	2373
23	4291	2304	1987
24	6370	3291	3079
	144411		



তথ্য : বারাকপুর পুরসভা

সুকান্ত সদন

"বারাকপুর স্টেশন সংলগ্ন এই জমিটি ব্যবহার হত পূর্তদপ্তরের মালপত্র রাখার স্থান হিসাবে। পুরসভা এই জমিটির পরিবর্তে পশ্চিম বারাসাত রোড সংলগ্ন রাস্তার দু'পাশে ফাঁকা জমি বিনিময় করে। এই বিনিময়ের বিষয়ে তৎকালীন পরিবহন মন্ত্রী মহঃ আমিন ও বর্তমান সাংসদ তড়িৎবরণ তোপদারের ভুমিকা উল্লেখযোগ্য।... বারাকপুরের সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন ও প্রত্যাশা নিয়ে অবশেষে ১৯৮৬ সালের মে মাসে বারাকপুর টাউন হলের কাজ শুরু হল। শহরের বিভিন্ন সংগঠন, ক্লাব, রাজনৈতিক দল ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে পুরসভার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হল— অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বারাকপুর পুরসভা এই কাজ সম্পূর্ণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।" (তথ্যসূত্র : বিজলী মিত্র— সুকান্ত সদনের দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্মরণিকা, ৯.২.১৯৯২।)

৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ বারাকপুর তথা গোটা রাজ্যের মানুষের হাতে স্থাপত্য সৌন্দর্যে অনবদ্য এই সদনটিকে উৎসর্গ করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু।



সুকান্ত সদন, বারাকপুর। ছবি : অরুণ দাস।

পঞ্চম অধ্যায়

নোনা-চন্দনপুকুর, তালপুকুর এবং কালিয়ানিবাসের কথা

নোনা-চন্দনপুকুরের কথা

প্রলয় ভট্টাচার্য

বারাকপুর-বারাসাত সড়কের দু'পাশের জনবসতির নামই নোনা-চন্দনপুকুর। দুটো মৌজা নিয়ে একটা গ্রাম নাম। নোনা মৌজা, চন্দনপুকুর মৌজা। মসজিদ মোড়ের উত্তরে চলেছে শিবতলা রাস্তা। শিবমন্দির-উত্তমচন্দ্র প্রাথমিক স্কুল থেকে ভট্টাচার্যপাড়া কালিয়ানিবাস পর্যন্ত 'চন্দনপুকুর' মৌজা। শিবতলা মন্দির অঞ্চল পূর্ব কোণ থেকে জাফরপুর কল্যাণী সড়কের আগে অবধি 'নোনা' মৌজা। গ্রামটার থানা টিটাগড়।

এখানকার গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের পূর্বপুরুষ স্বপ্নাদেশে শিবলিঙ্গ পান জোলপুকুর থেকে— এটাই জনশ্রুতি। তাঁরাই এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের পাশেই শিবতলা বারোয়ারি পুজো মণ্ডপ। এই বারোয়ারি দুর্গোৎসবই (১৯১৪) নোনা-চন্দনপুকুর গ্রামের সবচাইতে পুরানো পুজো। এছাড়াও নোনা বারোয়ারির দুর্গাপুজো বেশ প্রাচীন। এই অঞ্চলে কুমোরপাড়া না থাকায় গঙ্গার ওপার থেকে প্রতিমা আনা হত। বৈদ্যবাটীর কাছে চাতরা থেকে নৌকো প্রতিমা নিয়ে আসত মণিরামপুরে; পরে ওড়িয়া ডুলিরা কাঁধে করে প্রতিমা আনতেন নির্দিষ্ট পুজো প্যান্ডেলে। তখন শোনা যেত ১৬ নম্বর রেলগেটের কাছে সরকার বাড়িতে বেশ ধুমধাম করে শারদ উৎসব পালিত হয়। এই গ্রামের সবচাইতে পুরানো পাঠাগার 'সান্ধ্যসমিতি' (১৯৪২)। বিনোদবিহারী ঘোষের আর্থিক আনুকুল্যে ও জমি দানে এই পাঠাগার প্রতিষ্ঠা হয়। মূল ভবনের নাম "বিনোদ স্মৃতি"।

নোনা-চন্দনপুকুরের অধিবাসীরা বাজার করতে যেতেন তালপুকুর বাজারে, নীলগঞ্জ হাটে, আর্দালীবাজার হাটে। ১৯৪৮ সালে পূর্ববঙ্গের মানুষ এ বঙ্গে আসতে থাকল তখন মানুষের চাহিদা মেনে সাধুখাঁরা বাজার বসালেন নোনাচন্দনপুকুরে। এখন এই বাজার বারাকপুর পুরসভার অধীনে। এই অঞ্চলের ডাকঘর ছিল একটিই—বারাকপুর রেলওয়ে স্টেশনে। পরে নোনা-চন্দনপুকুরে ডাকঘর তৈরি হয়।

দেশভাগ হবার পর ব্যাঙ্ক হয়। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের শাখা রয়েছে এখানে। মন্ডপ প্রতিষ্ঠা, পুজো পরিচালনা, শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী পুরুষ ছিলেন মন্মথনাথ সাধুখাঁ। তিনি তাঁর পিতার স্মৃতিরক্ষায় গড়ে তুলেছিলেন উত্তমচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মন্মথনাথের পুত্র গোপালচন্দ্র

সাধুখাঁ তাঁর পিতার স্মৃতিতে তৈরি করলেন মন্মথনাথ উচ্চবিদ্যালয়। আগে এখানকার ছেলেরা পড়তে যেত এবি মডেল হাইস্কুল, বারাকপুর রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়, দেবীপ্রসাদ উচ্চবিদ্যালয়ে। কিছু ছাত্রী তারা পড়ত বারাকপুর গার্লসে। পরে অনেক বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। মন্মথনাথ গার্লস, জাফরপুর বিদ্যার্থী ভবন, চড়কতলা গার্লস। এছাড়াও আছে অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়। আশা অমিয়, নোনা বারোয়ারি, সত্যেন বসু, সুভাষ বিদ্যাপীঠ, নিরঞ্জন নগর প্রাথমিক, কালিয়ানিবাস প্রাথমিক, নবারুণ প্রভৃতি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৩৯-৪৫) এখানকার লালকুঠি, উত্তমচন্দ্র প্রাথমিক, শিবতলা খেলাঘর, পঞ্চু সাধুখাঁর বাড়ি ব্রিটিশ সৈনিকরা অধিগ্রহণ করে। ১৯৪৬এ ছেড়ে যায়। ১৯৪৭ পর্যন্ত প্রচুর পুকুর, জলাজমি, ধানমাঠে ভরা ছিল নোনা-চন্দনপুকুর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এয়ার রেইড প্রিকোশান (A.R.P) সংস্থা মানুষের সেবাকার্যে তৈরি হয়েছিল; যাকে রঙ্গ করে বলা হত—'এলো রে পালা'। এ আর পি সংগঠনের স্রষ্টা ছিলেন কানাইলাল মুখোপাধ্যায়। 'সান্ধ্যসমিতি' প্রতিষ্ঠায় এঁর অবদান উল্লেখ্য। কানাইলাল মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিল ইছাপুর ব্রাহ্মণ পাড়ায়। এতদ্বঞ্চলে কমিউনিস্ট আন্দোলন ভাবধারায় যুবকদের প্রাণিত করেন এই কানাইলাল মুখুজ্জ্যে। 'সেবক সংঘ' নামে অন্য একটি সংস্থাও গড়ে উঠেছিল, এখন তার কোন অস্তিত্ব নেই। এ আর পি-র অফিস ঘর হয়েছিল নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। এখানকার ডাঃ নরেন বাগচী সামাজিক হিতকর্মে উৎসাহী ছিলেন। তিনি বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে এম এল সি (MLC) ছিলেন।

ভারতবর্ষের সংসদ সদস্য (M.P) তড়িৎবরণ তোপদার নোনা-চন্দনপুকুরেরই বাসিন্দা। শিক্ষক (মন্মথনাথ উচ্চ-বিদ্যালয়) এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁর চিন্তাধারাকে তিনি রাজনৈতিক জীবনেও মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন।



শিবতলা মন্দির অঞ্চল ছবি : রঘুনন্দন দে

উত্তমচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়



১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২ জানুয়ারি এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। নোনা-চন্দনপুকুর এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের পথিকৃৎ মন্মথনাথ সাধুখাঁ, তাঁর পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে ছিল 'উত্তম চন্দ্র বিদ্যালয়'। বিদ্যালয়ের অবস্থান ছিল বারাসাত সড়কের পাশেই এখানকার মন্মথনাথ উচ্চবিদ্যালয়ের জায়গায়। পরে স্থানান্তর হয়। শিবতলা মন্দিরের পাশেই দোতলা যে স্কুলবাড়ি দেখা যায় ওইটিই এ অঞ্চলের প্রথম স্কুল।



মন্মথনাথ সাধুখাঁ
সৌজন্য : উত্তমচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয় স্মারকপত্রিকা

বর্তমানে এই বিদ্যালয় সম্পূর্ণ আদর্শ বিদ্যালয়ের রূপ পেয়েছে। পঠন-পাঠনের সঙ্গে খেলাধুলো, নাচ গান অঙ্কন আবৃত্তি, কাগজের কাজ, মাটির কাজ, বাড়ির কাজ, উলের কাজ শেখান হয়। পঞ্চাশের দশকে উত্তমচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতির প্রধান ডা. নরেন্দ্রনাথ বাগচীর প্রচেষ্টায় শিবতলায় বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমি কিনে এই বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। প্রথমে টিনের চালা ছিল। অনেক সহৃদয় ব্যক্তির সহায়তায় গৃহ নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। আজকে ৭৫ বছর পার করেছে এই বিদ্যালয়।

মন্মথনাথ উচ্চবিদ্যালয়

ডা. নরেন্দ্রনাথ বাগচীর নেতৃত্বে উত্তমচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতি ঠিক করল যে, নোনা-চন্দনপুকুর গ্রামে যেভাবে লোকবসতি বেড়ে চলেছে তাতে একটা উচ্চবিদ্যালয়ের বড় প্রয়োজন। ঠিক এসময়ই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। সৈনিকরা উত্তমচন্দ্র বিদ্যালয় অধিগ্রহণ করল। উত্তমচন্দ্র বিদ্যালয় তখন নোনা বারোয়ারি পুজো মন্ডপে স্থানান্তরিত হল। মন্মথনাথ সাধুখাঁর প্রয়াণ ঘটে যায় এরকম একটা অস্থির সময়ে।

১৯৪৭ সালের ১২ অক্টোবর বিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতি স্থির করলেন মন্মথনাথের নামেই উচ্চবিদ্যালয় গঠন করা হবে। মন্মথনাথের সুযোগ্য পুত্র গোপাল চন্দ্র সাধুখাঁর সঙ্গে আলোচনা করে তাঁরই আর্থিক দানে মন্মথনাথ উচ্চবিদ্যালয় গৃহ

নির্মাণের কাজ আরম্ভ হল। সম্পূর্ণ উচ্চবিদ্যালয় পরিচিতিতে ১৯৪৮ এ আত্মপ্রকাশ করল। বারাসাত রোডের নাগালেই নোনাচন্দনপুকুর মন্মথনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের অবস্থান। স্কুলটি দুপুরে শুরু হয়। সকালে এই ভবনেই 'উমাশশী [redacted] হাইস্কুল" চলে (উমাশশী মন্মথনাথেব স্ত্রীর নাম)।

২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষে মন্মথনাথ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৫০০। উচ্চ মাধ্যমিকে কলা-বাণিজ্য-বিজ্ঞান বিভাগ রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে সহশিক্ষা ব্যবস্থা অর্থাৎ কো-এডুকেশন। বিদ্যালয়ের ছুটির তালিকা থেকে জানা গেল মন্মথনাথের জন্মদিন ২৪ এপ্রিল। ওইদিন বিদ্যালয়ে ছুটি। ১৯৯৭ সালে বিদ্যালয় সুবর্ণজয়ন্তীবর্ষ পালন করল।

বারাকপুর গার্লস হাইস্কুল

বারাকপুরে নারীশিক্ষার প্রসারে ১৯৪৬ সালের ১২ অগস্ট এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। যাঁদের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য তাঁরা হলেন নরেন্দ্রনাথ বাগচী, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিচরণ মিত্র, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, অম্বিকা ঘোষ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, গোষ্ঠবিহারী সাধুখাঁ, বিজন কুমার সাধুখাঁ, বঙ্কিম কুমার খান প্রমুখ।

১৯৪৮ সালে এই বিদ্যালয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ১৯৫৮ সালে প্রথম বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণের জন্য সরকারি সাহায্য আসে। ১৯৭৬ সালে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ১৯৮৭ সাল থেকে একাদশ শ্রেণী থেকে "বাণিজ্য" বিভাগ পড়ানো শুরু হয়। উচ্চতর মাধ্যমিক এই বিদ্যালয়ে কলা-বাণিজ্য-বিজ্ঞান তিনটি বিভাগই রয়েছে।

১৯৯৪ সালে এই স্কুলে কম্পিউটার শিক্ষা চালু হয়। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা এই সুযোগ পেয়ে থাকে। ১৯৯৬ সালে বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হয়। ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা ১৭০০, শিক্ষিকা ৪৪জন। একটি বড় পাঠকক্ষসহ লাইব্রেরি ও চারটি ল্যাবরেটরি রয়েছে। স্কুল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয় নিয়মিত, নাম 'শিখা'। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্য শতকরা একশো। সরস্বতী পুজো, বার্ষিক ক্রীড়া, শারদ উৎসব, বৃক্ষরোপণ, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, নিয়ম শৃঙ্খলার সঙ্গেই চলে আসছে। স্কুলটিতে ইন্টারনেট সুবিধাও রয়েছে। প্রধান শিক্ষিকার পদে রয়েছেন শ্রীমতী রীতা সেন।

মন্মথনাথ গার্লস হাইস্কুল

১৯৫৬ সালের ২ জানুয়ারি এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৯৬-৯৭ সালে উচ্চতর মাধ্যমিকে পরিণত হয়। ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রী সংখ্যা ১২৫০। শিক্ষিকা ৩৬ জন। উচ্চমাধ্যমিকে কলা আর বিজ্ঞান বিভাগের পাঠদান হয়। বর্ণময় অনুষ্ঠানের

মধ্যে দিয়ে বিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। ১৯৯৩ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারিণী কৃষ্ণকলি ভট্টাচার্য এ বিদ্যালয়েরই ছাত্রী। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী শ্রীপর্ণা গুহঠাকুরতা। ১৯৮০ সাল থেকে ইছাপুর নর্থল্যান্ড উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে ১৯৯৪ সালে এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করছেন। বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ছাড়াও, পুজোর ছুটির আগে শারদোৎসব পালন বিদ্যালয়ের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

লেখক পরিচিতি : লেখক ও প্যালিনড্রোমিস্ট

অম্বিকা বিমলা আদর্শ বিদ্যালয়

—অমূল্য দাশগুপ্ত, প্রাক্তন শিক্ষক

১৯৩৯ সালের ৩রা এপ্রিল অম্বিকা বিমলা আদর্শ বিদ্যালয় আনন্দপুরীতে স্থাপিত হইয়াছিল, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ঁপ্রফুল্ল কুমার দাশগুপ্ত এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছুদিন আগে প্রফুল্ল কুমার "এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে" হইতে শিক্ষা বিষয়ে ডিপ্লোমা লইয়া ব্যারাকপুরে ফিরিয়া আসেন। তিনি ছিলেন স্থানীয় "কৃষ্ণনাথ মিউনিসিপ্যাল" বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ঐ বিদ্যালয়টি তখনও উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয় নাই। প্রফুল্ল কুমার দাশগুপ্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করেন বিদ্যালয়টিকে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করিবার। কিন্তু যখন তাহার সমস্ত প্রচেষ্টা বিফল হইল, তখনই নিজের পিতা মাতার নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করেন, আনন্দপুরীর ঁসত্যসখা বাবুর দ্বিতল গৃহটি এতৎ উদ্দেশ্যে মাত্র ত্রিশ টাকায় ভাড়া করা হইল, তখন ব্যারাকপুরে শিক্ষার প্রসারের জন্য কেহই আগাইয়া আসেন নাই। একটি মাত্র সরকারি বিদ্যালয় ছাড়া এই অঞ্চলে আর একটিও বিদ্যালয় ছিল না।

আনন্দপুরীর প্রতিষ্ঠাতা ঁতারিণী চরণ ঘোষ মহাশয় প্রফুল্ল বাবুকে সর্বতোভাবে সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসেন। বিদ্যালয় শুরু হইল ১৯৩৯ সালের ৩রা এপ্রিল। (একথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি) যদিও তখন বিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষের প্রথম তিন মাস ষ্ট, তবুও প্রথম দিনেই ষাট জন ছাত্র বিদ্যালয়ে ভর্তি হইল। অতি অল্প মাহিনায় শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। বিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষেই স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় স্থানীয় ঁশ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহ ভাড়া লওয়া হইল।

১৯৪০ সাল অতিক্রান্ত হইল। পশ্চিম দিগন্ত হইতে রণহুঙ্কার শোনা যাইতে লাগিল। কলিকাতা ও ইছাপুর হইতে জাপানী বোমার সংকেত পাওয়া গেল। ভীত ও সন্ত্রস্ত নরনারীরা কলিকাতা ও শহরতলী ছাড়িয়া দূরে পল্লীগ্রামে আশ্রয় লইতে বাধ্য

হইলেন, সরকারি বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া গেল। ছাত্র সংখ্যাও হ্রাস পাইল। অন্যান্য বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হইয়া গেলেও প্রফুল্লবাবু সেই অল্প ছাত্রসংখ্যা লইয়া বিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

১৯৪১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই বিদ্যালয় অনুমোদিত হইল ১৯৪৩ সালে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী হিসাবে উপস্থিত হইল। ১৯৩৯ হইতে ১৯৪৬ পর্যন্ত এই বিদ্যালয়কে আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়া চলিতে হইয়াছিল। এই সময় স্থানীয় পৌর প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বর্তমানে যে জমির উপর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত তাহা দান করেন এবং তাহারই উপর ১৯৪৪ সালে গড়িয়া উঠিল এই বিদ্যালয়ের ইমারত।

১৯৪৭ সালে বাংলাদেশ বিভক্ত হইলে পূর্ববঙ্গ হইতে দলে দলে উদ্বাস্তুরা এখানে আসিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইল এবং বিদ্যালয়ের আর্থিক দুরবস্থাও দূর হইল। ১৯৫৬ সালে প্রফুল্ল কুমার মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। কিন্তু যে কীর্তি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা চিরদিন স্মরণ করিবে তাহারই ছাত্রেরা এবং তরুণ বিদ্যোৎসাহী জনগণ। মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি একটি Trust Deed করিয়া এই বিদ্যালয়ের সমস্ত সম্পত্তি Trusteeদের হাতে সমর্পণ করেন। বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বন্ধুর পথে তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহার যাত্রা সুফল ও সার্থক হইয়াছে। *সৌজন্যে : স্কুল স্মরণিকা,* ১৯৭১

চন্দনপুকুরের গোবিন্দরাম মিত্র-মনোহর ঘোষ-বারানসী ঘোষ

গোবিন্দরাম মিত্র

মৃত্যু : ১৭৬৬ খ্রীঃ। "ইংরেজ কালেকটরের সহকারী হিসেবে ডেপুটি কালেকটর বা ব্ল্যাক ডেপুটি বলে তিনি পরিচিত হন। ব্যারাকপুরের কাছে চাণক গ্রাম থেকে কুমারটুলী অঞ্চলে এসে এই ডেপুটি কালেকটর বৈধ-অবৈধ নানা উপায়ে প্রভূত সম্পদ অর্জন করে। অত্যন্ত প্রভাবশালী এই ব্যক্তির উপরওয়ালা হলওয়েল সাহেব চেষ্টা করেও তাঁকে পদচ্যুত করেন নি। এরূপ প্রবল প্রতাপের জন্য 'গোবিন্দরামের ছড়ি' বলে একটি প্রবাদ বাক্যেরও সৃষ্টি হয়েছে। তিনি গঙ্গার তীরে কুমারটুলীতে নয়টি চূড়া বিশিষ্ট কালীমন্দির স্থাপন করেন (১৭২৫)।" (সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান)।

রাধারমণ মিত্র 'কলিকাতা দর্পণ' গ্রন্থে লিখেছেন, 'ব্যারাকপুরের কাছে চন্দনপুকুরে বা চন্দনপুরে তাঁর আদিবাস ছিল। সেখান থেকে কলকাতায় আসেন। বহুবছর কালা জমিদার হিসেবে মাসের ৩০টাকা বেতন পেয়ে এসেছেন। শেষের দিকে ওই বেতন বেড়ে মাসে ৫০ টাকা হয়েছিল।

আপার সার্কুলার রোডের ধারে পূর্বদিকে অর্থাৎ ২৪ পরগণার দিকে তাঁর এক মস্ত বাগানবাড়ি ছিল, তার নাম ছিল নন্দনবাগান। এখনও ওই অঞ্চলে একটা রাস্তা নন্দনবাগান স্ট্রিট-গোবিন্দরাম মিত্রের বাগানের স্মৃতি রক্ষা করছে। এই বাগানের দক্ষিণ গায়েই অপেক্ষাকৃত ছোট উমিচাঁদের বাগানবাড়ি ছিল। নবাব সিরাজদ্দৌলা যখন ১৭৫৬ সালে প্রথমবার কলকাতা আক্রমণ করেন তখন তাঁর সেনাপতি মীরমদন এই বাগানে ছাউনী করেছিলেন। হলওয়েল সাহেবকে বন্দী করে এই বাগানে তাঁর কাছে আনা হয়। ১৭৫৭ সালে সিরাজের দ্বিতীয়বার কলকাতা আক্রমণের সময় নবাব স্বয়ং এই বাগানে ছিলেন।
বনমালী সরকারের বাড়ি, / গোবিন্দরামের ছড়ি, /উমিচাঁদের দাড়ি, / হুজুরিমলের কড়ি।"

মনোহর ঘোষ

মনোহর ঘোষ ছিলেন হুগলী জেলার আখনার ঘোষ। ইনি ছিলেন প্রথমে রাজা টোডরমলের গোমস্তা, পরে হন মুহুরী। শেষে সুবর্ণরেখা নদীতীরে বাস করেন। মোগল-পাঠান যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সুবর্ণরেখা ত্যাগ করে চিৎপুরে এসে বাস করেন। সেইসময় চিত্তেশ্বরী দেবী প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে ডাকাতদের অত্যাচারে চিৎপুর ত্যাগ করে ব্যারাকপুরের পাশে চন্দম (চন্নন) পুকুরে গিয়ে বাস করেন। গোবিন্দরাম মিত্রেরও আদিনিবাস এই চন্দনপুকুরে ছিল। রাধাকান্ত ঘোষও (একমতে ইনি মনোহর ঘোষের পুত্র, অন্যমতে ভ্রাতুষ্পুত্র) চন্দনপুকুরে বাস করতেন।.... মনোহর ঘোষের মৃত্যু হয় ১৬৩৭ খ্রীঃ।

বারানসী ঘোষ

"রাধাকান্ত ঘোষের পুত্র বারানসী ঘোষ ২৪পরগণার কালেক্টর গ্ল্যাডুইন সাহেবের দেওয়ান ও জোড়াসাঁকোর শান্তিরাম সিংহের জামাই ছিলেন। তিনি জোড়াসাঁকোয় নিজের বাসের জন্য প্রকাণ্ড এক বাড়ি তৈরি করেছিলেন। যে রাস্তায় এ বাড়ি ছিল তার নাম বারানসী ঘোষ স্ট্রিট। এ রাস্তাটির পশ্চিমে চিৎপুর রোড থেকে পূর্বে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।..... চিৎপুর রোড থেকে সেন্ট্রাল এভিনিউ পর্যন্ত পশ্চিমের অংশের নাম এখনও বারানসী ঘোষ স্ট্রিট।.... চন্দনপুকুরে থাকতেন বলে বারানসী ঘোষ ব্যারাকপুরের কাছে গঙ্গার স্নানঘাট ও ৬টি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। স্নানঘাটের চাঁদনির গায়ে এক পাথরের ফলকে একথা লেখা আছে।"

সৌজন্য : কলিকাতা দর্পণ—রাধারমণ মিত্র

পত্র-পত্রিকা ও নাটক : নোনা-চন্দনপুকুর অঞ্চলে কিছু সাহিত্য পত্র-পত্রিকা, নাট্য সংস্থা, নাট্য ব্যক্তিত্ব এ অঞ্চলকে উর্বর করেছে। পত্র-পত্রিকার মধ্যে 'সন্ধানী, 'রূপক', 'একক', 'কলাম', 'ঈহা', 'কস্তুরী', 'বারাকপুর সাগ্নিক' প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে রয়েছে নাট্য সংস্থা ময়ুখ, নীহারিকা, বারাকপুর সাগ্নিক, মন্দিরা প্রভৃতি। অর্ধেন্দুবিকাশ দাস, চন্দন (দিলীপ) তোপদার, গোবিন্দ মুখার্জী, স্বপ্না মুখার্জী, জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপ্না রায়চৌধুরী এরকম আরও নাট্য ব্যক্তিত্ব এ অঞ্চলে নাটকের ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

আনন্দপুরী গড়ে ওঠার কথা

—————————— তারিণীচরণ ঘোষ

[আনন্দপুরী তখন গড়ে ওঠেনি। মণিরামপুরস্থ ধিতাড়া গ্রামের (পলতা জলকলের মধ্যে অবস্থিত ছিল) কিছু বাসিন্দার ভিটেমাটি ছাড়তে হয় পলতা জলকল সম্প্রসারণের জন্য ১৯২১ সাল নাগাদ। তারপর নতুন বাসস্থান খোঁজার পালা। বারাকপুর স্টেশন রোডের প্রবীণ ডাক্তার (হোমিও) সৈয়দ আহম্মদের চেষ্টায় পুষ্করিণীসহ প্রায় সাড়ে ছয় বিঘা জমি সংগৃহীত হলো এবং ১৯-০৯-১৯২১ তারিখে রেজিস্ট্রি হলো। প্রকৃতপক্ষে সেদিনই আনন্দপুরীর প্রতিষ্ঠার দিন।]

প্রথমে আমরা চারিটি পরিবার ১৯২২ সালে ২৮শে মার্চ এই আনন্দপুরীর মাটিতে আসিয়া সংসার পাতিলাম। পূর্বেই চারিটি পর্ণকুটির তৈয়ারী করে রাখা হইয়াছিল কারণ অঞ্চল বিশেষ জনবহুল না থাকাতে ভাড়াটে বাড়ির প্রচলন ছিল না। এই পল্লী স্থাপনের গোড়ার কথা চিন্তা করিতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে ঢাকা জিলার আধিবাসী শ্রী সীতানাথ দে মহাশয়কে। তিনি তৎকালে গভর্নমেন্টের তালিকাভুক্ত সার্ভেয়ার ছিলেন। একটি নকশা তৈয়ারী করিয়া দেবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি সাগ্রহে আমার অনুরোধ রক্ষার্থে এখানে আসিয়া কাদা, কাঁটা, জঙ্গল ইত্যাদির মধ্যে থাকিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া জমিটি জরিপ করেন এবং ১৪টি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া একটি নিখুঁত নকশা প্রস্তুত করিয়া দেন।

নামকরণ

স্থানীয় লোকেরা এই স্থানটিকে চাণক বাগদিপাড়া বলিত। নামকরণ লইয়া যখন আমাদের একদিন আলোচনা হইতেছিল তখন আমার এক বন্ধু বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামের অধিবাসী অধুনা কলকাতাবাসী শ্রী বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত মহাশয় 'আনন্দপুরী' নামটি প্রস্তাব করেন এবং সকলেই ইহা মনপুত হওয়াতে এই নামই বহাল রহিল।

ক্রমেক্রমে আমাদের পর্ণকুটীরগুলির স্থলে কয়েকটির ইষ্টক নির্মিত আড়ম্বরবিহীন বাসগৃহ উঠিল। আরও তিনচারি বৎসর অতীত হইয়া গেল। তখন ওই স্থানে নিরাপত্তার দিক দিয়া আশানুরূপ জনসমাগম না হওয়াতে বাহিরের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত তৎকালীন ইংরাজী বসুমতীতে প্রকাশের জন্য একটি প্রবন্ধ

পাঠাই। যাহা ১৯২৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পর দু-একজন করিয়া বসবাসের জন্য তথ্যানুসন্ধানে আসিতে লাগিলেন এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ জমিও ক্রয় করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে ক্রমেক্রমে পল্লীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ছোটছোট ছেলেমেয়ের সংখ্যাও বাড়িতে লাগিল এবং উহাদের শিক্ষার সমস্যাও উদ্ভুত হইল। ওই সময় এখানে প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১৪নং রেল ফটকের পশ্চিমদিকে বিনোদবিহারী ইউ পি ইস্কুল একমাত্র ভরসা। কাজেই এখানকার ছেলেমেয়েদেরও ওই বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হইতো। কিন্তু বিস্তীর্ণ রেল পথ পার হইয়া ওই বিদ্যালয়ে যাওয়া শিশুদিগের পক্ষে বিপদজ্জনক থাকায় অত্রস্থ দোলমন্দিরে প্রথমে একটি লোয়ার প্রাইমারী বিদ্যালয় খোলা হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে আনন্দপুরী সেন্ট্রাল রোডের পাশে আমার একখণ্ড জমির উপর জনসাধারণের সমবেত চেষ্টায় একটি বৃহৎ চালাঘর নির্মিত হইল এবং শ্রী তারাপদ ঘোষ জি, টি, এবং শ্রী প্রফুল্লকুমার গাঙ্গুলী যথাক্রমে প্রধান শিক্ষক ও সরকারী শিক্ষকরূপে সামান্য বেতনে শিক্ষকতা শুরু করেন। এই বর্তমান আনন্দপুরী হিন্দু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গোড়ার কথা। ১৯৩৯ সালে জনাব আলি চৌধুরী সাহেব যখন সাব-ইনসপেক্টর অব স্কুল ছিলেন তখন তাহার আনুকূল্যে এই বিদ্যালয় গভর্নমেন্ট অনুমোদন লাভ করে। ১৯৫১ সালে পিতৃস্মৃতি রক্ষার্থে মৎ কর্তৃক নির্মিত 'হরহল' নামীয় ভবনে বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত করা হয়। গত ১৯৪২, ৪৩ ও ৪৪ সাল এই তিনবৎসরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপান কর্তৃক বোমা বর্ষণের ফলে এই বিদ্যালয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল। এই পল্লীতে এখন সরকার আরও কতকগুলি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলিয়াছে।

১৯৪১ সাল অবধি ধারাবাহিকভাবে গৃহাদি নির্মিত হইয়া পল্লীটি গড়িয়া উঠিতেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দরুণ এখানকার কয়েকটি নতুন বাটী সামরিক কর্তৃপক্ষ দখলীকৃত হয়। তখন এই স্থানটি একটি ক্ষুদ্র সেনানিবাসে পরিণত হয়। লড়াই শেষ হইলে আসিল সর্বনাশা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা। এইসময় ট্রেন চলাচল বন্ধ হইয়া যাওয়াতে বারাকপুর স্টেশনে ঢাকা মেল ট্রেন আটকাইয়া পড়িল। শতশত রেলযাত্রী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়া পড়িল। এই গ্রামের যুবকবৃন্দ জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে ৭/৮ দিন ধরিয়া অন্ন-দুগ্ধ ও পানীয় সরবরাহার্থে যে কঠিন পরিশ্রম করিয়া সেবার পরিচয় দিয়াছিল তাহা এই পল্লীর গৌরব বর্ধনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। অতপর দেশ বিভক্ত হইল। দলে দলে লোক চারিদিকে বসবসার্থে ছড়াইয়া পড়িল। চারটি সংসারের আনন্দপুরী এখন একটি জনবহুল জনপদে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

(১৪-১০-১৯৫৬ তারিখে লেখাটি প্রকাশিত, নির্বাচিত অংশ) সংগ্রাহক : *কানাইপদ রায়*

তালপুকুরের কথা

তালপুকুর

—প্রলয় ভট্টাচার্য

'তালপুকুর' নাম সংকেতে যাওয়ার আগে একটু উত্তরে ঘুরে আসা যাক। ইছাপুর-নবাবগঞ্জ। ঘোষপাড়া সড়কে নবাবগঞ্জে প্রবেশের ফটক হল—বাদামতলা। যার পুরনো নাম ফাঁসিডাঙা। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে ফিরে যাই। মনে পড়ে সেই কবিতার কথা—''যশোর নগর ধাম, প্রতাপাদিত্য নাম/মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ''।

এই ফাঁসিডাঙা থেকেই প্রতাপাদিত্যকে ধরে নিয়ে গেলেন মানসিংহ। সৈন্যদের রাস্তার চার মাথার সংযোগস্থলে ফাঁসি দেওয়া হল বলেই নামকরণ 'ফাঁসিডাঙা'। একটি দুর্গের নাম ছিল 'জগদ্দল'। প্রতাপাদিত্যেরই দুর্গ। আজকের 'জগদ্দল' রেলস্টেশন আর জনবসতির স্থান নাম পরিচিতিতে ক্ষুদ্র নাম গণ্ডি থেকে বৃহতের দলে পড়েছে। 'ফাঁসিডাঙা' নাম আঞ্চলিক মানুষের মুখ থেকে মুছে গিয়ে শূন্য হয়ে হারিয়ে গেছে। বদলে 'বাদামতলা', (বাদামগাছের সারি থেকে) প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের নামকরণে দিকচিহ্ন হয়ে থেকেছে।

তালপুকুর ইতিহাস প্রাচীন গ্রাম। নাম সংকেতে 'তালপুকুর' সাম্প্রতিকতার প্রতীক বলে মনে হয়। এখন যে ভূখণ্ডকে আমরা 'তালপুকুর' নামে চিহ্নিত করেছি, সেখানকার শীতলা মোড়ের কাছে একটা পুকুর ঘন তালবনে ঘেরা। সেই প্রাকৃতিক গুণপনা থেকে নাম হয়ে গেল 'তালপুকুর'। তালপুকুর গ্রাম সীমনার দক্ষিণ ঘেঁষে চলেছে খাল। পশ্চিমে গঙ্গা থেকে কিনিসন জুট মিল হয়ে বিটি রোড, পূর্বরেলপথ অতিক্রম করে সোজা পূর্বে। এর অন্য নাম ডানকুনি খাল। এখন দেখলে মনে হয় শীর্ণ নালা; প্লাস্টিক আবর্জনার স্তূপে দুর্গন্ধ। একদিন এইখাল ছিল পুণ্যতোয়ার সমান; খালে গ্রামের ঘাট ছিল। পুজোর ঘটে স্রোতস্বিনী জল ভরে নিত ভক্তপূজারী। স্নান করে তৃপ্তি পেত গ্রামের মানুষ। দৈনন্দিন জলের প্রয়োজন মেটাত এই খাল। একরাতে ছিপ নৌকোয় এই খাল ধরে চলে যাওয়া অনায়াস হত বাংলাদেশের যশোহর। প্রতাপাদিত্যের যাওয়া আসা ছিল এই জলপথে এই তথ্যকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ ফাঁসিডাঙা; জগদ্দল প্রতাপাদিত্যের যথেষ্ট পরিচিত ঘাঁটি বলে প্রমাণিতই।

খালের দক্ষিণে বাচস্পতিপাড়া, কাছারিবাগান, মান্না বাগান। এই 'মান্না' পদবীধারী পরিবার প্রতাপাদিত্যের নৌ-সৈনিক ছিলেন। তখনকার দিনে মান্নাদের ভিটে

খুঁড়লে দু'মহল্লা, তিনমহল্লার অস্তিত্বের খোঁজ পাওয়া যেত।

বাংলার গ্রাম শহরের স্পন্দন পেয়েছে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের পরে। পুবে পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল তালপুকুর গ্রাম। এখন শহর পরিচিতিতে থিতু। এ শহরের বুকের ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে পূর্ব রেলপথ। মহানগরের কোল থেকে বেরিয়ে, নগর গঞ্জ ছুঁয়ে সেই প্রতিবেশী সোনার বাংলায়। প্রাজ্ঞজনেরা বলেন—এই রেলপথ তো সেদিনের কথা। আর গ্রামের উত্তরে "ওল্ড ক্যালকাটা রোড" নামে যে রাস্তা চিহ্নিত; তা তো নবাব সিরাজের। মুর্শিদাবাদ থেকে কৃষ্ণনগর ছুঁয়ে চাণক হয়ে কলকাতা যাতায়াতের রাস্তা। এক অভিজাত সড়ক। নবাবীয়ানার স্মৃতি ধরে আছে সেই সটান সড়ক। কান পাতলে কোনও কোনও ভাগ্যবান আজও শুনতে পান নবাবী ঘোড়ার খুরের টুপুর টুপুর রাজকীয় ধ্বনি। সড়কের দুধারে ধানকল আর সব্জিবাগান। বড় পোলের কাছে যে ধানকলপাড়া সেখান থেকে কে এন মুখার্জি রোড দিয়ে এগোলে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড পর্যন্ত লোকালয়। "ওল্ড ক্যালকাটা" রোডের উত্তরে মিডল রোড নামে যে জায়গার ভূমি পরিচিতি ঘটেছে, সেখানে কিছু কিছু মানুষের বসতি; তারপর শুধুই ধানক্ষেত—আর এখনকার 'আনন্দপুরী'। নাম পরিচিতি হাল আমলের। এখানকার সেন্ট্রাল রোড স্থানীয় মানচিত্রে জনবসবাসের এক উল্লেখ্য সরণী। এছাড়া বেলাতলি রোড; আব্দুল কদ্দুস রোড, মুসলমানি বসতি হিসেবে পরিচিত। আনন্দপুরীতে তারিণীকুমার ঘোষ প্রতিষ্ঠিত "রামসীতা মন্দির" জাঁকজমকে ঐতিহ্যে মনকাড়া। রামনবমী তিথিতে এখানে মেলা বসে, উৎসব হয়। মাঝখানে "চাঁদমারী", সামরিক অস্ত্রের কায়দা কসরতের ক্ষেত্র, সৈনিক ঘাঁটি, প্রগতি সংঘের খেলার মাঠ।

ধানকলের কথা দিয়ে লেখা শুরু করেছি তালপুকুর গ্রামকে বোঝাতে। ধানকলের মালিকদের অ্যাসোসিয়েশন প্রতি বছর ব্রহ্মাপুজোর আয়োজন করত। সেই পুজোকে কেন্দ্র করে বৈশাখ মাসে ধানকল মাঠে (এখনকার জাগৃতি ক্লাব) এক সপ্তাহ যাত্রা, মেলা, পুতুলনাচের আসর বসত। নানান যাত্রাদল আসত। বারাকপুরের ক্ষিতীশ ঠাকুরের যাত্রাদলও ছিল এরমধ্যে। সন্ন্যাসীচরণ সাধুখাঁ, ক্ষেত্রমোহন সাধুখাঁ, হরিচরণ সাধুখাঁ, মন্মথনাথ সাধুখাঁ—এঁদের পৃথক পৃথক ধানকল ছিল এ অঞ্চলে। এখন একটাও

চাণক গ্রাম নাম। 'অমৃত আশ্রম' কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিজের তৈরি। ওই বাড়িতে কোনও গৃহদেবতা প্রতিষ্ঠিত না থাকলেও ১৯১৬-১৭ সালে এই বাড়িতেই দুর্গাপুজো শুরু হয়। ওই পুজোর তিনদিন পাড়ার কোনও বাড়িতে রান্না হত না। সকলের নিমন্ত্রণ থাকত অমৃত আশ্রমে। কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় জুটমিলে কন্ট্রাক্টরি করতেন। প্রথমে অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে তহশিলদারের (টাকা আদায়) চাকরি নেন। কিনিসন সাহেবের প্রশ্রয়ে কন্ট্রাক্টর হন জুট মিলের।

পরিবারে মৃত্যু অশনি সংকেতের মত দেখা দেওয়ায় মুখুজ্জে পরিবারে দুর্গাপুজো বন্ধ হয়ে যায়। তখন কৃষ্ণনাথবাবু স্থানীয় কিছু মানুষের সঙ্গে বারোয়ারী পুজো বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন। তার ফলস্বরূপ ১৩৩০ বঙ্গাব্দে (১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে) শারদ দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয় তালপুকুরে। এটাই তালপুকুরের প্রথম বারোয়ারী দুর্গোৎসব। এ পুজোর প্রথম পুরোহিত ছিলেন পাড়ারই মানুষ শ্রী সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। শারদীয় আনন্দ জোয়ারে গা ভাসাল তালপুকুর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পুরোদমে চলেছে। ১৯৪৩ সাল। পঞ্চাশের মন্বন্তর। হাহাকার রিক্ত বাংলা। অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক সরকার রেশন ব্যবস্থা শুরু করলেন। ৭ দিনের বিজ্ঞপ্তিতে রেশন অফিসের জন্য প্রাদেশিক সরকার 'অমৃত আশ্রম' নিয়ে নিলেন। পুজোও স্থানান্তর হল। পরে জমি কিনে নিজস্ব ইমারতে ১৯৪৯ সালে জিমন্যাসিয়াম ভবনে শুরু হল দুর্গাপুজো। আজও যা মহাসমারোহে চলছে। তিনদিন অন্নভোগ আর বিজয়া দশমীতে দধিকর্মার সঙ্গে 'পান্তাভোগ' এ পুজোমন্ডপের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তারপর সিঁদুরখেলা, মাঙ্গলিক আচার, শোভাযাত্রা, প্রতিমা ভাসান।

প্রথমদিকে শেওড়াফুলির শিল্পীরা এখানে এসে প্রতিমা গড়তেন—একচালার প্রতিমা। এলাকায় মৃৎশিল্প না থাকায়, এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

স্বদেশী সময়ে (১৯৩০) সূর্যসেনের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের প্রেরণায় দেহচর্চার নিভৃত কেন্দ্র গড়ে ওঠে তালপুকুরে। যার নাম—জিমন্যাসিয়াম ক্লাব। এছাড়াও ফুটবল, অ্যাথলেটিক্স, নাট্যচর্চায় জিমন্যাসিয়ামের উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। শিল্প প্রদর্শন ও শরীর শিল্পের প্রদর্শনীতে অনিল রায়, মুরারি কুণ্ডু, গৌর কোলে, দুলাল মান্না, কানাই কোলে, কেশব সিং, পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বুলাই বিশ্বাস উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, মনোময় বন্দ্যোপাধ্যায়—এসকল মানুষ ছিলেন উল্লেখযোগ্য আদরণীয়।

১৯০০ সাল থেকেই বসবাস শুরু হয় তালপুকুরে। তার কারণ পাশের গ্রাম টিটাগড়ে বিদেশী সাহেবদের শিল্পস্থাপন। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীর আগমন। পেশা পরিচিতি সংস্কৃতির বদল ঘটে এক নতুন সময়ের সূচনা বলা চলে। নিজস্ব অস্তিত্ব খুইয়ে "কলের যুগ" নামে এক শামিয়ানার নীচে ভিন্নতার একসূত্র। এ এক নুতন সময়।

তালপুকুরে বাজার বসান হরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আগে নাম ছিল হরিবাবুর নতুন বাজার। কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথা তো আগেই বলেছি—কৃতি সন্তান; অনেক সুকীর্তির অধিকারী। কৃষ্ণনাথ বিদ্যালয় স্থাপন, বারাণসী ঘাট সংস্কার (শ্মশান ঘাট বিদ্যুৎচুল্লি)। ডাক্তার, (যাঁর নামে মহকুমা হাসপাতাল) বি এন বসু (ভোলানাথ বসু) তালপুকুরের বাসিন্দা ছিলেন, বারাকপুর রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র। ডাক্তারি শিখতে বিলেত গিয়েছিলেন বলে সমাজচ্যুত হয়েছিলেন। তালপুকুর অঞ্চলে পদার্থবিদ্যায় প্রথম ডক্টরেট কাশীনাথ দত্ত। প্রথম হোমিওপ্যাথ বিষ্ণুচরণ বসু, প্রথম অ্যালোপ্যাথ সত্যচরণ ঘোষ। তালপুকুরে পোড়াশিবতলার একটা সুখকর শ্রুতি আছে। পাথরের শিব (একখণ্ড পাথর) পূজিত হত এখানে। একদিন হঠাৎ এক সন্ন্যাসী এলেন গ্রামে, এই শিবতলায় থাকতে শুরু করলেন। জপ, তপ, পুজো, আরাধনা চলছে। এক মাঝরাতে সন্ন্যাসীর প্রবল চিৎকার শুনতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা; তারা ছুটে আসেন শিবতলায়। সকলে দেখেন সন্ন্যাসী বলছেন জ্বলে গেল, পুড়ে গেল আর ছটফট করছেন মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে। কোথাও কোনও আগুনের লেশমাত্র নেই। গ্রামের লোকরা সন্ন্যাসীকে বললেন আসল কাণ্ডটা কী হয়েছে, খুলে বল তো। সন্ন্যাসী ব্যক্ত করলেন। বললেন, তিনি স্বপ্নে জানতে পেরেছিলেন এই শিবের যে পাথর তার ভেতর স্পর্শমণি আছে। তাই ওটা তিনি নিতে এসেছিলেন। আগুন জ্বালিয়ে ফেলে দিয়েছিলাম ওই পাথরশিবকে, যাতে ফেটে গিয়ে স্পর্শমণি বেরিয়ে আসে। আজও দু'খণ্ড পাথর রয়েছে ওই শিবতলায়। সন্ন্যাসী আগুনে পুড়িয়ে খণ্ড করেছিলেন আস্ত পাথর। জায়গার নামে তাই ঘটনার বিন্যাস —পোড়াশিবতলা।

তালপুকুর থেকে প্রকাশিত হয় হাতে লেখা তেলেগু ম্যাগাজিন

তালপুকুর থেকে প্রতি মাসে হাতে লেখা প্রমাণ সাইজের তেলেগু ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। পরে জেরক্স করে প্রত্যেক তেলেগু লাইব্রেরিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পত্রিকার নাম —"মুনদারুগু" শব্দের অর্থ "এগিয়ে চলা"। প্রাসঙ্গিক খবরাখবর ছাড়াও জেনারেল নলেজ, কুইজের আয়োজন থাকে। উত্তর ২৪ পরগণায় তেলেগু লাইব্রেরির বিভিন্ন খবর এতে ছবিসহ দেওয়া থাকে। *কৃতজ্ঞতা : শ্যামাপ্রসাদ দাসঘোষ*

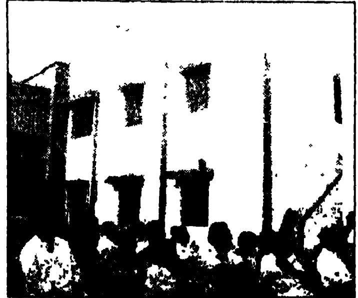
তালপুকুর গার্লস হাইস্কুল

তালপুকুর গার্লস হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫৮ সালের ২ এপ্রিল। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ছাত্রীসংখ্যা ১৩৫০। শিক্ষিকা ২৭ জন। ১৯৯৯ সালে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। প্রথমে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে 'কলা'

বিভাগ পড়ান শুরু হয়। ২০০১ সাল থেকে "বাণিজ্য" বিভাগে পঠনপাঠন আরম্ভ হয়। বিবেকানন্দের জন্মদিনে (১২ জানুয়ারি) বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বিদ্যালয়টির ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করছেন শ্রীমতী করবী দত্ত।

বারাকপুর জিমন্যাসিয়াম লাইব্রেরি

প্রথমে ছিল 'সান্ধ্যসমিতি'; পাশেই গড়ে ওঠে আরও একটা পাঠক্রম 'অমৃত পাঠাগার'। শিশু কিশোরদের জন্য করা 'অমৃত পাঠাগার' বন্ধ হলে, সব বই 'সান্ধ্যসমিতি' কে দিয়ে দেওয়া হয়। সেটা ১৯৩০ সাল। পরে মনোময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, পিয়ারী মোহন কুণ্ডু, মুরারিমোহন কুন্ডু, মোহিত মান্না, গৌরদাস ঘোষাল এঁদের সহযোগিতায় তৈরি হল জিমন্যাসিয়াম ক্লাবভবন। ১৯৪৫ সালে নামকরণ করা হয়। এখানে অ্যাথালেটিকস্‌, ব্যায়াম, ফুটবলের দারুণ চর্চা লক্ষ্য করা যায়।


সৌজন্য : জিমন্যাসিয়াম লাইব্রেরি

লাইব্রেরি চলতে থাকে। ১৯৮২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধিগ্রহণ করে। ২০০১ সালের ৩ মার্চ লাইব্রেরির নতুনভবন নির্মাণ হয়ে উদ্বোধন হয়। উদ্বোধক ছিলেন সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। দোতলায় পাঠকক্ষটি অতীব সুন্দর, নিরবিলি। এই লাইব্রেরির পুস্তকসংখ্যা ৭০০০, সভ্যসংখ্যা ২২০, দৈনিক পাঠকসংখ্যা ৫০। বই বেছে নেওয়ায় 'কার্ড ফরম ক্যাটালগ' রীতি ব্যবহৃত হয়েছে। পাঠকদের ১ বছরে ১২ টাকা চাঁদা দিতে হয়। নতুন সভ্যপত্র নিতে হলে ৩২ টাকা।

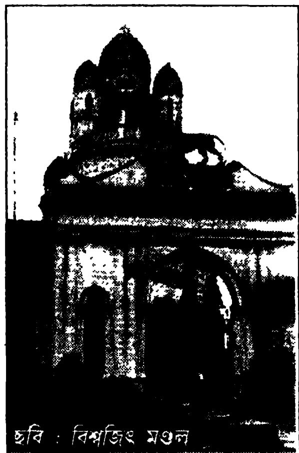
আগে এখান থেকে একটি দেয়ালপত্রিকা প্রকাশিত হত, নাম ছিল 'বুদবুদ' এখন বন্ধ হয়ে গেছে সে উদ্যোগ। এখানকার গ্রন্থাগারিকের নাম বিপ্লবকুমার দত্ত; অন্যকর্মীর নাম অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়। তালপুকুর লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে কে এন মুখার্জি রোড ধরে এসে বাঁদিকে ব্যানার্জিপাড়া সেখানেই জিমন্যাসিয়াম ক্লাব আর তার সংলগ্ন বিশাল গ্রন্থাগার ভবন।

সোনার অন্নপূর্ণা মন্দির

মন্দিরে পৌছতে হলে বিটি রোডের ওপর দুটো বাসস্ট্যান্ডের একটিতে নামতে হবে। একটা তালপুকুর বাসস্ট্যান্ড অন্যটি টিটাগড়-ব্রহ্মস্থান (যা বাস কন্ডাক্টরের অপভ্রংশে 'বড় মস্তান' হয়েছে) বাসস্ট্যান্ড। এখানে নেমে পশ্চিমদিকে হেঁটে আসতে হবে।

দূর থেকেই দেখা যায় মন্দির চূড়ো। সামনে এলে চোখে পড়ে সিংহমূর্তি

শোভিত গেট। ভেতরে মন্দির। দেখলে মনে হবেই এ যেন দক্ষিণেশ্বর। চলতি কথাতে বলাই হয়—বারাকপুর দ্বিতীয় দক্ষিণেশ্বর।


ছবি : বিশ্বজিৎ মণ্ডল

এটি নবরত্ন মন্দির। ভেতরে রূপোর সিংহাসনে রূপোর মহাদেব, অষ্টধাতু নির্মিত অন্নপূর্ণা। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল (বঙ্গাব্দ ১২৮১, ৩০ চৈত্র) এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। স্বয়ং ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ এখানে এসেছিলেন। রাণী রাসমণির কন্যা, মথুরামোহনের স্ত্রী জগদম্বা দেবী মন্দির নির্মাণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পঞ্চমখণ্ডে শ্রীম পদার্পণ ও অন্নপূর্ণা দর্শন অধ্যায়ে 'চাণক' গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্নপূর্ণা দর্শনের কথা লিপিবদ্ধ আছে। মন্দিরে মুখোমুখি নাটমঞ্চ, পশ্চিমে তিনটি ভাগে বিভক্ত ছ'টি শিবমন্দির। ছয় শিবের ছয় নাম— কিন্নরেশ্বর, কামেশ্বর, কল্যাণেশ্বর, কেদারেশ্বর, কৈলাশেশ্বর, কপিলেশ্বর। চৈত্রমাসে অন্নপূর্ণা পুজোয় জাঁকজমক হয়। তাছাড়া শিবরাত্রি, নীলপুজো, ছটপুজো, দুর্গাপুজোর দিনগুলিতেও ভক্তের ভিড় চোখে পড়ে। এছাড়া নিত্যপুজোর ব্যবস্থাও অছে। ঠিকানায় মন্দিরের অবস্থান—পার্ক রোড, গঙ্গোত্রীপাড়া, তালপুকুর, বারাকপুর।

লেখক পরিচিতি : লেখক ও প্যালিনড্রোমিস্ট

তালপুকুর ক্ষেত্রমোহন মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়

মনটা কদিন ধরেই খুবই ভারাক্রান্ত। একটা অস্বস্তি তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে ছোটবাবুর মনটাকে। পূর্বপুরুষের স্মৃতির জন্য কিছু একটা করা প্রয়োজন। বাড়ির পাশে বি এন বসু হাসপাতালে দুটো বেড দেবেন? না গঙ্গার একটা ঘাট বাঁধিয়ে দেবেন ক্ষেত্রমোহন সাধুখাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে? গভীর চিন্তায় মগ্ন ছোটবাবু। হঠাৎ দাদা সদৃশ মুকুটবাবুর কাছে নিজের মনের কথা খুলে বললেন ছোটবাবু—নন্দদুলাল সাধুখাঁ। মুকুটবাবু—ধনেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি মহাশয় বড়োপোলের সামান্য দূরে মুক্তাপুকুর অঞ্চলে একটা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব দিলেন। এলাকাটি ছিল গরিব মানুষের বাস। তাই গরিব মানুষের ছেলেদের শিক্ষাদানের প্রস্তাবটি মনে ধরলো ছোটবাবুর। অগ্রজদের সম্মতি নিয়ে লেগে পড়লেন ক্ষেত্রেমোহন সাধুখাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে বিদ্যালয় গড়তে। পরবর্তীকালে অনেক বাধা হাজির হলেও অদম্য চরিত্রের এ মানুষটিকে কোনভাবেই

থামিয়ে রাখতে পারেনি। একদিন পুণ্য প্রভাতে শঙ্খধ্বনিতে জেগে উঠলো মুক্তাপুকুর। জঙ্গল কেটে গড়ে উঠলো এক বিদ্যালয় গৃহ। নামকরণ করা হলো ক্ষেত্রমোহন মেমোরিয়াল ইউ পি স্কুল। এতে মন ভরলো না ছোটবাবুর। ১৯৬৩ সালে চালু করলেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। মুকুটবাবু, অমূল্য বক্সিরা শিক্ষাদানের ভার নিলেন। ১৯৬৯ সালে সরকারী অনুমোদন পেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের। ক্রমান্বয়ে ছাত্রসংখ্যা বাড়তে লাগলো। মুষ্টিমেয় কতিপয় শিক্ষকের ঐকান্তিক চেষ্টা ও আত্মত্যাগে বিদ্যালয়টি স্থান করে নিল মানুষের মনে। ১৯৯৬ সাল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে ক্রমোন্নতির লক্ষণ হল স্পষ্ট।

সূত্র : রাধানাথ মাইতি (প্রধান শিক্ষক)

কৃষ্ণনাথ হাইস্কুল, পথ পরিক্রমা, ক্লাব, কয়েকটি অঞ্চল এবং বাজার

অরিন্দম ঘোষ

কৃষ্ণনাথ হাইস্কুল

বিদ্যোৎসাহী কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর জমিদারী থেকে অর্থ প্রদান করে প্রতিষ্ঠা করলেন ১৯১৪ সালে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। তালপুকুর টিটাগড় অঞ্চলে শুরু হয় এক নতুন শিক্ষা-আন্দোলন।

বিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জয়ন্তীবর্ষ স্মারক পত্রিকা (১৯১৪-৮৮)তে লেখা প্রকাশিত হয়েছিলো এই রকমভাবে— "...স্থানীয় জনকল্যাণমূলক কার্যে তিনি অকৃপণ হস্তে দান করিতেন। তাঁহার একক প্রচেষ্টায় এবং অর্থানুকূল্যে ১৯১৪ সালে তালপুকুর L.P. স্কুল (বর্তমান নাম K.N. Municipal High School) স্থাপিত হয়। কোনোরূপ শর্ত আরোপিত না করিয়া তিনি এই বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার Titagarh Municipality-র ওপর ন্যস্ত করেন। এইরূপ নিঃশর্ত দানের দৃষ্টান্ত এ দেশে নিতান্তই বিরল।..."

তালপুকুর বাসস্ট্যান্ডের ধারে আজ যে 'কৃষ্ণনাথ মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল বিরাট অট্টালিকার রূপ ধরে দাঁড়িয়ে একদিন এই বিদ্যানিকেতনের নাম ছিলো কেষ্ট মুখুজ্জের পাঠশালা। পাঠশালা হিসাবেই এর জন্ম। 'হে অতীত, কথা কও' শীর্ষক পরিচয়মূলক প্রবন্ধে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রী শম্ভু মল্লিক বর্ণনা করেছেন— "বিদ্যালয়ের একপাশে ছিলো একটা ডোবা আর ধোবীখানা। দু'তিনটে নারকেল গাছের ফাঁকে একটা চালাঘর। এই চালাঘর কিছুটা জায়গা খরিদ করে শ্রী কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের শুভ সূচনা করেন। এই 'চালা ঘর' বলতে গেলে বর্তমান বিদ্যালয়ের সুতিকা-গৃহ। পরে এই চালাঘর ভেঙে নতুন বাড়ী হয়।"...

কৃষ্ণনাথ ছিলেন কর্মবীর, ইতিহাসের উর্দ্ধে। তাঁর কাজ পরিচয় করিয়ে দেয় তিনি যুগের চাইতে অগ্রবর্তী একজন। কোনো রকম কোনো শর্ত ছাড়াই ট্রাস্টি বোর্ডের হাতে বিদ্যালয়ের সমস্ত দায়িত্ব তুলেদিয়ে বলেছিলেন— "আমার নামের একটা ফলক যেন বিদ্যালয়ে নির্মাণ করা হয়।" তবে এই মহান কর্মবীর ১৯২০-তে পরলোকের পথে পাড়ি দেবার কারণে বিদ্যালয়ের নির্মাণকার্যে সাময়িক ছেদ পড়ে। ১৯২৪-২৬ সালে সরকার বাহাদুরের নিকট পৌর কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে অর্থমঞ্জুরের জন্য আবেদন জানায়। ১৯২৬ সালে বিদ্যালয় নিম্নপ্রাথমিক থেকে উচ্চপ্রাথমিকে উত্তরণ ঘটে। ১৯২৮ সালে এই স্কুল মিডিল ইংলিশ ক্লাস-VI-এ উত্তরণ ঘটে।

১৯৫৪ সালে (ইংরেজ সরকার বিদায় নিয়েছে, ভারতে তখন নতুন সংবিধানে স্বাধীন সরকার...) প্রতিষ্ঠিত হয় জুনিয়র হাইস্কুল। তার আগে অবশ্য দেশ বিভাগ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, সমাজজীবনের বুকে প্রবল ভাঙন। ১৯৬৪ সালে আবার বিদ্যালয়ের নবপর্যায়ে উত্তরণ। এ যেন মরাগাঙে জোয়ার এলো। তারই প্রতিচ্ছবি হিসাবে ১৯৬৫ সালের ১লা জানুয়ারি (যখন চারিদিকে হিমেল হাওয়ার স্পর্শ) বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীতে উত্তরণ এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক এক বিশেষভাবে স্বীকৃতি।

১৯৬৯ সালে নির্মিত হলো বিদ্যালয়ের ছয়টি শ্রেণীকক্ষ বিশিষ্ট দ্বিতল ভবনের। কলকাতার মেয়র শ্রী প্রশান্ত শূর 'ভবনের দ্বারোদঘাটন করলেন। ১৯৬৫ সালে স্কুলের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে স্কুলের দ্বারোদঘাটন ও বিদ্যালয়ের নতুন উত্তরণের শুভ সূচনা করেছিলেন জাতীয় অধ্যাপক বিজ্ঞানাচার্য শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

একদিন যে স্কুলটি 'কেষ্ট মুখার্জীর পাঠশালা' বলে সমধিক পরিচিত ছিলো, সেই স্কুলটি আজ জনসমক্ষে যথেষ্ট খ্যাতির শিখরে বললে ভুল বলা হবে না। বর্তমান টিটাগড় কৃষ্ণনাথ মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের অনুমোদন পেয়েছে। ১৯৯৯ সাল থেকেএই স্কুল উচ্চমাধ্যমিক বিভাগে উত্তরণ ঘটে। তৈরি করা হয়েছে বিজ্ঞানবিভাগের জন্য একটি ক্ষুদ্রতম ল্যাবরেটরি। বিদ্যালয়-লাইব্রেরি আধুনিকভাবে সংস্কার ও সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছে। 'কম্পিউটার শিক্ষা' এখানে ছাত্রদের একটু নতুন পথের সন্ধান দিতে পারে।... শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, মতাদর্শ, একই সঙ্গে ছাত্রদের নতুনভাবে গড়ে ওঠার পালা,... শিক্ষার আধুনিকতার সঙ্গে তাল ঠুকে বেড়ে ওঠা এবং খানিকটা পরিবর্তন;... এযেন এক আলোকিত প্রাঙ্গণ। তবুও সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে তাকালে মনে হবে যেন ইতিহাস ও অতীত এখনও কিছু বলতে চাইছে।... কান পাতলে হয়তো অস্পষ্ট শোনাও যেতে পারে নতুন তৈরি হওয়া কেষ্ট মুখুজ্জের পাঠশালাতে গুরুমহাশয়ের চোখ রাঙানোর মাধ্যমে ছাত্রদের শতকিয়া, বুড়িকিয়া, নামতা ইত্যাদি মুখস্থের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর।... অতীতকে ভুলে যাওয়া কী মুখের কথা?

তথ্যসূত্র . বিদ্যালয় প্লাটিনাম জয়ন্তী স্মাবক পুস্তিকা (১৯১৪-১৯৮৮) এবং বিদ্যালয় পত্রিকা 'কিশোর তীর্থ' ১৯৯১

পথ পরিক্রমা

বারাকপুর স্টেশন থেকে ডানদিকে ১৪নং রেল গেট পেরিয়ে ওল্ড ক্যালকাটা রোড ধরে একটু এগিয়ে ডানদিকে আনন্দপুরী স্টেট ব্যাঙ্ক ধরে বাঁদিকে সেন্ট্রাল রোড (১৯৪০ সালে তৈরি) ধরে চলতে চলতে আনন্দপুরী এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ এভাবে শাখা রাস্তাগুলি পার হয়ে মসজিদ মোড় পার হলাম। বারাসাত রোড পার হয়ে শিবতলা রোড ধরে ডানদিকে ব্যানার্জীপাড়া, সেদিকে না গিয়ে বাঁদিকে উত্তমচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পথ ধরে ঘোষপাড়া পঞ্চাননতলা ছাড়িয়ে বিজয় গড়, আদর্শপল্লী, নেভেল পার্ক, শহীদ সরণী হয়ে কালিয়া নিবাস জাফরপুর রাইফেল রেঞ্জ রোডে উঠলাম। এই রোড ধরে উঠতে উঠতে চালবাজার হয়ে কল্যাণী রোড পেরিয়ে মোহনপুর। (এই মোহনপুরের তেলিনীপাড়ায় অপর্ণা মুখোপাধ্যায় তাঁর বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেছেন মাকালী— বড়মা। তিনি শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছিলেন। এখানে দুর্গাপুজো, শিবরাত্রি, কালীপুজো উপলক্ষে বড় উৎসব হয়ে থাকে।) তারপর হাঁটতে হাঁটতে বারাসাত রোড। বারাসাত রোড পূর্বদিকে নীলগঞ্জ হয়ে চলে গেছে বারাসাত। আমি পশ্চিমদিকে হাঁটা শুরু করলাম। হরিসভা, মাঠপাড়া, তালবাগান রোড। জাফরপুর রোড, বাগচিপাড়া রোড, সাধু মুখার্জি রোড (এ রাস্তায় ঢুকলে এক সময় জমিদারবাড়ির স্মৃতি ভেসে ওঠে), চক্রবর্তীপাড়া রোড ছাড়িয়ে ১৫ নং রেল গেটে পৌঁছালাম। ডানদিকে বিধানপল্লী আর বাঁদিকে জয়হিন্দ পল্লী।

তালপুকুরের পথঘাট

(১) **ওল্ড ক্যালকাটা রোড** : একসময় কলকাতা যাবার এটাই একটা মাধ্যম ছিলো। ১৪নং রেলগেট থেকে শুরু হয়ে এই রাস্তাটি পূর্ব তালপুকুরের ওপর দিয়ে খড়দহ (বহড়া) বাজার অবধি গেছে। (২) **কে এন মুখার্জি রোড** : বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড (বি টি রোড) থেকে যে রাস্তাটি ওল্ড ক্যালকাটা রোডের সাথে বড় পোলের কাছে এসে মিলিত হয়েছে, জমিদার শ্রী কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়ের নামানুসারে সেটিকে কে এন মুখার্জী রোড বলে। (৩) **কোলে পাড়া রোড** : কোলে বাড়ি ও পাড়াটির নামে এই রাস্তাটির নাম কোলে পাড়া রোড। (৪) **বি সি চ্যাটার্জি রোড** : রাস্তাটি স্থানীয় জনদরদী বলাইচন্দ্র চ্যাটার্জির নামানুসারে হয়েছে। তালপুকুর গার্লস হাইস্কুলের সামনে দিয়ে রাস্তাটি দুভাগ হয়ে গিয়ে একটি রাস্তা করুণাময়ী রোড ও অপরটি কোলেপাড়াতে মিশেছে। (৫) **করুণাময়ী রোড** : এই রাস্তাটি ১২নং রেলগেট থেকে শুরু হয়ে রেললাইনের প্রায় সমান্তরাল গিয়ে কোলেপাড়াতে মিশেছে। (৬) **রসিক পাল রোড** : স্থানীয় সমাজসেবক, শিক্ষাব্রতী আর কে পালের নামানুসারে এই রাস্তাটির নামকরণ করেছে। (৭) **রসময় বিশ্বাস রোড** : স্থানীয় বিশ্বাস বাড়ির রসময় বিশ্বাসের নামানুসারে রসময় বিশ্বাস রোড। (৮) **বাচস্পতি পাড়া** : বাচস্পতি বাড়ি ও পরিবারের অস্পষ্ট নাম পাওয়া যায় এখানে। সম্ভবত তাদের

নামানুসারেই এই বাচস্পতি পাড়া রোড। (৯) **সৈয়দ আহমেদ রোড** : কুমোর পাড়াতে এই রাস্তাটি বর্তমান। এই রাস্তাটি বি টি রোড থেকে শুরু হয়ে ১৩নং রেল গেটে মিলিত হয়েছে। (১০) **মধু পণ্ডিত রোড** : এই রাস্তাটিও বি টি রোড থেকে শুরু হয়ে (ষষ্ঠীতলা থেকে) একেবারে ১৩নং রেলগেটে মিলিত হয়েছে। (১১) **মিডিল রোড** : ষষ্ঠীতলা থেকে শুরু হয়ে একটি রাস্তা ১৪নং রেল গেটে শেষ হয়েছে। রাস্তাটির নাম মিডিল রোড। (১২) **রায়বাগান রোড** : রায়বাগান ও সংলগ্ন টিটাগড়ের দিকে যাবার এই রাস্তাটির নাম স্থানীয় রায়বাগান নামের এই অঞ্চলের নামানুসারে হয়েছে। (১৩) **যোগেন রায় রোড** : যোগেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক। তাঁর নাম থেকেই এই রাস্তাটির নাম। (১৪) **রুইয়া রোড** : ওল্ড ক্যালকাটা রোড থেকে একটি রাস্তা রুইয়া গ্রামের দিকে চলে গেছে। রুইয়া গ্রামের সাথে এই রাস্তাটি বারাকপুর স্টেশনে যাবার একটা উন্নত মাধ্যম। (১৫) **পূর্বাচল রোড** : ওল্ড ক্যালকাটা রোড থেকেই একটি রাস্তা, পান পাড়ার দুটি অংশের সাথে মিলিত হয়েছে। রাস্তাটির নাম পূর্বাচল পাড়া রোড। রাস্তাটি সামান্য বাঁক নিয়ে সোজা পূর্ব দিকে চলে গেছে বলেই এই নাম।

তালপুকুরের কয়েকটি ক্লাব

(১) **মিলন সংঘ** : তালপুকুর নতুন পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত এই মিলন সংঘ এলাকার সমাজসেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। (২) **বন্ধুমহল** : দীপকনগরে অবস্থিত এই ক্লাবটির বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর। ক্লাবটি এই অঞ্চলের একটি সেবা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন উৎসাহী প্রেরণামূলক খেলাধূলার আয়োজক। প্রায় প্রত্যেক বছর রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে এরা। (৩) **বিবেকানন্দ সংঘ** : স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিতে কয়েকজন যুবক একজোট হয়ে সমাজ কল্যাণমূলক কাজে অংশ নেওয়া। প্রত্যেক বছর শিশু প্রতিভা অন্বেষণের জন্য বসে আঁকো প্রতিযোগিতার এরা আয়োজক। এদের ক্লাব শিশুদের খেলাধূলার জন্য একটি বিশেষ বিভাগ আছে। (৪) **জাগৃতি সংঘ** : এই ক্লাবটি সমাজ সেবা, নাটক, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে তালপুকুর অঞ্চলের বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। ক্লাবটির লাইব্রেরি বিভাগ খুবই জনপ্রিয়। (৫) **বারাকপুর জিমিনিসিয়্যাম** : এই ক্লাবটি মূলত ব্যায়ামাগার। অথচ শরীরচর্চার সাথে এদের গ্রন্থাগার বিভাগটিও গর্ব করার মতো। (৬) **অন্বেষা ক্লাব** : এর ক্রীড়া বিভাগটি এবং গ্রন্থাগার বিভাগটি খুবই উন্নত। (৭) **উত্তরণ সংঘ** : মাত্র তিন বছর আগে জন্ম নেওয়া উত্তরণ সংঘ জন্মলগ্ন থেকেই শিশুদের নিয়েই হৈ চৈ করতে ভালোবাসে। এই ক্লাবের গ্রন্থাগার বিভাগটি নাম উত্তরণ পাঠচক্র। (৮) **একতা** : মাত্র ছয়মাস আগে গড়ে উঠেছে এই সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান।

তালপুকুরের কয়েকটি অঞ্চল

(১) **দীপক নগর** : সমাজ সেবক দীপক মজুমদারের স্মৃতিতে এই দীপক নগর। একসময়

বাংলাদেশ থেকে আগত বহু শরণার্থী এখানে স্থান করে নিয়েছেন। (২) **অরবিন্দ পার্ক** : এই অঞ্চলটি এক সময় 'ধান শুকানোর চাতাল' নামে পরিচিত পেতো। ১৯৮৩ সালে এই অঞ্চলটি 'অরবিন্দ পার্ক' নামে পরিচিত হয়। (৩) **মুক্তাপুকুর** : কথিত আছে এই অঞ্চলের একটি পুকুরে শামুকের মধ্যে মুক্তো পাওয়া গিয়েছিলো। সেই থেকেই এই অঞ্চলের নামকরণ করা হয়। (৪) **নতুন পল্লী** : দু'তিন ধয় পরিবার নিয়ে এখানে প্রথম বসতি গড়ে উঠেছিল। প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিলো একেবারে পল্লীগ্রামের মতো। (৫) **নতুন পাড়া** : এই নতুন পাড়া, নতুন পল্লীর পরেই আরম্ভ। একেবারে রুইয়া গ্রামে গিয়েই শেষ। জনবসতি নতুন পল্লীতে একটু বেশ হয়ে গেলে সেখানে স্থান সংকুলান না হবার কারণেই নতুন পাড়ার জন্ম। (৬) **রায়বাগান** : রায়বাড়ির ও রায় পরিবারের একটি বাগান বাড়ি এখানে ছিলো। বাগানবাড়ির নামানুসারে এই নাম। এখানে একান্নবর্তী পরিবার বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। (৭) **কুমোরপাড়া** : বি টি রোড সংলগ্ন কুমোরপাড়া একসময় বিস্তৃতভাবে পাল পরিবারের ও হাঁড়ি-কলসি ও প্রতিমা শিল্পীদের একসঙ্গে বাসস্থান ছিলো। বর্তমানে এখনও বহু মৃৎ শিল্পী আছেন। তবে অনেকেই পৈত্রিক পেশা ছেড়ে অন্য পেশাতেও যোগ দিচ্ছেন। এখানেও বনেদী ও একান্নবর্তী পরিবার চোখে পড়ে। (৮) **দাসপাড়া** : ওল্ড ক্যালকাটা রোড রোড সংলগ্ন খুব স্বল্প পরিসরে কয়েকঘর পরিবার নিয়ে এই দাসপাড়া গঠিত। (৯) **খালপাড়** : একটি খাল তালপুকুর অঞ্চল দিয়ে বয়ে হুগলী নদীতে পড়েছে। বড় পোলের আগে পর্যন্ত একটি বসতি এই খালের দু'দিক ঘেঁষে গড়ে উঠেছে। তাকে 'খালপাড়ের বসতি' বলে। (১০) **পানপাড়া** : পানপাড়ার কিছুটা তালপুকুর ও কিছু অঞ্চল নোনাচন্দনপুকুর ডাক ঘরের অন্তর্ভুক্ত। পান পাড়ার পূর্বদিক জুড়ে একসময় বহু পানের কারবারী বাস করতেন। পান পাড়াতে একুশটি লেন ও বাইলেন আছে। (১১) **আদিবাসী পল্লী** : পান পাড়ার ঠিক মধ্যাঞ্চলে বহু আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাস রয়েছে এখানে।

তালপুকুর অঞ্চলে দুটি বাজার

(১) **তালপুকুর বাজার** : এই অঞ্চলে এই বাজারটি বিশেষ জনপ্রিয়। সাধারণ, মিল শ্রমিক ও বহু মানুষ এই বাজার থেকে বাজার করেন। প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যাতে (আংশিক) বাজার বসে। এই বাজারে প্রত্যহ গড় উপস্থিতি ৩৫০০জন। বাজারটি শুরু হয়েছিলো ১৯২৩ সালে। (২) **ভেড়ীর বাজার** : ভেড়ীর গেট সংলগ্ন এলাকাতে বাজারটি বসে। বাজারটি সমগ্র রুইয়া ও নালীর মাঠ পদ্মপুকুর এলাকার মানুষের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় (আংশিক) বাজার বসে। দৈনিক গড় উপস্থিতি ৮৫০ জনের মতো হয়ে থাকে। বাজারটির বয়স খুব বেশি নয়। ১৯৯৫ সালে শুরু হয়।

তালপুকুর অঞ্চলে কয়েকটি ঘাট রয়েছে। এগুলি হল রাণী রাসমণি ঘাট, বারানসী ঘাট এবং জগদ্ধাত্রী ঘাট।

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট কবি

কালিয়ানিবাসের কথা

রতন দাশগুপ্ত

ভারত স্বাধীন হবার পর ১৯৫২ সালে ২৪ পরগণা জেলার বারাকপুর মহকুমাতে কালিয়ানিবাস কো-অপারেটিভ কলোনী স্থাপিত হয়। পূর্ববঙ্গ থেকে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুরা অনেকেই কলকাতার আশেপাশে বাঁচার তাগিদে জমি-জায়গা দখল করে বসে পড়েন। কেউবা সমবায়ের মাধ্যমে জমি কিনে ছোট ছোট প্লট করে উপনগীর গড়ে তোলেন। যাঁরা সে সময় কালিয়ানিবাস গড়ার উদ্যোগ নেন, তাঁরা সকলেই কালিয়ার লোক। কালিয়া হলো যশোহর জেলার অন্তর্গত বৈদ্যপ্রধান গ্রাম। বর্তমানে বাংলাদেশের একটা উপজেলা। তারপর পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলার লোক এখানে বসতি স্থাপন করেন।

কারা-কারা সেসময় উপনগরী স্থাপনে অংশগ্রহণ করেন

স্বনামধন্য ডাক্তার নরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রী অমূল্য দাশগুপ্ত, মাখনলাল দাশগুপ্ত, এছাড়া হেম রায়, শ্রী অশ্বিনী চক্রবর্তী অন্যতম। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন কৃষ্ণকুমার শুক্লা, ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ বাগচী প্রমুখ। কমিটির বাইরে থেকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ সহযোগিতা করেছিলেন মানিক দাশগুপ্ত, নরেশ দত্ত, কিরণ চক্রবর্তী, উদিত জোয়ারদার, রণজিৎ আশ, প্রাইমারী স্কুল নির্মাণের ক্ষেত্রে এঁরা প্রভূত সাহায্য করেন। বর্তমান সেক্রেটারী রথীন বিশ্বাস।

বড় পাকা রাস্তা বলতে জে আর আর রোড-টাই ছিল মূলতঃ ডিফেন্সের জন্য। ঘুসিপাড়া থেকে রেললাইনের পূর্ব থেকে ১৭নং রেলগেট পার হয়ে পূর্বদিকের এরোড্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তখন পলতা স্টেশন যেতে হলে হয় রেল লাইনের উপর দিয়ে কিংবা ঘোষপাড়া রোড ধরে বেঙ্গল এনামেলের পাশ দিয়ে যেতে হতো। সে সময় রেলগাড়ি খুব কমই পলতা স্টেশনে থামত। যাতায়াতের জন্য ৮৫নং বাস ছিল আর দিনের বেলায় রিক্সা চলত। রাতের বেলায় রিক্সা খুব কম চলত। বারাকপুর স্টেশন থেকে রিক্সার ভাড়া ছিল চার আনা। লালকুঠি থেকে পলতা পর্যন্ত রাস্তার দুধার ফাঁকা ছিল।। শঙ্খবণিক কলোনী তখন ছিল না। ঘুসিরা ছিলেন ঝুপড়ি ঘরে, দুধের ব্যবসা ছিল। লালাজির দোকান, বেঙ্গল এনামেল ও পোস্ট অফিস ছিল। আর সব ফাঁকা। বর্তমানে রাস্তার সংস্কার হয়ে মেইন রোড ও স্কুল রোড পিচ ঢালা হয়ে পলতা স্টেশনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চলাচলের সুবিধা হয়েছে। পূর্বদিকে (মিলন পার্ক)

বিস্তৃত একটি পাকা রাস্তা খাল থেকে জে আর আর রোড পর্যন্ত ১৯৮০ সালে পরিকল্পনামাফিক হয়। তাছাড়া বাইলেনের এ, বি, সি, ডি চারটি রাস্তা কালিয়া নিবাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইঁট বিছানো সোলিং করা।

কালিয়ানিবাস উপনগরীর কর্ণধার কারা ছিলেন

প্রফুল্ল দাশগুপ্তের জন্মস্থান ছিল কালিয়া, যশোহরে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বারাকপুরের অধিবাসী ছিলেন। আনন্দপুরীতে তার বাড়ি ছিল। তিনি উচ্চ শিক্ষিত, বিলাতি ডিগ্রি প্রাপ্ত। তিনি মনে করতেন শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের সচেতনতা আনতে হবে। স্কুলের মাধ্যমে সেটার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায়। স্থাপন করলেন মা ও বাবার নামে এ বি মডেল স্কুল—অম্বিকা-বিমলা মডেল স্কুল। এটি ১৯৪১ সালে স্থাপিত হয়। কালিপদ সেন তৎকালীন ২৪ পরগণার জেলাশাসক কালিয়ার ছাত্র ছিলেন। কালিয়ানিবাস পরিদর্শন করতে এসে শিক্ষাগুরুকে ভুলতে পারেননি, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। খেলার জগতে কালিয়ার বাসিন্দা প্রণব সেন। প্রফুল্লবাবুর কণিষ্ঠ সহোদর অমূল্য দাশগুপ্ত এখানে শিক্ষকতা করতেন। বারাকপুর টাউন কংগ্রেসের সেক্রেটারী ছিলেন নট ও নাট্যকার হিসেবে এখানে সকলে শ্রদ্ধা করতেন।

বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর ও রবিশঙ্করের বাড়ি ছিল কালিয়াতে। উদয়শঙ্কর ও রবিশঙ্করের বাবা আলেয়াস্ট্রেটের দেওয়ান ছিলেন। প্রায় ৩০ বছর আগে বারাকপুরের চম্পা সিনেমা হলের শো করতে এসেছিলেন। নরেশবাবু মাখনবাবু ও অমূল্যবাবু উদয়শঙ্করকে কালিয়ানিবাস পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ করেন। উদয়শঙ্কর খুশি হয়ে বললেন, এইমাত্র প্লেন থেকে নেমে এসেছি, বড্ড ক্লান্ত না হলে এই সুযোগ ছাড়তাম না। কলকাতা হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস ও অস্থায়ী গভর্ণর কুলোদা দাশগুপ্ত, আই সি এস কালিয়া নিবাস পরিদর্শন করে গেছেন।

বারাকপুর কালিয়ানিবাস তৈরি হবার প্রচেষ্টার মধ্যে আর একটি প্রস্তাব এসেছিল শ্রী বিনয়কুমার দাশগুপ্তের কাছ থেকে। কালিয়ায় দু'জন বিনয় দাশগুপ্ত ছিলেন। একজন বিধান রায়ের মন্ত্রীত্বের সময় অর্থ সচিব আর একজন ছিলেন দেশহিতৈষী, বিপ্লবী, সুশীল দাশগুপ্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাদের পরিকল্পনা ছিল দুর্গাপুরের কাছে রাজবাঁধের কাছে কালিয়ার লোকদের নিয়ে বসতি স্থাপন করা। সে পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

স্বাধীনতা সংগ্রামী

বসন্ত আশ শিক্ষক ছিলেন ১০৪ বছর বেঁচেছিলেন। অধরচন্দ্র আশ, স্ত্রী শৈলরাণী আশ স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন। রঞ্জিত আশ, অমূল্য দাশ, সন্তোষ দাশগুপ্ত (অ্যাডভোকেট) পূর্বপাকিস্তানের জেলে ছিলেন। তার ভাই পরিতোষ পূর্ব পাকিস্তানে বিপ্লবী হিসেবে জেল খেটেছেন।

চিত্রশিল্পী : অমূল্য দাশ, চিত্ত দাশগুপ্ত ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ। সুনীল দাশগুপ্ত (জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া)। অহিভূষণ মালিক (কার্টুনিস্ট) দেশ পত্রিকা। জিতেন দাশগুপ্ত (ফ্রিল্যান্স আর্টিস্ট)।

ব্যবসার জন্য উন্নতি লাভ করেছেন : হীরালাল সেন কলকাতায় নামকরা ব্লক মেকার। স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্ক প্রাইভেট লিমিটেড সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ছাপাইয়ের ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় নাম। ভারত সরকারের কাছ থেকে ছাপা অলংকরণের জন্য পুরস্কারপ্রাপ্ত।

সাহিত্য পত্রিকা : অঙ্কুর : দীর্ঘদিন চলার পরে উঠে যায়। শ্রীপর্ণ : ১৯৯৪ সাল থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে অসিত দত্ত ও দেবেন বিশ্বাসের সম্পাদনায়।

বারাকপুর বার্তা : পরেশ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় বারাকপুর বার্তা কালিয়ানিবাস থেকে প্রকাশিত। দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে প্রকাশ পাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ২০০১ সালে যে তিনজন ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে পরেশ চক্রবর্তী অন্যতম।

অক্ষরা : সাহিত্য পত্রিকা, প্রকাশিত হয় ১৪০৫ বঙ্গাব্দে। শারদ সংখ্যা হিসেবে নিয়মিত প্রকাশ পাচ্ছে।

ধর্মীয় সংস্থা : এখানে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩৭৬ সালে. যদুগোপাল সেন মহাশয় মন্দিরের জমি দান করেন। যদুবাবু এই মন্দির উৎসর্গ করেন মা সরোজিনী দেবীর নামে। ১৭নং রেলগেটের কালিয়ানিবাসে কালিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

কালিয়ানিবাস পাঠচক্রের নবরূপায়ণ : বাংলা ১৩৭১, ইং-১৯৬৪ পাঠচক্র স্থাপিত হয়। নবরূপায়ণ হয় ইং-২০০০। পাঠচক্রের চারবার স্থান পরিবর্তন হল। স্থায়ী বাসগৃহ প্রয়াত মাখনলাল দাশগুপ্তের বদান্যতায় এককাঠা জমির উপর গড়ে ওঠে। তিনি এ জমি দান করেন। ১৯৬৪ সালে কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকে। বর্তমানে পাঠাগারের প্রেসিডেন্ট রথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও সম্পাদক হরেন্দ্রচন্দ্র রায়। সদস্য ১৪৮জন। পুস্তক সংখ্যা দু'হাজার মতো।

লেখক পরিচিত : বিশিষ্ট লেখক

শঙ্খবণিক সম্প্রদায়

প্রলয় ভট্টাচার্য

ঘোষপাড়া সড়কে (জিপি রোড) পলতা আর লালকুঠির মাঝখানে ঘুসিপাড়া বাস স্ট্যান্ড। এখানে নেমে, হেঁটে দক্ষিণে লালকুঠি আসলে দু'পাশে দেখা যায় অসংখ্য শাঁখার দোকান। শাঁখা তৈরি আবার বিক্রি এঁদের শিল্প আর পেশা। এঁরাই শঙ্খবণিক সম্প্রদায় নামে পরিচিত। এঁদের আদি বাসস্থান পূর্ববঙ্গের ঢাকা।

১৯৫৫ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে এদেশে চলে আসেন। সরকার শঙ্খবণিক সম্প্রদায়কে গুমা-হাবড়ায় জায়গা দিতে চাইলেও এখানকার শাঁখারীরা কম জায়গায় দলবদ্ধ থাকারই পক্ষপাতী ছিলেন। বেছে নিলেন সড়কের পাশেই খানাখন্দ ঝোপ ঝাড়ে নিঃঝুম এক জায়গা—ঘুসিপাড়া! মুসলিম 'ঘোসী' থেকেই এসেছে এই ঘুসিপাড়া নামটি। তখন পলতা বাসস্ট্যান্ড থেকে সোজা তাকালে দেখা যেত লালকুঠির অবস্থানকে। এতটাই বসতিবিরল জায়গা ছিল। এন্তার লুঠতরাজ, আতঙ্ক আর ভয়—এতো ছিলই। বিরূপতা, বিরুদ্ধতা, ডাকাতের ভয়—এসব শাঁখারীদের ধারে কাছে ঘেঁষত না।

এখন এখানে বড় ছোট মিলিয়ে প্রায় ৩০ টির বেশি দোকান। যান চলাচল, জমাট বসতিপূর্ণ অঞ্চল এ মুহূর্তে। কালিয়ানিবাসের লাগোয়া ঘুসিপাড়া-লালকুঠির অন্দরে শাঁখারীদের বসবাস যেন বারাকপুর মহকুমায় এক মাঙ্গলিক চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। এঁদের আর কোনও পেশা নেই। পরম্পরাভিত্তিক এঁরা শাঁখারী। শঙ্খ শিল্পের কারিগরী শিক্ষাও এখানে পরম্পরা অনুসারী, নিজস্ব চৌহদ্দিতে ঘেরা। শঙ্খশিল্পে দক্ষতা অনুযায়ী, শ্রম বিভাজন একটা উল্লেখ্য বিষয়। একজন শ্রমিক যিনি, তিনি সব কাজ শেখেনও না, করেনও না। শাঁখারী পাড়া একটাই, প্লট ভাগে বিভক্ত। তিন হাজার পাঁচশো শাঁখারীর বসবাস এ পাড়ায়।



শঙ্খশিল্পের কাজে ব্যস্ত। ছবি : মণি ভট্টাচার্য

এঁরা সম্প্রদায়গত নিজস্ব ব্যবসায় অনুগত ও নিবেদিত প্রাণ। নাথ, সুর, রক্ষিত পদবীধারী বেশি এখানে। গোটা শ্রাবণ মাস এ পাড়া উৎসবের চেহারা নেয়। বারো মাসে তেরো পার্বণ থাকলেও, মনসা দেবী এঁদের আরাধনার কেন্দ্রবিন্দুতে। এখানকার

অনেক ঘরে 'মা মনসা' প্রতিষ্ঠিত। শ্রাবণের সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে মহিলারা ''মনসামঙ্গল'' পাঠ করেন। সংক্রান্তিতে পুজো। আলো-মাইক-বাদ্য-প্যান্ডেল-শোভাযাত্রা-গঙ্গাস্নান-দণ্ডীকাটা-মানত, এঁদের পুজোর জাঁকজমক ও সংস্কারের দিক।

বঙ্গে এঁদের ব্যবসা এখন ততটা ফলাও নয়, তবে বিহারের সঙ্গে বাণিজ্য চলছে বলে জনৈক শাঁখারী জানালেন।

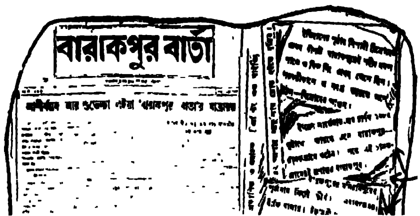
এই শাঁখারী পাড়ায় তৈরি হয়—শাঁখের আংটি, জলশঙ্খ, বাদ্য শঙ্খ। হাতের শাঁখার মধ্যে রয়েছে—কড়ি শাঁখা, গোলদোয়ানী, লম্বা দোয়ানী, পাটি শাঁখা, পিনা শাখা, ঝাঝি শাঁখা, চোত্‌তা আর কন্যাকুমারী। বাঙালি কনে বৌ বিয়ের আসরে এই 'কন্যাকুমারী' শাঁখাই হাতে পরেন।

শাঁখ থেকে এক একটা জিনিস তৈরি হয়—তারজন্য দরকার হয় যন্ত্রপাতি আর শাঁখাশিল্পীর নিষ্ঠা শ্রম। যন্ত্রের নামগুলি এরকম—শাঁখের করাত, হাতুড়ি, ফাই, ছেনি, দেরাল, বুলি, একধারা, গোলফাই।

লেখক পরিচিতি : লেখক ও প্যালিনড্রোমিস্ট

বারাকপুর বার্তা

প্রেসের নাম বার্তা প্রেস। বারাকপুরের, নোনা-চন্দনপুকুর ডাকঘরের অন্তর্গত পূর্ব কালিয়ানিবাসে একটি ঘিঞ্জি জায়গাতে বার্তা প্রেস, সেকেলে লেটার প্রেস। 'বারাকপুর বার্তা' একটি পাক্ষিক সংবাদপত্র। এই প্রেস থেকেই প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন বিশিষ্ট এক প্রচারবিমুখ সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক পরেশনাথ চক্রবর্তী। পত্রিকাটি দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর একটানা চলতে চলতে এখন অনিয়মিত। কারণ, আর্থিক অনটনের তীব্রতা, এবং সম্পাদক মশাই সম্প্রতি দু'বার হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া। 'বারাকপুর বার্তা' ইছাপুর থেকে দেওয়াল পত্রিকা হিসাবে প্রথম বের হয় ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। পাক্ষিক এই পত্রিকাটি ছিল স্থানীয় সংবাদভিত্তিক। এই ছোট্ট কাগজে রাজনৈতিক বিষয়, বির্তক, সম্পাদকীয়, সাহিত্য, সিনেমা, পুস্তক/পত্রিকা পর্যালোচনা সমস্তই একা হাতের কাজ সম্পাদক মশাইয়ের। বারাকপুর শহরের বাইরে ও নানা ঘটনা এখানে থাকে। 'ব্যারাকপুর' কেটে ''বারাকপুর'' লেখার তিনি ছিলেন এক আগ্রহীপুরুষ। পঁয়তাল্লিশবছর আগে তিনি ''বারাকপুর'' লেখার কারণে ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ইত্যাদিতে হয়েছিলেন প্রধান সমালোচনার কারণ।


বারাকপুর বার্তা

তথ্যসূত্র : অরিন্দম ঘোষ

ষষ্ঠ অধ্যায়

লাটসাহেবের বাড়ি, বাগান এবং চিড়িয়াখানা

—কানাইপদ রায়

বারাকপুরে লাটভবন তৈরির পূর্বেই কলকাতায় লাটসাহেবদের থাকার জন্য বাড়ি তৈরি কাজ শুরু করেছিলেন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি। তিনি ছিলেন বিলেতের অভিজাত বংশের সন্তান। যেমন তেমন বাড়ি হলে হবে না, তাই খরচও করলেন প্রচুর। এদিকে বারাকপুর জায়গাটাও ভীষণ ভালো লেগে গেল ওয়েলেসলির। সেখানে গভর্ণর জনারেলের থাকার পরিকল্পনা করে Alured Clark-এ চিঠি লিখলেন বাড়িটি ছেড়ে দেবার জন্য। ওয়েলেসলি কমান্ডার ইন-চিফের জন্য ৫০০ টাকা ভাতার ব্যবস্থা করে আলাদা একটা থাকার ব্যবস্থা করলেন এবং ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ১ ফেব্রুয়ারি বাড়িটির দখল নিলেন।

বারাকপুরের বাড়ি তার পছন্দ হলো না, এতে নানারকম ত্রুটি আছে। এ বাড়িতে থাকা নিরাপদ নয় বুঝে প্রকাণ্ড এক বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু করলেন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে বোর্ড অব ডিরেক্টরদেরকে না জানিয়ে। নির্মাণের কাজ এগিয়ে এলো অনেকটা। কিন্তু যখন বোর্ড অব ডিরেক্টরদের কাছে খবর পৌঁছলো তারা তো অবাক। এতবড় একটা কাণ্ড ঘটছে বারাকপুরে তারা জানতেই পারলনা। অর্থের যখন এত টানাটানি চলছে তখন এই বাড়ির জন্য অর্থ যোগান দেওয়া যাবে না। বোর্ড অব ডিরেক্টরস লিখলেন, 'Our surprise and astonishment have been much increased by the communications make to us by which we learn, notwithstanding the heavy finance already incurred on account of the Government House at Calcutta, that a building of considerable extent has been commenced at Barrackpore for the residence of the Governor General, this too at a time when our finances are in a state of the utmost embarrassment, and when we are called upon to make the greatest exertions to supply you with funds from Europe to assist indefrayng the cxtraordinary expences of the war.'

একতলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে পদত্যাগ করে বিলেত ফিরে গেলেন ওয়েলেসলি। এদিকে লর্ড কর্ণওয়ালিস কার্যভার গ্রহণ করেছেন। তিনি নির্মীয়মান বাড়িটিকে ভেঙেই দিলেন। এই বাড়ির ৭০০ গজ উত্তর পূর্বে ওয়েলেসলি আর একটি অস্থায়ী ভবন নির্মাণ করেছিলেন। সেই বাড়িটিই ধীরে ধীরে লাটভবনের রূপ নিলো। জর্জ বারলো ১৮০৫ খ্রীঃ থেকে ১৮০৭ খ্রীঃ পর্যন্ত গভর্ণর জেনারেল ছিলেন। তিনি দক্ষিণের বারান্দার কোণগুলিকে ছোট-ছোট ঘরে রূপান্তরিত করলেন। লর্ড হেস্টিংস (১৮১৩-২৩) ভবনটিকে বাড়িয়ে দিলেন এবং গাড়ি বারান্দার ব্যবস্থা করলেন। এভাবে গভর্ণর জেনারেলের পরিবারের লোকজন ছাড়াও অতিথিদের থাকার ব্যবস্থা করা হলো। লর্ড অকল্যান্ড (১৮৩৬-৪২) পশ্চিমদিকে ব্যালকনি ঝুলিয়ে দিলেন। লর্ড লিটন (১৮৭৬-৮০) সিঁড়ি ভেঙে ফেলে (যেটা ছিল 'undignified iron stair case') নতুন সিঁড়ি করলেন। লর্ড রিপন (১৮৮০-৮৪) সিঁড়ির কাছে কাঠের খিলান করালেন। লর্ড মিন্টো (১৯০৫-১০) বিদ্যুৎ সংযোগ করে সমস্ত ভবনটিকে আলোকিত করলেন। এভাবেই গড়ে উঠল লাটভবন।

লাটসাহেব যখন কলকাতার গভর্ণর হাউস থেকে বারাকপুর আসতেন তখন কলকাতার গভর্ণরহাউস থেকে পতাকা উড়িয়ে সংকেত দিত পাইকপাড়া টাওয়ারকে, সেখান থেকে সংকেত দেওয়া হতো সুখচর টাওয়ারকে, সেখান থেকে আবার সংকেত চলে আসত বারাকপুর লাটভবনে।

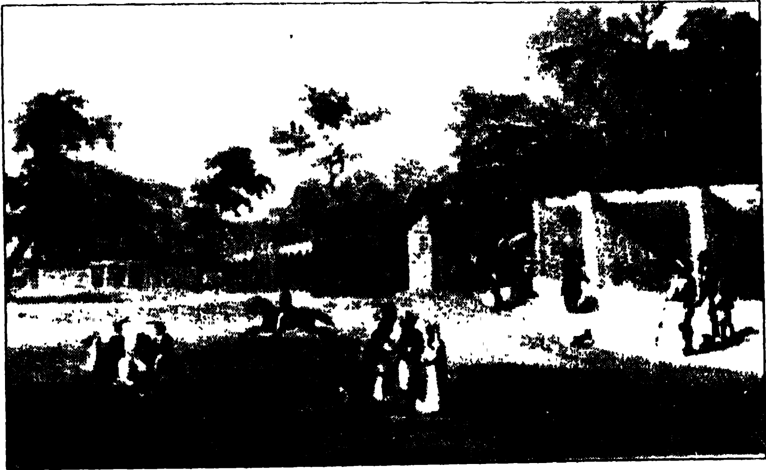


Government House, Barackpore
১৮৬০ সালের আঁকা
সৌজন্য : *Colesworthy Grant,*

সাহিত্যিক চণ্ডিদাস চট্টোপাধ্যায় সূত্রে উপরের লাটভবনের ছবিটি প্রাপ্ত।
বিখ্যাত ইংরেজ চিত্রশিল্পী কোলস্‌ওয়ার্দি গ্রান্ট উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ভারতে এসেছিলেন। কলকাতা থেকে গঙ্গানদীর দুপাশ দেখতে দেখতে ভ্রমণ করেন ও ছবি আঁকেন। সম্ভবতঃ ১৮৬০ সালে এই চিত্রটি এঁকেছিলেন। বিভূতিভূষণের 'ইছামতি'তে কোলস্‌ওয়ার্দি গ্রান্ট-র কথা পাওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর ওপর একটি বই লিখেছিলেন। তিনি কলকাতাতেই দেহত্যাগ করেন। রাইটার্স বিল্ডিং-এর কাছে তাঁর সমাধি আছে। —চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়

কমান্ডার ইন-চিফের বাড়িটি কেনার পরই পার্ক গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন ওয়েলেসলি। প্রায় ৩৫০ একর জমি নিয়ে গড়ে উঠল পার্ক। পার্কের ভিতরে ফুল আর সবুজের সমারোহ পার্ককে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। পার্কের পাশে রাস্তার ধারে মেহগনি সহ্ আরও মূল্যবান গাছ আজও সেদিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই পার্কে গড়ে উঠেছিল পশু উদ্যান।

পশু উদ্যানে বাঘও ছিল। একবার এক বাঘ দারোয়ানের নজর এড়িয়ে উদ্যান থেকে বেরিয়ে দু'তিনটে ষাঁড়কে মেরে ডেপুটি গভর্ণরের অশ্বশালায় ঢুকে সেখানে একটি ঘোড়ার লাথি খায় এবং শেষে মালি তাকে গুলি করে। — 'One of the tiger in the Menagerie at Barrackpore got loose on Saturday evening north, as on the last occasion, from a frelic of the unposted–but through the carelessness of the keeper. After a having put to death two or three bullocks, he walked in the



বারাকপুর চিড়িয়াখানা (১৮২০)

The Barackpore Menagerie, c 1820

সৌজন্য : *M.*

[সাহিত্যিক চণ্ডিদাস চট্টোপাধ্যায় সূত্রে উপরের চিড়িয়াখানার ছবিটি প্রাপ্ত। বারাকপুর লাটবাগানে লর্ড ওয়েলেসলির আমলে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে জীবজন্তু আনা হয় ও গাছপালা লাগানো আরম্ভ হয়। বিখ্যাত চিকিৎসক ও ভ্রমণকারী স্যার ফানিস বুকানন হ্যামিল্টন প্রথমে লর্ড ওয়েলেসলির ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং পরে তিনি বারাকপুরের চিড়িয়াখানার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ দেশীয় চিত্রকরদের দিয়ে ছবি আঁকিয়েছিলেন। তার মধ্যে থেকে এই চিড়িয়াখানার ছবিটি গ্রহণ করা হয়েছে। — চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়]

"As early as 1800 the Marquis Wellesley had order the collection of birds and quadrupeds at Garden Reach for his proposed Fort William College. When the Directors who didnot share his intellectual curiosity vetoed this scheme, he endeavoured to achieve a similar end through the institution for promoting the natural History of India. This was established in 1804 at Barrackpore with a menagerie and aviary and came to be popularly known as 'The Barrackpore Menagerice. The institution was placed under the supervision of Francis Buchanan (1762–1829), who had been attached to Governor General's staff as sugean since 1803 (Natural History of Drawing, India Office Libary–London 1962).

Deputy-governor's stables, where he received a kick from a horse he attempted to attack and was inventually shok by one of the part gardeners–Wednessday, January 14th. Thursday January 15th 1846, Friends of India."

বারাকপুর স্টেশন থেকে পশ্চিম বরাবর অগ্রসর হলে 'চিড়িয়ামোড়' নামটি আজো চিড়িয়াখানার স্মৃতি বহন করে চলেছে। ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড বেন্টিংক এখানে হাতির পিঠে ঘুরে বেড়াতেন। বড়লাট আর তার বোন লেডি ইডেন চিড়িয়াখানাকে সুন্দরভাবে সাজানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু সেই চিড়িয়াখানা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। লর্ড ক্যানিং-এর সময় কোনরকম টিকে থাকলেও বড়লাট লর্ড লিটন চিড়িয়াখানাকে একেবারে চিড়িয়ামুক্ত করে দেন। আলিপুর চিড়িয়াখানা তৈরি হলে পশুপাখি সব সেখানেই আশ্রয় নেয়। তবে আজও বারাকপুর চিড়িয়াখানার কচ্ছপটি আলিপুরে তিন শতাব্দীর স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছে।

প্রায় দুশো বছর পূর্বে সংবাদপত্রের একটি প্রতিবেদন
সমাচার দর্পণ
২৫ অগস্ট ১৮২১ । ১১ ভাদ্র ১২২৮

চাণক — মোকাম চাণকে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের যে বাগান আছে তাহাতে নানাদেশীয় নানাবিধ পক্ষী ও জন্তু আছে তাহা দেখিলে আশ্চর্য বোধ না হয় এমতলোক নাই যেহেতুক সকল দেশে সকল নাই। ঐ বাগানে হরিণ আছে তাহার মধ্যে এতদ্দেশীয় দুই তিনপ্রকার আছে ও অন্য ২ দেশীয় নীলসা নামে একপ্রকার হরিণ আছে সে ঘটকের মত উচ্চ ও অতি দুর্ব্বিৃত্ত ও অতিশয় শৃঙ্গবিশিষ্ট এবং শ্বেতবর্ণ একপ্রকার হরিণ আছে তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ। চট্টগ্রাম নিকটস্থ পার্ব্বতীয় চারিপাঁচ গরু আছে তাহার দিগকে দেখিলে গরু বোধ হয় না। সে গরু অত্যুচ্চ ও কৃষ্ণবর্ণ ও বৃহৎ শৃঙ্গ অদ্ভুতাকার দেখা যায়। এবং ইংগ্লন্ডীয় এক বলদ আছে তাহার শরীর অতিশয় সুখস্পর্শ। ব্রাঘ্র চারিপাঁচ প্রকারের দশ বারোটা আছে তাহার মধ্যে

একস্থানে এক কৃষ্ণবর্ণ ব্রাঘ্র আছে। আর এক স্থানে এইদেশীয় বৃহৎ তিনটে ব্রাঘ্র থাকে। অন্য এক স্থানে এক ব্রাঘ্র আছে তাহার গায় গোল২ চক্রাকৃতি চিহ্ন।

একস্থানে সিংহের স্ত্রীপুরুষ দুই আছে তাহার বয়স দেড় বৎসর সে পাণ্ডুবর্ণ নির্ম্মল শরীর তাহার লাঙ্গুল গোলাঙ্গুলাকৃতি কিন্তু অতিশান্ত যাহারা আহারাদি দেয় তাহাদের কথানুসারে সে চলে। ছোট২ চারি পাঁচ ব্রাঘ্র আছে তাহার মধ্যে একটা ব্রাঘ্র সে খোলাসা ও মনুষ্যের দ্বেষ করে না ও সে মনুষ্যের মত খাটে শয়ন করে ও লোক নিযুক্ত আছে তাহাকে বাতাস করে। এবং শুনা যায় শ্রীশ্রীযুত যখন সীকার দেখেন তখন ঐ ব্রাঘ্র সীকার করে। দুই তিনটা স্যাগস আছে তাহারা খাটে শয়ন করে তাহাদের শরীরে বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া রাখে।

কাঙ্গরু নামে নবহলন্ডীয় এক জন্তু সে দুই প্রকারে চারিটা আছে তাহার মধ্যে এক স্থানে ছোট জাতি একটা ও অন্যস্থানে বড় জাতি তিনটা আছে। তাহার সম্মুখে দুই পা অতি ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল ও পশ্চাদের দুইপা বড় ও সবল সেই পায়ে লম্ফ দিয়া চলে সে পায়ে তিনটা নখ। সেই জন্তুর একটা বাচ্চা আছে লোকে কহে যে সে বাচ্চা গর্ভ হইতে নির্গত হয় ও ইচ্ছামত গর্ভে প্রবিষ্ট হয় সেকথা কিছু নয়। কিন্তু তাহার বক্ষঃস্থল অবধি তলপেট পর্যন্ত একটা থৈলীর মতো আছে তাহার স্তনও সেই থৈলীতে আবৃত ঐ বাচ্ছা সেই থৈলীর মধ্যে থাকিয়া স্তন পান করে কখন২ ইচ্ছা মত বাহির হইয়া থাকে। সে হউক সে অতি আশ্চর্য বটে এমত কোন জন্তুর নাই।

আর দুই তিনটা জন্তু উটের মতো আকৃতি কিন্তু ছোট ও শরীর সমান। আর এক গণ্ডারের বাচ্ছা আসিয়াছে তাহার খড়্গ প্রকাশ রূপে অদ্যাপি ওঠে নাই কিন্তু নখুদ হইয়াছে সে অতি শান্ত অনায়াসে লোকেরা তাহার শরীরে হস্ত দেয়। তাহার শরীরে লোম নাই ও অতি কঠিন শরীর। আর গর্দ্দভের আকার এক বড় ঘোড়া আছে সে পীত বর্ণ ও দেখিতে অতি সুন্দর লোকে কহে যে ঐ ঘোড়া একদিনের মধ্যে পঞ্চাশ ক্রোশ চলিতে পারে কিন্তু কেহ কদ্যাপি তাহার উপরে সওয়ার হয়নাই। এবং তিন চারি পাঁচ ভালুক ও দুই তিন প্রকার বানর ও দুই তিন প্রকার বিড়াল আছে। এবং কাশ্মীর দেশের দুইটা ছাগল আছে তাহার লোম অতি কোমল তাহাতে শাল জন্মে। এবং এক বৃহৎ পক্ষী আছে তাহার গলা অতি দীর্ঘ ও ঘোড়ার পায়ের মতো তাহার পা সে লোককে পদাঘাত করিয়া মারে আর নবহলণ্ডীয় একপ্রকার হংস আছে সে নীল বর্ণ ও তাহার ওষ্ঠ রক্তবর্ণ ও সে অতি মনোহর আর নূতন ২ অনেক ২ প্রকার পক্ষী আছে তাহার নাম সকল জানা নাই।

জানুয়ারি ১৮২৪ "... লাটসাহেবের একটি বাগানবাড়ি আছে বারাকপুরে, সেখানে ঘোড়দৌড়ের সময় কলকাতার লোকদের ভিড় হয়। এক সপ্তাহের জন্য আমরা বারাকপুরে গিয়েছিলাম, খুব ভাল লেগেছিল। লেডি আমহার্স্ট অনেক খরচ করে লাটভবনে বাজি পোড়ানোর উৎসব করেছিলেন। বারাকপুর থেকে পাঁচ মাইল

দূরে বর্ধমান রাজের জমিদারীর অধীনে একটি জায়গায় পুরানো দুর্গ দেখতে গিয়েছিলাম। রাস্তা খুব খারাপ বলে আমি বগি গাড়িতে না চড়ে হাতির পিঠে চড়ে গিয়েছিলাম। এর আগে কখনও হাতির পিঠে চড়িনি। হাতিটা হাঁটু গেড়ে বসল, তার গায়ে মই লাগিয়ে পিঠের উপর উঠে বসলাম। তারপর সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মন্থর গতিতে চলতে লাগল। মনে হল যেন একটা গোটা বাড়ি চারপায়ে ভর দিয়ে চলেছে।

মাঠ, খানাডোবা ও ধানের ক্ষেতের উপর তার বিরাট পদস্তম্ভ দিয়ে সশব্দে পিষে চলছিল। ক্ষেতের মধ্যে সরু আল দিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, যাতে ক্ষেতের ফসলের না ক্ষতি হয়। হাতিরও চলা দেখে মনে হচ্ছিল এ সম্বন্ধে সেও কম হুঁশিয়ার নয়। যেতে যেতে রাস্তার ধারে একজন ফকিরকে দেখলাম। বেশভূষা দেখলেই ফকিরকে চেনা যায়, কাউকে চিনিয়ে দিতে হয়না। পথের ধারে একটা মাটির গর্তের মধ্যে তার বাসা, ছেঁড়া মাদুর ও কাপড়ের টুকরো দিয়ে ঢাকা। ফকিরের অস্থিচর্মসার চেহারা দেখলে বোঝা যায় প্রায় অনাহারেই তাকে দিন কাটাতে হয়। এই গর্তটির মধ্যে পাঁচ বছর ধরে সে রয়েছে, হাজার অনুরোধ করলেও গ্রামের মধ্যে থাকতে চায় না। মাথার কাছে সারা রাত কঠোর আগুন জ্বালিয়ে রাখতে পারলে সে আর কিছু চায় না। ফকিরটি উত্তরপ্রদেশের লোক, সেখানে তার বিষয়সম্পত্তি থেকে কোনো কারণে বঞ্চিত হয়ে সে কলকাতায় আসে প্রতিকারের আশায়। কিন্তু তার কোনো আশা নেই দেখে শেষে ফকিরের বেশ ধরে এইভাবে জীবন কাটাতে আরম্ভ করে।

বারাকপুরের লাটভবনে একটি ছোট পশুশালা আছে, তাতে ভাল ভাল কয়েকটি বাঘ, চিতা ও হায়না রাখা হয়েছে। আমার আয়া একদিন বায়না ধরে বসল যে আমার সঙ্গে পশুশালায় সে বেড়াতে যাবে, কারণ তার হায়না দেখার খুব ইচ্ছে। সঙ্গে করে তাকে হায়না দেখতে নিয়ে গেলাম। হায়নার দিকে তাকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, "বিশেষ করে হায়না সম্বন্ধে তোমার এত কৌতূহল কেন?" প্রথমটা হেসে, তারপর হঠাৎ ডুকরে কেঁদে কেঁদে উঠে সে বলল, "আমি ও আমার স্বামী আমার কোলের সন্তানটিকে নিয়ে রাতে ঘুমিয়ে ছিলাম, এমন সময় একটি হায়না এসে চুপিসারে ছেলেটিকে তুলে নিয়ে জঙ্গলে চলে যায়। গ্রামের লোক তার পিছনে ছুটে শিশুটিকে উদ্ধার করে বটে, কিন্তু মৃত টুকরো টুকরো অবস্থায়। তাই আমার হায়না দেখার এত আগ্রহ।"

লাটবাগানের পুরোনো বটগাছটি উল্লেখ করতেই হয়। ১৯২৫ সালে তৎকালীন পার্ক সুপারিনটেনডেন্ট এক বৃদ্ধকে (যার জন্ম ১৮৩০ খ্রীঃ) গাছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন— "...the tree was there before the East India Company acquired the land in 1785". এর উচ্চতা ৮৫ ফুট এবং ৬০ হাজার বর্গফুট জায়গা নিয়ে এর বিস্তার।

পার্কের দক্ষিণ-পূর্বে লর্ড অকল্যান্ড গড়ে তুলেছিলেন ইডেন স্কুল। লর্ডের দুই

বোন কুমারী ইডেন-এর তত্ত্বাবধান করতেন।

বর্তমানে পার্কের পাশেই মহাত্মা গান্ধীর দেহাবশেষের স্মৃতি নিয়ে গান্ধীঘাট। নেহরুর নামে বাগানের নাম দেওয়া হয়েছে জহরকুঞ্জ। পুলিশ ট্রেনিং কলেজ, ডিটেকটিভ ট্রেনিং, এরকম রাজ্য সশস্ত্র বাহিনীর বেশ কয়েকটি বাহিনী এখানে রয়েছে।



লেডি এমিলি ইডেন
সৌজন্য : বারাকপুর রাষ্ট্রীয় উচ্চবিদ্যালয় পত্রিকা

লর্ডদের তালিকা

বাংলার গভর্নরগণ

রবার্ট ক্লাইভ	১৭৫৭-৬০
হেনরী ভান্সিটার্ট	১৭৬০-৬৫
(লর্ড) রবার্ট ক্লাইভ (দ্বিতীয়বার)	১৭৬৫-৬৭
হ্যারি ভেরেলস্ট	১৭৬৭-৬৯
জন কার্টিয়ার	১৭৬৯-৭২
ওয়ারেন হেস্টিংস	১৭৭২-৭৪

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রেগুলেটিং আইন অনুসারে নিযুক্ত গভর্ণর জেনারেলগণ
(ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গণতন্ত্র এবং কোম্পানীর ভারত শাসনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও সংস্কারের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৭৭৩ খ্রীঃ লর্ড নর্থের পরিচালনায় রেগুলেটিং আইন প্রণীত হয়।)

ওয়ারেন হেস্টিংস	১৭৭৪ (অক্টোবর)
স্যার জন ম্যাকফারসন (অস্থায়ী)	১৭৮৫ (ফেব্রুয়ারি)
লর্ড কর্ণওয়ালিস	১৭৮৬ (সেপ্টেম্বর)
স্যার জন শোর	১৭৯৩-৯৮
স্যার এ ক্লার্ক (অস্থায়ী)	১৭৯৮ (মার্চ)
লর্ড ওয়েলেসলী	১৭৯৮-১৮০৫
লর্ড কর্ণয়ালিস (দ্বিতীয়বার)	১৮০৫
স্যার জর্জ বারলো (অস্থায়ী)	১৮০৫ (অক্টোবর)
লর্ড মিন্টো	১৮০৭-১৩

লর্ড হেস্টিংস	১৮১৩-২৩
জন অ্যাডাম	১৮২৩ (জানুয়ারি)
লর্ড আর্মহাস্ট	১৮২৩-২৮
উইলিয়াম বাটার ওয়ার্থ বেইলী (অস্থায়ী)	১৮২৮
লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক	১৮২৮-৩৩

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সনদ আইন অনুযায়ী নিযুক্ত ভারতের গভর্ণর জেনারেল

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক	১৮৩৩-৩৫
স্যার চার্লস মেটকাফ (অস্থায়ী)	১৮৩৫-৩৬
লর্ড অকল্যান্ড	১৮৩৬-৪২
লর্ড অ্যালেনবরা	১৮৪২ (ফেব্রুয়ারি)
উইলিয়াম উ ফোর্স বার্ড (অস্থায়ী)	১৮৪৪ (জুন)
লর্ড হার্ডিঞ্জ	১৮৪৪-৪৮
লর্ড ডালহৌ	১৮৪৮-৫৬
লর্ড ক্যানিং	১৮৫৬-৫৮

ভারতে নিযুক্ত ভাইসরয়গণ (ভারতের গভর্ণর জেনারেলের নাম পরিবর্তন করে হয় ভাইসরয়—ব্রিটিশরাজশক্তির প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি)

লর্ড ক্যানিং	১৮৫৮-৬২
লর্ড এলগিন	১৮৬২-৬৩
রবার্ট নেপিয়ার (অস্থায়ী)	১৮৬৩
ডেনিসন (অস্থায়ী)	১৮৬৩
স্যার জন লরেন্স	১৮৬৪-৬৯
লর্ড মেও	১৮৬৯-৭২
লর্ড নর্থব্রুক	১৮৭২-৭৬
লর্ড লিটন	১৮৭৬-৮০
লর্ড রিপন	১৮৮০-৮৪
লর্ড ডাফরিন	১৮৮৪-৮৮
লর্ড ল্যান্সডাউন	১৮৮৮-৯৩
লর্ড (২য়) এলগিন	১৮৯৩-৯৯
লর্ড কার্জন	১৮৯৯-১৯০৫
লর্ড (২য়) মিন্টো	১৯০৫-১৯১০
লর্ড হার্ডিঞ্জ	১৯১০-১৬
লর্ড চেমসফোর্স	১৯১৬-২১
লর্ড রিডিং	১৯২১-২৬

লর্ড আরউইন	১৯২৬-৩১
লর্ড উইলিংটন	১৯৩১ (এপ্রিল)
জর্জ স্ট্যানলি (অস্থায়ী)	১৯৩৪ (মে-অগস্ট)
লর্ড উইলিংটন	১৯৩৪ (এপ্রিল
লর্ড লিনলিথগো	১৯৩৬ (১৮ এপ্রিল)

অ্যাক্ট অব ১৯৩৫

লর্ড লিনলিথগো	১৯৩৭ (৩১ মার্চ)
লর্ড ব্র্যাবোর্ণ (অস্থায়ী)	১৯৩৮ (জুন-অক্টোবর)
লর্ড লিনলিথগো	১৯৩৮
লর্ড ওয়াভেল	১৯৪৩-৪৭
জন কলভিন (অস্থায়ী)	১৯৪৫
লর্ড মাউন্টব্যাটেন	১৯৪৭ (মার্চ-অগস্ট)

ঋণস্বীকার

[আমার এই রচনাটি এবং এই গ্রন্থে অন্যান্য রচনার ক্ষেত্রে]

(1) *British India 1772-1947*– Michael Edwards; (2) *An Advance History of India*– Majumder, Roy Chowdhury and Dutta; (3) *A Statistical Account of Bengal*–24 Parganas—W.W.Hunter; (4) *Bengal District Gazetteers*, 24 Parganas—O'malley; (5) *District Census Handbook 1991*; (6) *West Bengal District Gazetteers, 24 Parganas*, 1994 —Edited By Barun De; (7) *The war of Independence*—Marx & Engels; (8) *The Bengali Press*—Samarjit Chakraborty; (9) *A Nation in Making*—Surendranath Bannerjee; (10) *History of Bengal, Bihar and Orissa under British Rule*– O'malley; (11) *Curzon*– British Government in India; (12) *Natural History of Drawing*, India office library, London 1962; (13) *Rural Life in Bengal*, India office library, London; (14) *A Summary of the Changes in the Jurisdiction of Districts in Bengal 1757-1916*—Monmohan Chakraborty. (Revised and Updated by Kumud Ranjan Biswas); (15) National Atlas and The Thematic Mapping Organisation; (16) *যশোহর-খুলনার ইতিহাস*—সতীশচন্দ্র মিত্র; (17) *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*; (18) *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*—বিনয় ঘোষ; (19) *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; (20) *বিশ্বকোষ*—নগেন্দ্রনাথ বসু; (21) *বাঙালির ইতিহাস (আদি)*—নীহাররঞ্জন রায়; (22) *মনসাবিজয়*'—ড সুকুমার সেন সম্পাদিত এশিয়াটি সোসাইটি থেকে প্রকাশিত; (23) *রঙ্গলাল রচনাবলী*—ড. শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও হরিবন্ধু মুখটি; (24) *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*—শ্রী অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; (25) *গৌরীমা*—শ্রীদুর্গাপুরী দেবী; (26) *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, শ্রীম-কথিত, অখণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা; (27) *স্মৃতিকথা, স্বামী অখণ্ডানন্দ* (উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা); (28) *বাংলা সাময়িক পত্র*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ; (29) উত্তর বারাকপুর পৌরসভা ১২৫ স্মরণিকা; (30) মণিরামপুর উচ্চবিদ্যালয় স্মরক পত্রিকা-১৯৯৭; (31) *ইয়ং ইন্ডিয়া*—মহাত্মা গান্ধী; (32) *বাংলাদেশের ইতিহাস*—শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদাব; (33) *আইন-ই-আকবরী*—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় অনুদিত; (34) *সাহিত্য সাধক চরিতমালা*—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (35) *বংশপরিচয়*—জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার; (36) *গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়*, বারাকপুর; (37) *বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস*—নগেন্দ্রনাথ বসু; (38) বারাকপুর ক্যান্টমেন্ট বোর্ড অফিস; (39) ফ্যানী পার্কস-এব ভ্রমণ বৃত্তান্ত

সেন্ট জোসেফ গির্জা

ক্যাথলিক বিশ্বাসীদের এই গির্জা ১৮৫৬ সালে নির্মিত। এস এন ব্যানার্জি রোড ধরে পশ্চিম বরাবর এগোলে বাসে ধোবীঘাট স্টপেজে ডানদিকে এই গির্জার অবস্থান। প্রথম দিকে এর কর্ম পরিধি সীমিত থাকলেও পরবর্তীকালে ডানলপ থেকে নৈহাটি শিল্পাঞ্চল এবং পূর্বদিকে নীলগঞ্জ পর্যন্ত এর কর্মধারা বিস্তৃত হয়। একসময় শ্রীরামপুর অঞ্চলের দায়িত্ব ছিল এই গির্জার। বারাকপুর অঞ্চলের ক্যাথলিক বিশ্বাসীদের আরও কিছু গির্জা আছে। এক : সিক্রেট হার্ট চার্চ, কাউগাছি, দুই : আগরপাড়া সেন্ট জোসেফ চার্চ, তিন : রূপান্তর, শিউলি (মোহনপুর)।



ছবি : রঘুনন্দন দে

বর্থলময় ক্যাথিড্রাল, ওয়েসলি ও সদরবাজার চ্যাপেল

——————— বিকাশকুমার মণ্ডল

বারাকপুর পাষ্টরেট এলাকাধীন গির্জা

(১) সেন্ট বর্থলময় ক্যাথিড্রাল ঃ এই গির্জা ১৮৩১ সালে তৈরি হয়। তখন তার নাম ছিল "সেন্ট বর্থলময় চার্চ"। ১৯৫৬ সালের ২৬ আগস্ট যখন বারাকপুর একটি ডায়োসিস (ধর্মপ্রদেশ) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ডায়োসিসেস মুখ্য পালক বা বিশপের সিংহাসন (ক্যাথিড্রা) এই চার্চে স্থাপন করা হয়, সেই দিন থেকে সেন্ট বর্থলময় চার্চ "সেন্ট বর্থলময় ক্যাথিড্রাল" হিসেবে পরিচিত হয়। এই চার্চে (ক্যাথিড্রালে) প্রতি রবিবার নিয়মিত উপাসনা হয়। সকাল ৮টায় ইংরাজি ভাষায় এবং বিকাল ৪টায় বাংলা ভাষায় উপাসনা হয়, তাছাড়া বিশেষ বিশেষ খ্রীষ্ট্রীয় পর্বে এবং উৎসবে বিশেষ উপাসনা হয়।



The Right Reverend Ronald Winston Bryan, First Bishop of Barrackpore

(২) ওয়েসলী উপাসনালয় ঃ বারাকপুর বোর্ড অফিসের নিকট বারাক রোডে এই চার্চটি অবস্থিত। উত্তর ভারতমণ্ডলী গঠিত হওয়ার পূর্বে এই চার্চটি মেথোডিষ্ট চার্চ নামে পরিচিত ছিল। এখানে প্রতি রবিবার সকালে সাড়ে আটটায় বাংলা ভাষাতে উপাসনা হয়। এই চার্চটিও ১০০ বৎসর আগে নির্মিত হয়।



সেন্ট বর্থলময় ক্যাথিড্রাল

(৩) সদর বাজার চ্যাপেল ঃ এই চ্যাপেলটি ১৮৭৯ সালে নির্মিত হয় স্থানীয় উপাসকদের উপাসনার জন্য। চ্যাপেলটি ১৩নং গোলা মহল, সদর বাজারে অবস্থিত। বর্তমানে বারাকপুর পাষ্টরেটের আয়োজিত বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় পর্বে এখানে উপাসনা হয়, যেমন গুডফ্রাইডের পূর্বে মহাপোবাসের সময় প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় এখানে ভক্তগণ উপাসনা করেন। প্রতি রবিবার সকাল ৮টায় শিশুদের আধ্যাত্মিক উন্নতি রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের ক্লাশ হয়। যুবক ও মহিলা সমিতির বিভিন্ন সভা এবং বড়দিনের সময় খ্রীষ্ট জন্মোৎসবের বিভিন্ন ট্যাবলো, আলোকসজ্জা করা হয়।

সৌজন্য : The New Diocese of Barrackpur... inaugaration 1956
ছবি দুটি বিকাশকুমার মণ্ডলের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বারাকপুর রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয় এবং শ্যামা ও আরণ্যকের দুই সাহিত্যিক

——————————— স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বারাকপুর-চিড়িয়ামোড় থেকে বি টি রোড ধরে বি এন বসু হাসপাতালে স্টপেজ থেকে খানিকটা এগিয়ে গেলেই চোখে পড়বে একটি রাস্তা যেটি বি টি রোড থেকে বেরিয়ে পশ্চিমদিক বরাবর বারাকপুর গান্ধী ঘাটের দিকে চলে গেছে। এই রাস্তার পাশেই অবস্থিত বারাকপুর রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়। বাড়িটিতে ঢোকার মুখেই প্রকাণ্ড লোহার গেট। এই গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলেই এই মহকুমার প্রাচীনতম বিদ্যালয়টি ইতিহাসের বহু ঘটনার নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আজও। বাড়িটি দেখতে ঠিক গীর্জার মতো।

পুরানো নথিপত্র ঘেঁটে আমরা জানতে পারি—'....... শ্রী শ্রী যুত লার্ড অকলণ্ড সাহেব নিজ ব্যয়ে চাণকে এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন কোম্পানী বাহাদুরের চাণকের বাগানের মধ্যে ঐ বিদ্যাগার নির্ম্মাণেতে ৩৫০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং শ্রী যুত বাবু রসিকলাল সেন যিনি মেদিনীপুরের বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছিলেন তিনি এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়াছেন বর্তমান মাসের ৬ তারিখে ৩০ জন বালক নিয়া বিদ্যালয়ের কার্যারম্ভ হয়ে হয়ে পড়ে গত সোমবারে আরো বিংশতি বালক ভর্তি হইয়াছেন এবং কথিত আছে চাণকের নিকট গ্রামবাসি বালকেরাই তথায় পাঠ করিবেন আরো আহ্লাদের বিষয় এই যে শ্রী যুতের বিদ্যালয়ে বালক গ্রহণে জাতিভেদ করা হইবেক না এবং কাগজ কলম পুস্তকাদি সমস্তই শ্রী যুত লার্ড সাহেব ছাত্রগণকে দিবেন আর যে সকল বালকেরা নীচের শ্রেণীর বালকদিগকে শিক্ষা দিতে যোগ্য হইবেন তাঁহারা প্রতিমাসে বেতন স্বরূপ কিঞ্চিৎ[২] পাইবেন ইহাতে এই উপকার হইবে যে বেতনের আশাতে বালকেরা বিশেষতঃ গরীব লোকের সন্তানেরা উৎসাহপূর্ব্বক বিদ্যাভাস করিবে শ্রী শ্রী যুত লার্ড সাহেব আরো কহিয়াছেন এই বিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে মেডিকেল কালেজ অথবা হিন্দু কালেজে শিক্ষার্থে বলিয়া দিবেন ....।' (জ্ঞানান্বেষণ : ১ এপ্রিল ১৮৩৯/২০ চৈত্র ১২৪৩) আবার একটি তথ্যে পাই—'...১৮৩৭ সনের মার্চ মাসে তিনি (রসিকলাল সেন) অকল্যান্ডের বারাকপুর স্কুলের প্রদান শিক্ষক নিযুক্ত হন।'

অন্য একটি সূত্রে জানা যায়—'১৮৪৬ খ্রীঃ জর্জ ইডেন সঙ্গে কুমারী এমিলি ইডেন ভারতবর্ষে আসেন। জর্জ ইডেন লর্ড অকল্যান্ড নামেই সমধিক পরিচিত এবং ১৮৩৬ হইতে ১৮৪২ খ্রীঃ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বড়লাট ছিলেন। লর্ড অকল্যান্ড চিরকুমার ছিলেন

বলিয়া কুমারী ইডেন বড়লাটের গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধান করিতেন, কলিকাতা গর্ভমেন্ট হাউসে কুমারী ইডেনই 'ফার্স্ট লেডি'। কিন্তু বড়লাট সহোদরা হইলেও লেডি ইডেন প্রকৃতপক্ষে ছিলেন মরমী চিত্রশিল্পী এবং উজ্জ্বল জীবনরসিক। বারাকপুর গর্ভনমেন্ট হাইস্কুল ১৮৩৭ খ্রীঃ লেডি ইডেন প্রতিষ্ঠা করেন এবং খুব সম্ভবত বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধানও ছিলেন তিনিই। তাঁহারই স্নেহে এবং আগ্রহে আদিযুগের কৃতী ছাত্ররা জীবনে সাফল্য লাভ করেন। ... স্নেহময়ী লেডি ইডেন বিলাতে গিয়াও তাঁহার বারাকপুরের ছাত্রদের ভুলিতে পারেন নাই। 'মাই ডিয়ার লিট্‌ল বারাকপুরিয়ান' এই স্নেহের সম্বোধনে ছাত্রদের পত্র লিখিয়াছেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ বিলাতে লেডি ইডেন লোকান্তরিত হন।'

ডঃ ভোলানাথ বসু এই বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের অন্যতম। তিনি ১৮৪০ সালে এই বিদ্যালয় থেকেই অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য বারাকপুর মহকুমার হাসপাতালটি তাঁর নামেই নামাংকিত। একালের এই বিদ্যালয় নানা সমস্যায় জর্জরিত। তার মধ্যে গৃহ সমস্যাটি অন্যতম। বর্ষাকালে ছাদ থেকে জল পড়ে শ্রেণী কক্ষ ভেসে যায়। আবার গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে আলো বাতাসের অভাবে ছাত্রদের বিদ্যালয়ের খোলা বারান্দায় অথবা গাছের তলায় পাঠদান করতে হয়।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্যোগে দুটি দেওয়াল পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ হয়। একটি প্রাতঃ বিভাগের 'ভোরাই' অন্যটি দিবা বিভাগের 'নবাংকুর'। এছাড়া আছে 'ব্যারাকপুরিয়ান' নামের আরও একটি পত্রিকা।

এখানকার পঠন-পাঠনের ঐতিহ্য আছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল তার সাক্ষ্য বহন করে।

বিবরণ	মাধ্যমিক		উচ্চমাধ্যমিক	
	১৯৯৭-১৯৯৮		১৯৯৭-১৯৯৮	
উত্তীর্ণ	৬০	৬৪	৫০	৪৫
১ম বিভাগ	৪৪	৬২	৩৩	৩৮
২য় বিভাগ	১৬	০২	১৬	০৬
সর্বোচ্চ নম্বর	৬৭৪	৭১৯	৮৪৬	৮০৮
স্টার	১৩	২১	১৩	০৫

বিদ্যালয়ে কলা, বিজ্ঞান বিভাগ আছে। এবছর বাণিজ্য বিভাগও খোলা হয়েছে জানালেন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রী দুলালচন্দ্র সরকার। বর্তমানে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৯০০-র বেশি। শিক্ষক আছেন ৪০ জন। অশিক্ষক কর্মচারী ১৭জন। প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে আছে শ্রী রূপক হোম রায়। বিদ্যালয়ের ফোন নম্বর : ৫৬০-০৫১৪।

তথ্যসূত্র : সংবাদপত্রে সেকালের কথা— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; উত্তর চব্বিশ পরগণার সেকাল একাল (১ম)— কানাইপদ রায়; ব্যারাকপুরিয়ান (১৯৯৮-১৯৯৯)।

শ্যামা'র সাহিত্যিক

চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়

কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালি' বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এই উপন্যাসটিকে সেলুলয়েডের ফিতেতে বন্দী করেছেন বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়। এই উপন্যাসটি চলচ্চিত্রায়নের নেপথ্যে কি ছিল তা তুলে ধরেছেন চণ্ডীচাস চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'পথের পাঁচালির নেপথ্য কাহিনীকার' গ্রন্থে। বিভূতিভূষণ তাঁর ভগ্নীপতি। তিনি সত্যজিৎ রায়ের মতো ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এসেছিলেন।

চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় জন্মেছিলেন ১৯৩০ সালে ঢাকার মানিকগঞ্জ মহকুমা শহরে, বর্তমান বাংলাদেশে। পিতা ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং মা সাধনা চট্টোপাধ্যায়। পিতা ছিলেন আবগারি বিভাগের ইনসপেক্টর। ভাইবোন ন'জন। বিভূতিপত্নী প্রয়াতা রমা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মেজদি।

চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় রচিত প্রথম গ্রন্থ 'অপরাজিত বিভূতিভূষণ' (১৯৯২)। এছাড়াও তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে 'বিভূতি বিচিত্রা', 'বিভূতি গল্পসমগ্র'। বিভূতি রচনাবলীর শোভন সংস্করণের অন্যতম সম্পাদক। রচনাবলীর গ্রন্থ পরিচয় অংশ তিনি নিজেই লিখেছেন। তিনি আনন্দবাজার পত্রিকা এবং হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহ কমিটিতেও ছিলেন অনেকটা সময়। পরবর্তীকালে গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও সুমথনাথ ঘোষের রচনাবলী সম্পাদনা করেন। তাছাড়া তিনি ইংরেজি ও বাংলায় ৭০টি প্রবন্ধ লিখেছেন বিখ্যাত পত্রিকায়।

পড়াশোনা করেছেন বনগ্রাম উচ্চবিদ্যালয় এবং পরবর্তীকালে কলকাতার রিপন কলেজে। বিভূতিভূষণের সাহচর্য পেয়েছেন শৈশবকাল থেকে।

পথের পাঁচালিকারের পরমাত্মীয় এই মানুষটি স্ত্রী প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে বারাকপুরে তাঁর পৈত্রিক বাসগৃহ 'শ্যামা'তে (এস এন ব্যানার্জি রোড) বসবাস করছেন।

আরণ্যক-এর সাহিত্যিক

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যিক তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অমর কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমাদেবীর একমাত্র পুত্র। জন্মেছিলেন ১৯৪৭ সালের ১৫ অক্টোবর বারাকপুরের চিড়িয়ামোড়ে তাঁর মামাবাড়িতে। বাড়িটি 'ভুতনাথ কুটির' নামে পরিচিত। বর্তমানে বসবাস করছেন বারাকপুরের 'আরণ্যক'-এ। বিভূতিভূষণ মারা যান ১৯৫০ সালের ১ নভেম্বর।

ইংরাজি নিয়ে এম এ পাশ করেই তিনি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন চাকদা কলেজে ইংরাজির অধ্যাপনা দিয়েই নিজের কর্মজীবনের সূচনা করেন। তারপর শিক্ষকতা করেছেন নর্থল্যান্ড হাইস্কুল, শ্যামনগর কান্তিচরণ হাইস্কুলে। অবশ্য সেগুলি স্থায়ী হয়নি। আসলে পিতারই ভবঘুরে জীবনের ছাপ তারাদাসের জীবনেও যেন স্পষ্ট। জীবিকার ঘন ঘন পরিবর্তন, এবার মফঃস্বল ছেড়ে শহর কলকাতায়। 'ঝলমল' নামে একটি মাসিক শিশুসাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনার কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে সেই দায়িত্ব নিয়েছেন মাথা পেতে। সময়টা ১৯৭৯-৮০ সাল। বাংলা সাহিত্যের অনেক প্রতিষ্ঠিত লেখকদের লেখায় পত্রিকা সমৃদ্ধ হয়েছিল। নানা কারণে সে চাকুরী থেকেও এক সময় ইস্তফা দেন তারাদাস। আবার নতুন করে ভাগ্যান্বেষণের পথে। এবার রাজ্য সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরে। এই দপ্তরে চাকুরীতে যোগ দেন ১৯৮১ সালের অক্টোবর মাসে। বর্তমানে তিনি ঐ দপ্তরে একজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক।

তাঁর প্রকাশিত রচনাগুলি—

(১) কাজল (১ম উপন্যাস, ১৯৭০), (২) সপ্তর্ষির আলো (উপন্যাস, (১৯৭১), (৩) অনশ্বর (১৯৭২), (৪) কক্ষপথ (১৯৭৫), (৫) বন্ধু রহ রহ (উপন্যাস, ১৯৭৯), (৬) কালনিরবধি (ঐতিহাসিক উপন্যাস, ১৯৮৪), (৭) তারানাথ তান্ত্রিক (১৯৮৬), (৮) তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সংকলন (১৯৯৫), (৯) তৃতীয় পুরুষ (১৯৯৮), (১০) ছোটগল্প সংকলন (২য় খণ্ড, প্রকাশের পথে), (১১) বিভূতিভূষণের পারিবারিক জীবন (অনুষ্টুপ), (১২) বুধন ম্যান্ডেলা ও অন্যান্য (২০০০)। কলকাতা থেকে প্রকাশিত প্রায় সব নামী-দামী কাগজ ছাড়াও অজস্র পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখে চলেছেন তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্ত্রী মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী।

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক



ক : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, খ : সহধর্মিণী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, গ : চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহের পরদিন এই আলোকচিত্রটি গ্রহণ করা হয়েছে।
সাহিত্যিক চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে ছবিটি প্রাপ্ত



এস এন ব্যানার্জি রোডস্থিত (ওল্ড স্টেশন রোড) 'আরণ্যক'-এর একটি কক্ষে বিভূতিভূষণ ব্যবহৃত জিনিসপত্র সংরক্ষিত করা হয়েছে।

পত্র-পত্রিকার পর্যালোচনা ও সংবাদে
'বারাকপুরের সেকাল একাল'

সংবাদ প্রতিদিন ঃ (১৫ নভেম্বর, ২০০০)

আঞ্চলিক ইতিহাসের দর্পণ—*কমলকান্ত পাল*

বিজ্ঞান-ঋদ্ধ যে কালেই গ্রন্থের রোমাঞ্চকর সম্ভাবনায় গ্রন্থলোক কম্পমান, সেই কালে তাথ্যিক সম্ভারে পুষ্ট পুস্তক প্রকাশনা দুঃসাহসের কাজ। এরকম একটি দুঃসাহসিক কৃতিত্বের পূর্ণ স্বল্পায়ত গ্রন্থ 'বারাকপুরের সেকাল একাল'। পশ্চিমবঙ্গের জেলা সমূহের অন্তর্গত অঞ্চলবিশেষের ইতিহাস এবং তার ভৌগোলিক, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তথ্যবাহী পুস্তকের আজ একান্ত অভাব। কায়িক ও মানসিক প্রযুক্তি খাটিয়ে এই অভাব মেটানোর কাজে উৎসাহী মানুষের সংখ্যা যদিও অঙ্গুলিমেয়, তাহলেও সমালোচ্য পুস্তিকাটি এইরকম একটি প্রচেষ্টার অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞান। অধ্যাপক কানাইপদ রায় এমনই একজন বিরল ব্যক্তি, যিনি সমমনস্ক অনুসন্ধিৎসুগণের সহযোগিতায় তাঁর আবাসভূমি বারাকপুরের শিরা-উপশিরায় অবাধে পরিভ্রমণ রত এবং নানা উপাচারে তথ্যের ডালি সাজিয়ে নিজ অঞ্চলের অধিবাসীদের উপহার দিচ্ছেন। হীরকদ্যুতিময় এই উপহার আন্তরিক ঔজ্জ্বল্যে বারাকপুরের সীমানা ছাড়িয়ে দূর-বিস্তারী-আলোর সঙ্কেত—এ ভাবনা অত্যন্ত সঙ্গত।

বর্তমান প্রবন্ধের প্রতিবেদক বারাকপুরের অধিবাসী নন, কিন্তু বারাকপুরের সম্বন্ধে এক হৈতুকী কৌতুহল তাঁর মনের মধ্যে জেগে ছিল অনেকদিন ধরেই। ব্যক্তিগত অন্বেষায় তাড়িত হয়ে একদা বারাকপুরের গঙ্গাধৌত গান্ধীঘাটের সন্নিকটে তীরলগ্ন হয়ে কাটাতে হয়েছিল অনেকক্ষণ। সেই সময় থেকেই এই কৌতুহল দিনে দিনে দানা বেঁধে উঠেছিল। কৌতুহল নিবৃত্তির উৎস সন্ধান প্রবৃত্ত হয়ে হতাশ হতে হয়েছে অনেকবার। অবশেষে, এই হতাশার কিঞ্চিৎ অবসান ঘটলো পুস্তিকাটি হাতে পেয়ে। অধ্যাপক কানাইপদ রায় সম্পাদিত সাহিত্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা 'বারাকপুরের সেকাল একাল, প্রথম খণ্ড।' সুসম্পাদিত এই বিশেষ সংখ্যাটি উত্তর চব্বিশ পরগণার অন্তর্বর্তী বিচিত্র ঐতিহ্যমণ্ডিত বারাকপুর মহকুমার মণিরামপুর নগরাঞ্চলের একটি প্রামাণ্য দলিল। সম্পাদককে ধন্যবাদ যে, তিনি এরকম একটি সুসম্পাদিত বর্ণিল পুস্তিকা-স্তবক কৌতুহলী পাঠকের হাতে তুলে দিয়ে একান্তভাবে একটি মানবিক কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। বসবাসের পরিতুষ্টি নিহিত থাকে বাসস্থানের সামগ্রিক জ্ঞাতব্যের অবহিতিতে। মাননীয়

সম্পাদক মহাশয় সেই প্রয়োজন সাধনে শ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে বারাকপুরের নাগরিকগণের প্রতি যে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন, তার তুলনা নেই। বর্তমান প্রতিবেদকের মত বারাকপুরের একজন অনাবাসিকেরও ইতিহাস-চেতনা এতে সমৃদ্ধ হবে, তাতে সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে সম্পাদক যাঁদের নিকট থেকে তথ্য-সমৃদ্ধ রচনাবলী সংগ্রহ করেছেন তাঁরাও ধন্যবাদার্হ। পুস্তিকায় সংকলিত প্রবন্ধাবলী বিষয়ানুগ ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে সুবিন্যস্ত। এর মধ্যে 'বারাকপুরের উৎস সন্ধানে' প্রবন্ধে শ্রী কানাইপদ রায় স্বল্প পরিসরে অত্যন্ত দক্ষতায় একটি অঞ্চলের সৃষ্টি রহস্যের উন্মোচন করেছেন এবং তাতে অপূর্ব নৈপুণ্য সজ্জিত হয়েছে শ্যামলী মহাপাত্র লিখিত এই মহকুমারই দেব-কন্যা হালিশহর জাতা 'মহীয়সী-নারী-রাণী রাসমণি'-র অতি সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যপূর্ণ বিবৃতি। সুচারু এই উপস্থাপনার অঙ্গে যদিও কিছু 'ইতঃস্তত-সঞ্চারমান' নগণ্য মুদ্রণ প্রমাদ দুর্নিবীক্ষ্য নয় এবং যা কোন অংশেই এই মহৎ প্রয়াসের মূল্যায়নে ক্ষুণ্ণতা ছড়াতে পারে নি। মণিরামপুরের কথায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই সংক্ষেপে হলেও সংশ্লিষ্ট স্থানিক, ব্যক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রসঙ্গের এক একটি প্রাথমিক অথচ সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টিতে সফলকাম হয়েছেন বলে মনে হয়। মণিরামপুরের গর্ব রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কিত রচনাবলীতে আনুষঙ্গিক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তথ্যাবলী এবং জীবনী-কেন্দ্রিক কাহিনীর আশ্চর্য সমন্বয় অত্যন্ত কৌতূহলদ্দীপী ও অনেক অজ্ঞাত তথ্যানুসন্ধানে উদ্দীপনাসঞ্চরী। এ বিষয়ে অবশ্য একটি জিজ্ঞাসার অবকাশ সৃষ্ট হয়েছে 'বিড়ম্বিত অথচ গৌরবান্বিত সুরেন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে। শ্রীআনন্দপ্রসাদ রায় স্যার সুরেন্দ্রনাথের জন্মস্থান 'কলকাতার তারাতলা অঞ্চলে' লিখেছেন কি তথ্যনিষ্ঠ হয়েই, না কি মুদ্রণপ্রমাদ বশতঃ এ বিচ্যুতি? 'কলকাতার তালতলা' অনবধানতাবশে 'তারাতলা' হয়ে থাকলে মুদ্রাযন্ত্রের দায়বৃদ্ধি ঘটে। তা যদি না হয়, তবে এ বিষয়ে শ্রীরায় আলোকপাত করার জন্য অনুরুদ্ধ হলেন। (দ্রঃ সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত 'বাঙালি চরিতাভিধান, সংশোধিত ৩য় সংস্করণ পৃঃ ৫৯১)। এছাড়া, রাষ্ট্রগুরুর বিড়ম্বিত জীবনের দুটি উল্লেখ্য তথ্য দিয়ে শ্রীরায়ের রচনাকে সমৃদ্ধতর করা প্রয়োজন। একটি হল—১৯০৬ খ্রীঃ বরিশালে রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে যোগ দিয়ে শোভাযাত্রা পরিচালনার অভিযোগে সুরেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। অপরটি হল—গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের পথে কংগ্রেস যখন অগ্রসর হয়, তখন তিনি ইংরাজ প্রবর্তিত শাসন-সংস্কার সমর্থন এবং মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে এবং ইংরেজ সরকারের 'স্যার' উপাধি গ্রহণ করে অনেকের নিন্দাভাজন হন। (দ্রঃ সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত বাঙালি চরিতাভিধান, সংশোধিত ৩য় সংস্করণ পৃঃ ৫৯২)।

ছাউনি-শহর বারাকপুরের তথ্য-সমৃদ্ধ রচনাবলীর অন্তর্গত সিপাহীবিদ্রোহ-কেন্দ্রিক প্রবন্ধদ্বয় অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী। কিন্তু এখানেও একটি জিজ্ঞাসা। সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডের ছোঁড়া প্রথম 'গুলি' সার্জেন্ট হিউসনের গায়ে লাগেনি, অথচ সে মাটিতে পড়ে গেল। এই 'সে' কে? সার্জেন্ট হিউসন? না মঙ্গলপাণ্ডে? এদের যে কেউ হোক্—মাটিতে

পড়ে যাওয়ার কারণ কি নিছক আত্মরক্ষার চেষ্টা? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রকাশিত 'ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বাঙ্‌লা' গ্রন্থেও এর কোন নিশ্চিত উত্তর নেই। অথচ ভারতের ইতিহাস অভিধানে বলা হয়েছে— মঙ্গল পাণ্ডের ছোঁড়া গুলিতে একজন ইউরোপীয় অফিসার নিহত হয়েছিল। "...Signs of unrest had appeared amongst the sepoys stationed at Berhampore and Barrackpore where on 29th March, 1857, a sepoy named Mangal Pandey murdered a European officer in broad daylight and had been suppressed : [দ্রঃ A Dictionary of Indian History : Published by Calcutta University, revised and Enlarged Edition 1972]। যতদূর জানি, এ বিষয়ে প্রথিত যশ IT ইতিহাসবিদ-দ্বয় Vincent Smith এবং Vanderkar ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহমতাবলম্বী। প্রবন্ধকার অধ্যাপক কানাইপদ রায় এ বিষয়ে যথার্থ আলোকপাত করলে সংশয়মুক্ত হওয়া যেত।

তাছাড়া, যুগসন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ব্যাঙ্গাত্মক কাব্যোদ্ধৃতির উদ্দিষ্ট বিষয়ে সঠিক স্মরণিকা সাধারণ পাঠকের কাছে প্রবন্ধটিকে সহজগম্য ও অধিকতর প্রাঞ্জল এবং আস্বাদনীয় করে তুলতে পারত। প্রবন্ধটিতে এরকম একটি টীকার অনুভূত হল। তদানীন্তন সাময়িক পত্র-পত্রিকা ও ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' সিপাহী বিদ্রোহ বিষয়ে সমমনোভাবপন্ন হয়ে 'রাজশক্তির জয়গান গেয়েছে অকপটে'— কথাটি সকল ঐতিহাসিকের সমর্থনপুষ্ট না-ও হতে পারে। মনে হয়, সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গে ।পাধ্যায়ের 'সেই সময়'-এ বর্ণিত 'মঙ্গলপাণ্ডের প্রেতাত্মা যেন ভাসতে লাগল' —কেবলমাত্র 'রাজশক্তির' ভীতি সঞ্চারের জন্য নয়—যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকা বাঙালির সন্ত্রস্ত চিত্তকে তীব্র ব্যাঙ্গের কষাঘাতে প্রবুদ্ধ করতেও।

গ্রন্থশেষে তথ্য ও পরিসংখ্যানে বারাকপুর ভরপুর। বারাকপুরের ব্যবহারিক জীবনের একটি নিটোল ছবি এবং কয়েকটি মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র শোভিত এই পৃষ্ঠাগুলো গ্রন্থটিকে অসাধারণ মর্যাদায় ভূষিত করেছে।

গ্রন্থটির সুপরিকল্পিত প্রচ্ছদ সোনায় সোহাগা যেন।

সাপ্তাহিক বর্তমান ঃ (২৯ এপ্রিল ২০০০)

'বাঙ্গালার ইতিহাস নাই'—সেকালে বাঙালি চিন্তানায়কের অন্তরে এ ছিল এক গভীর বেদনা। একালে আমরা আর সে বেদনা অনুভব করি না। কারণ, ঐতিহাসিকেরা বাঙলা দেশ ও বাঙালি জাতির সুবিস্তৃত ইতিহাস রচনা করেছেন। কিন্তু তবু একথা বলতে বাধা নেই যে, আজও বাঙলা দেশে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হয়নি। সেদিক দিয়ে বিচার করলে "বারাকপুরের সেকাল-একাল প্রথমখণ্ড" (১৯৯৯) গ্রন্থটিকে ব্যতিক্রম হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

গ্রন্থটি কোনও একজন রচিত বারাকপুরের ধারাবাহিক ইতিহাস নয়। বহু লেখকের রচনার একটি সংকলন গ্রন্থ। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক কানাইপদ রায় মহাশয়। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, খণ্ডে খণ্ডে বারাকপুরের কথা বলার পাশাপাশি এখানকার কোনও এক বা একাধিক জনপদের কথা তুলে ধরা হবে। যেমন, প্রথম খণ্ডের বিশেষ জনপদ হল—মণিরামপুর।

এই গ্রন্থের লেখকেরা সকলেই আঞ্চলিক ইতিহাসের বহু বিষয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে , সহজ ভাষায়, তথ্যপূর্ণভাবে প্রবন্ধগুলি রচনা করেছেন। তবু বিশেষ করে অধ্যাপক কানাইপদ রায় রচিত 'বারাকপুরের উৎস সন্ধানে' প্রবন্ধটির কথা বলতে হয়। অত্যন্ত নিপুণ মুন্সিয়ানায় প্রবন্ধটি রচিত। তাছাড়া 'ফান্ ডেন্ ব্রোকের নকশা' (১৬৬০) গ্রন্থমধ্যে সংযোজিত হওয়ায় (১৭৫ পৃ.) গ্রন্থের মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক গ্রন্থটি পাঠ করলে বারাকপুর অঞ্চলের অনেক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করতে পারবেন।

আজকাল ঃ (২৪ জুলাই ২০০০)

প্রসঙ্গ বারাকপুর

বহু বিস্তৃত আমাদের এই রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ। শহর, নগর, গ্রামগঞ্জ ছড়িয়ে প্রান্তে প্রত্যন্তে ছড়িয়ে থাকা এই রাজ্যের কিছু কিছু জনপদ নিয়ে এর আগে অনেক গ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছে অনেকের উদ্যোগে। বাংলার সমৃদ্ধ ইতিহাসের ছবি তো আদতে সেই সব স্থানিক ইতিহাসের হাত ধরেই। সম্প্রতি এমনই একটি স্থানিক ইতিহাসের চালচিত্র হাজির করেছে সাহিত্য-বিষয়ক ত্রৈমাসিক 'নগর পেরিয়ে'। কানাইপদ রায়ের সম্পাদনায় এই প্রকাশন থেকে বেরিয়েছে 'বারাকপুরের সেকাল একাল'-এর প্রথম খণ্ড। রাজ্যের মানচিত্রে বড় শিল্পাঞ্চল হিসেবে বর্তমানে পরিচিতি উত্তর ২৪ পরগণা জেলার এই মহকুমা শহরটির। এই শহরেরই ইতিহাস ঘাঁটতে প্রায় ৫০০ বছর পর্যন্ত পেছনের দিকে এগোতে সক্ষম হয়েছেন সম্পাদক মশাই। এই দীর্ঘ সময়ের পথে নানা উত্থান-পতন, ব্রিটিশদের ভারী বুটের আস্ফালন, তার বিরুদ্ধে মঙ্গল পাণ্ডের অসি আর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মসির লড়াই এই শহরের চারিত্রলক্ষণ যুক্ত করেছে আলাদা মাত্রা। দু'বাংলার মানুষকে নিয়ে গড়ে ওঠা মিশ্র সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ভিন প্রদেশের সংস্কৃতিও। সবাইকেই বুকে ধরেছে 'শ্রমিকের পীঠস্থান' এই শিল্পশহরটি। নানা তথ্য, পরিসংখ্যান, মননশীল নিবন্ধ, প্রবীণ মানুষদের স্মৃতিচারণ, পুরনো দলিল-দস্তাবেজ, মানচিত্র এইসব ঘেঁটে আবিষ্কৃত হয়েছে বারাকপুরের সেকাল-একাল। চারটি অধ্যায়ে বিধৃত এই গ্রন্থে শহরের উৎস সন্ধান ছাড়াও অন্যান্য অধ্যায়ে তথ্য-পরিসংখ্যানে বারাকপুর, ছাউনি শহর এবং এলাকার প্রাচীন বর্ধিষ্ণু জনপদ মণিরামপুর নিয়ে আছে একটি গোটা অধ্যায়। নানা জনের লেখায় এই অঞ্চল, এর সঙ্গে জড়িত রাষ্ট্রগুরু এবং গান্ধীজির স্মৃতি, উৎসব,

মন্দির, সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চা, খেলাধূলা, পত্রপত্রিকা, আদিবাসী সমাজ এবং আরো বিষয়ে আলো পড়েছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা : ৩১-০৩-২০০১

আঞ্চলিক বা এলাকাভিত্তিক ইতিকথা নিয়েই তো একটি দেশের ইতিহাস তৈরি হয়। এক ত্রৈমাসিক 'নগর পেরিয়ে' পত্রের উদ্যোগে, কানাইপদ রায়ের সম্পাদনায় 'বারাকপুরের সেকাল একাল' দুই খণ্ড যথেষ্ট পরিকল্পিত মনে হয়। মণিরামপুরের কথা, ছাউনি শহর, হালিশহরের, ইছাপুর-নবাবগঞ্জের কথা ইত্যাদি অধ্যায়ে এতদ্ঞ্চলের সাহিত্য নাট্য ধর্মসম্প্রদায় সামাজিক ইতিহাসের খসড়া, উৎসব শিক্ষা, সংঘ-সমিতি, এসবের আলোচনাসহ তথ্য ও পরিসংখ্যানের যোগ দুই গ্রন্থকে সমৃদ্ধ করেছে।

The Statesman : 1-2-2001

There are some who have painstakingly tried to redisvocer the past of this town and its adjoining areas in North 24-Parganas.

One such person is Mr. Kanai Pada Roy, who has edited two volumes of Barrackporer Sekal Ekal, a scholastic attempt to find out about Barrackpore and its surrounding areas. The second volume, released last month by Dr. Pratam Chandra Chandra, former education minister, is a painstaking team effort by people working the under the banner of *Nagar Periye.*

With their hard work and patience, they have been able to unfold many facts, which were unknown to us till today.

প্রসঙ্গ উত্তর চব্বিশ পরগণা—বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি আমাদের হাতে এসেছে একটি গ্রন্থ। কানাইপদ রায় লিখিত 'উত্তর চব্বিশ পরগণার সেকাল একাল' (প্রথম খণ্ড)।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক কয়েকটি ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন, যেমন : উত্তর চব্বিশ পরগণার কথা, চাণক অর্থাৎ বারাকপুরের পূর্বনাম। উল্লেখ করেছেন, বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' কাব্য, দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'সুরধনী কাব্য' এবং আরও অন্যান্য লেখা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। ফ্যানি পার্কস-এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকেও করেছেন তথ্য সংগ্রহ। উল্লেখ করেছেন মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে বারাকপুরে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা। আলোচ্য গ্রন্থে উল্লেখ আছে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে বিভিন্ন ঘটনা। সুরেন্দ্রনাথ দীর্ঘ সময় বাস করেন মণিরামপুরের বাড়িতে। এখানেই তিনি রচনা করেন আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'A Nation in Making'।

লেখক উল্লেখ করেছেন আলোচ্য গ্রন্থে (৯৫ পৃঃ) '..... রাষ্ট্রগুরুর সঙ্গে গান্ধীজীর বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিতো। ১৯২১ খ্রীঃ অসহযোগ আন্দোলন যখন চরমে, চৌরিচৌরার ঘটনায় বিচলিত গান্ধীজী আন্দোলনের রাশ টেনে ধরায় অনেকের মতো তিনিও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তবুও তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল মধুর।'

মণিরামপুরের রাষ্ট্রগুরুর বাড়িতে গান্ধীজী দু'বার এসেছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক উল্লেখ করেছেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনপঞ্জী এবং রাষ্ট্রগুরু সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য। লেখক উল্লেখ করেছেন : উত্তর চব্বিশ পরগণার কয়েকটি গবেষণা কেন্দ্র। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অনুসন্ধান সংস্থা, গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়, মঠ, মিশন, পলতায় জলকল প্রভৃতি বিষয়।

আলোচ্য গ্রন্থে আছে টাকী'র ইতিহাস। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কথা, পত্র-পত্রিকার তালিকা, নাট্যচর্চা প্রভৃতি প্রসঙ্গ। লেখক সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছেন সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁরা স্মরণীয়। উল্লেখ করেছেন : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শম্ভুচন্দ্র মুখার্জি, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিনাথ দে, মহম্মদ শহীদুল্লাহ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন স্মরণীয় লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তা'ছাড়া আছে কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর কথা।

উত্তর চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে লেখকের বিস্তৃত চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে এই গ্রন্থে। আলোকচিত্র, মানচিত্র প্রভৃতির জন্য আলোচ্য গ্রন্থ আকর্ষণীয় হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, মাত্র ১২০ পৃষ্ঠার গ্রন্থে একটি জেলার সবকিছু প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই রূপ প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে জন্মলাভ করে নতুনভাবে

জেলার মাটি ও মানুষের প্রতি অনুরাগ। সব জড়িয়ে আলোচ্য গ্রন্থ থেকে পাঠক উপকৃত হবেন। ঝকঝকে ছাপা, ভালো বাঁধাই, রচনা বিন্যাস গ্রন্থটিকে আকর্ষণীয় করেছে। গ্রন্থটি সংগ্রহযোগ্য।

প্রতিবেদন ঃ উত্তর ২৪ পরগণা (৩০ নভেম্বর ১৯৯৯)

তথ্যে সমৃদ্ধ 'বারাকপুরের সেকাল একাল'—*গৌতম চন্দ্র কুর*

অতীত ছাড়া অসম্পূর্ণ বর্তমান। বর্তমানকে জানতে হলে অতীতকে জানতেই হবে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই অতীতকে জানার সুযোগ ভীষণভাবে কম। তেমন পরিকাঠামো আজও গড়ে ওঠেনি। সরকার কিংবা প্রশাসনও বর্তমান প্রজন্মকে অতীত অর্থাৎ ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলার কোন উদ্যোগ নেয়নি। তবুও ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের একটা স্বভাবজাত আগ্রহ থাকেই। ইতিহাস রসহীন, কষহীন তবুও ইতিহাস জানার প্রবল আগ্রহ সবার রয়েছে। সাহিত্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক 'নগর পেরিয়ে' পত্রিকার সম্পাদক কানাইপদ রায় অন্ততঃপক্ষে ধন্যবাদার্হ 'বারাকপুরের সেকাল-একাল' জানানোর উদ্যোগ নেওয়ায়।

ব্যারাকপুর কেন বারাকপুর হলো অর্থাৎ বানান কেন বদলে গেল এই জিজ্ঞাসাকেও নিরসন করা হয়েছে। এই গ্রন্থে বারাকপুরের মণিরামপুর জনপদকে আলোকপাত করা হয়েছে মণিরামপুরের সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য, ঘটনা জানা গেল। উত্তর বারাকপুর পৌরসভার জন্মলগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত পৌরপ্রধান ও উপপৌরপ্রধানের নাম তাদের মেয়াদের সময়সীমা নিয়ে যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। মণিরামপুরের প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই এসেছে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির প্রসঙ্গ। রাষ্ট্রগুরুকে নিয়ে বেশ কিছু লেখা মুদ্রিত হয়েছে। তার মধ্যে অবশ্যই রত্ন হচ্ছে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর লেখা ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় ১৯২৫ সালের ১৪ মে বৃহস্পতিবার 'দ্য সেজ অব বারাকপুর' ও ১৯২৫ সালের ১৩ আগস্ট সংখ্যায় 'দ্য লায়ন অব বেঙ্গল' নামে দুটি অমূল্য লেখা লিখেছিলেন। সেই লেখা দুটি পড়ার সৌভাগ্য লাভের সুযোগ পেলেন পাঠক। কানাইলাল ঘোষের 'রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ এক ঋজু ব্যক্তিত্ব', আনন্দপ্রসাদ রায়ের 'বিড়ম্বিত অথচ গৌরবান্বিত সুরেন্দ্রনাথ', স্বপন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাষ্ট্রগুরুর বাড়ি এবং রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউট' তথ্যমূলক লেখা। এছাড়া শিবরতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মণিরামপুর সদর বাজারে সঙ্গীত চর্চার সেকাল একাল', কানাইপদ রায়ের 'মণিরামপুরের মন্দির ও উৎসব', শঙ্কর আচার্যের 'নাট্যচর্চায় মণিরামপুর', শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'মণিরামপুরের পথ পরিচয় ও আদিবাসী সমাজ' গবেষকদের কাছে ভীষণ মূল্যবান। মণিরামপুরের স্কুল, শ্মশানঘাট, পরিবহন, ফেরী ঘাট, লোকসংখ্যার তালিকা, পাড়ার কথা, বাজপড়া প্রবন অঞ্চল, মহিলা সমিতি, নতুন

বাজার সহ প্রয়োজনীয় তথ্যে ঠাসা কানাইপদ রায়ের 'তথ্য ও পরিসংখ্যানে মণিরামপুর'।

ইতিহাস নিয়ে আগ্রহ যাদের গবেষণার কাজে যারা নিয়োজিত তাদের কাছে এই গ্রন্থ অবশ্যই প্রয়োজনীয় 'মেড ইজি'র মতো পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তথ্য আর পরিসংখ্যানে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থ অনিসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে যে জনপ্রিয়তা লাভ করবে তা বলাই বাহুল্য। সম্পাদক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বারাকপুরের বাকি জনপদ নিয়েও প্রকাশিত হবে এমন গ্রন্থ। আশা করবো প্রতিকূলতাকে সরিয়ে রেখে সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপ নেবে।

পৌর ও গ্রামীণ সংবাদ ঃ (৭-১২-৯৯)

বারাকপুরের সেকাল একাল ঃ একটা সময়োচিত প্রয়াস—*সুকুমার মিত্র*

ইতিহাসে আঞ্চলিক ইতিহাসের গুরুত্ব নিয়ে বহু আলোচনা হলেও কাজের কাজ হয়েছে সেই তুলনায় অনেক কম। তাই যখন আঞ্চলিক ইতিহাসের উপাদানকে এক জায়গায় জড়ো করার প্রয়াস কেউ নেন তখন অবশ্যই সেই উদ্যোগকে প্রশংসা জানাতেই হয়। 'নগর পেরিয়ে' পত্রিকা সম্পাদক 'বারাকপুরের সেকাল একাল' সম্পাদনাও তাই অবশ্যই প্রশংসনীয়। চারটি অধ্যায়ে ৪৫টি নিবন্ধ নিয়েই 'বারাকপুরের সেকাল একাল' মধ্যযুগ থেকে শুরু করে হালফিলের ঘটনাকে একটা জায়গায় সংকলনে সম্পাদনাগত নৈপুণ্য নজর কাড়ে। তবে বারাকপুর মহকুমার চটকল শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসকে বাদ দিয়ে বারাকপুরের ইতিহাস অনেকাংশেই অপূর্ণ থেকে যায়। তেমনি রবীন্দ্রনাথ ও পানিহাটি কিংবা কাঁঠালপাড়া ও সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বা ভাটপাড়ার পণ্ডিত সমাজ শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ অথবা মূলাজোড় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস পৃথক পৃথক অধ্যায়ে সংযোজিত হিসেবে মনোযোগী পাঠককুল আশা করতেই পারেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গেও বারাকপুর মহকুমার গভীর সম্পর্ক ছিল। কুলিয়া গ্রামে তিনি এসেছিলেন নদী পথ ধরে। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে বারাকপুর এই ভাবনায় ভাবিত হলে সম্পাদক অনেক মূল্যবান সম্পদ হয়তো উপহার দিতে পারতেন। আশা করবো পরবর্তী খণ্ডে এই বিষয়গুলি থাকবে। তবে এরই মাঝে যাঁরা চেয়েছেন ইতিহাসের কিছু উপাদানকে গ্রথিত করে একটা গ্রন্থ প্রকাশ পাক তাঁদের সদিচ্ছাকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। এঁদের বেশ কিছু লেখা বেশ মূল্যবান। বিশেষ করে সম্পাদক কানাই পদ রায়ের বারাকপুরের উৎস সন্ধানে, সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তীর বিস্মৃতপ্রায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, কানাইলাল ঘোষ, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ এক ঋজু ব্যক্তিত্ব, মণিরামপুর, রাষ্ট্রগুরু ও মহাত্মা গান্ধী সুপ্রিয় মুন্সীর লেখা থেকে বিরল কিছু তথ্য জানা গেল। বিড়ম্বিত অথচ গৌরবান্বিত সুরেন্দ্রনাথ আনন্দপ্রসাদ রায় সুরেন্দ্রনাথকে অন্যভাবে মূল্যায়ণ করেছেন। বেঙ্গলি

পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতি এলেখা থেকে জানা যায়। স্বপন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবধন মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর আচার্যের নাট্যচর্চায় মণিরামপুর, সদর বাজারে সঙ্গীতচর্চার সেকাল ও একাল শিবরতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিশ্রমী লেখা। বারাকপুরের দুটি সিপাহী বিদ্রোহ কানাইপদ রায়ের তথ্যসমৃদ্ধ নিবন্ধ। বারাকপুর মহকুমার নানা তথ্য ফান ডেন ব্রোকের মানচিত্র ও কিছু আলোকচিত্র সংযোজনে বইটি অনেকাংশে সর্বাঙ্গীন হয়ে উঠেছে। সুন্দর প্রচ্ছদ, অলংকরণ ছাপা ও বাঁধাই নজর এড়িয়ে যায় না। এই ধরনের আঞ্চলিক ইতিহাসের আরো আরো উপাদানকে জড়ো করার উদ্যোগ নিক নগর পেরিয়ে। বারাকপুরের সর্বাঙ্গীন ইতিহাস রচনায় বারাকপুরের সেকাল একাল একটা আকর গ্রন্থ হিসেবে তার মর্যাদা একদিন পাবেই। বারাকপুরের সেকাল একাল অবশ্যই একটা সময়োচিত প্রয়াস বলা যায়।

বইটির বৈশিষ্ট্য হলো জেলার সামগ্রিক ইতিহাসকে সাধারণভাবে তুলে না ধরে এক একটি জনপদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তবে 'উত্তর ২৪ পরগণার কথা' অংশটি একটু বেশি তালিকা নির্ভর হয়ে গেছে। জেলার নাট্যচর্চা, পত্র-পত্রিকা, পঞ্চবটী, রোটারি ক্লাব, মিশন ও মঠের তালিকা ঠাঁই পেয়েছে এই অংশে। যাঁরা উৎসাহী এবং যাঁরা গবেষণা করবেন, তাঁদের কাজে লাগবে বইটি।

অনীশ ঘোষ ঃ বারাকপুরের সেকাল একাল' গ্রন্থটি যথেষ্ট নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে সম্পাদনা করেছেন কানাইপদ রায়। প্রথম খণ্ডটি বছর দুয়েক আগে সম্ভবত প্রকাশিত হয়। এবার বেরিয়েছে দ্বিতীয় খণ্ডটি। প্রথম খণ্ডের মত এই খণ্ডেও উত্তর ২৪ পরগণার এই শিল্পাঞ্চল মহকুমার কয়েকটি এলাকাকে আলাদা আলাদা অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে না লেখা, তথ্য ও পরিসংখ্যানে। এই খণ্ডের চারটি অধ্যায়ে বারাকপুর, হালিশহর, ইছাপুর-নবাবগঞ্জের যাবতীয় তথ্য-কথকতা ছাড়াও শেষ অধ্যায়ে আলাদাভাবে সংযোজিত বারাকপুর সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য-পরিসংখ্যান। প্রথম অধ্যায়ে প্রাচীন কাব্যে এই মহকুমার উল্লেখ, সামাজিক ইতিহাস, সংস্কৃতি চর্চা, ইতিহাসখ্যাত নারীপ্রতিভা, পাঠাগার, মিউজিয়াম, মঠ ও মিশন, বৌদ্ধ সম্প্রদায় এবং এই অঞ্চলের কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের পরিচিতি বিষয়ে ১০টি মননশীল আলোচনা আছে বিভিন্ন জনের। প্রসঙ্গত, প্রথম খণ্ডে এরকম ১৯ জন ব্যক্তিত্বর (১৯০০ সালের আগে জন্ম) পরিচিতি ছাপা হয়েছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'হালিশহর' অংশেও এরকম ১৩টি রচনা। বিশ্রুত হালিশহর পত্রিকা বা সাধক রামপ্রসাদ সেন

কিংবা এখানকার পুরাকীর্তি বিষয় হিসেবে উপস্থিত। তৃতীয় অধ্যায়ে ইছাপুর-নবাবগঞ্জ অঞ্চলের প্রাচীন সময়, নানা তথ্য ইত্যাদি পেশ করা হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে বারাকপুর বিষয়ে নানা তথ্য-পরিসংখ্যানের পাশাপাশি বেশ কিছু দুর্লভ ছবি এবং প্রথম খণ্ড সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার খবর-আলোচনাও সংযোজিত। সব মিলিয়ে বহু দুষ্প্রাপ্য বই, পুরনো দলিল, মানচিত্র ইত্যাদি ঘেঁটে বারাকপুর মহকুমার তিনটি প্রাচীন জনপদকে যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে হাজির করতে পেরেছেন সম্পাদক। এ কাজে তাঁকে নিবন্ধগুলির রচনাকাররা যে সহযোগিতা করেছেন, তাও উল্লেখযোগ্য। তথ্য সংকলনে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছেন সম্পাদক। যদিও এর পরেও এই সব অঞ্চল সম্পর্কে অনেক তথ্যই অজানা থেকে গেল বলে স্বীকার করে নেন তিনি। তবে এ বিষয়ে যে কোন গবেষণা কাজে তাঁর এই প্রয়াস বড় ভূমিকা নিতেই পারে। সেদিক থেকে গ্রন্থটি সত্যিই প্রয়োজনীয়।

বারাকপুর গান্ধী স্মারক সংগ্রালয়ে ১০ ডিসেম্বর বিকেলে 'নগর পেরিয়ে' পত্রিকার উদ্যোগে এক সাহিত্য সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সভায় 'বারাকপুরের সেকাল একাল' গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। বইটি উদ্বোধন করে তিনি বলেন, আঞ্চলিক ইতিহাস বিষয়ক এই গ্রন্থ দেশের ইতিহাসেরই সংক্ষিপ্ত রূপ। তিনি সংগঠক ও সম্পাদককে এই উপলক্ষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠান সভাপতি চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় সম্পাদকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, 'নগর পেরিয়ে' সংস্থা যেন আরও আঞ্চলিক ইতিহাস ছাপেন।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডে বারাকপুর মহকুমার সঙ্গে কাজী নজরুলের যোগ, সামাজিক ইতিহাস, নাট্যচর্চা পাঠাগার, মিউজিয়াম, মঠ ও মিশন, মহীয়সী নারী, বৌদ্ধ সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন বাঁধন সেনগুপ্ত, অলোক মৈত্র, কানাইপদ রায়, স্বপন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রসাদ রায়, প্রলয় ভট্টাচার্য প্রমুখ। হালিশহর সম্পর্কে গৌরীপদ গঙ্গোপাধ্যায়-এর দেওয়া তথ্য ও পরিসংখ্যান অনেক অজানা তথ্য জানায়। রামপ্রসাদ প্রসঙ্গে লিখেছেন শিখা দত্ত। ইছাপুর-নবাবগঞ্জের কথায় প্রলয় ভট্টাচার্য তথ্য ও কথকতা প্রসঙ্গ, তুহিন বিশ্বাস সঙ্গীতচর্চা, হিমাংশু দে ঝুলনমেলার ছবি অঙ্কন করেছেন। সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের আদি নিবাস ছিল হালিশহর—এমন সব তথ্য এই বইটি পড়লে পাওয়া যাবে। নানা ছবি ছেপে সম্পাদক বইটিকে আরও জীবন্ত করেছেন।

অনুষ্ঠানে জানা গেল বইটির তৃতীয় খণ্ডও প্রকাশিত হবে। পরবর্তী খণ্ড'র প্রত্যাশায় রইলাম।

তথ্যকেন্দ্র : *জুলাই ২০০১*

'নগর পেরিয়ে'-র উদ্যোগে প্রকাশিত 'উত্তর চব্বিশ পরগণার সেকাল একাল' বইটি প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন সমৃদ্ধ এই জেলার ইতিহাস সম্পর্কে পাঠক ও গবেষকদের কৌতুহল মেটাবে অনেকটাই। লেখক কানাইপদ রায় প্রভূত পরিশ্রম করে প্রথম খণ্ডটি প্রস্তুত করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের প্রেক্ষাপটে গবেষক লেখকের মননঋদ্ধ রচনায় সমৃদ্ধ। প্রাচীন জনপদ হিসাবে বর্তমান খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে চাণক, মণিরামপুর এবং টাকী। এই তিনটি জনপদকে ঘিরে তিনি যেসব সুলুক-সন্ধান দিয়েছেন তা গভীর অভিনিবেশ দাবি করে। তুলনায় প্রথম অধ্যায়ে উত্তর চব্বিশ পরগণার কথা বলতে গিয়ে তিনি সংক্ষেপে সেরেছেন। ... বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অনুল্লেখ পীড়াদায়ক। তবে এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি খুবই সামান্য। এ বই লেখকের উচ্ছ্বাসের বাষ্পে অস্পষ্ট নয়, বরং তথ্য বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারে ধরা আছে প্রাচীন জনপদটির উজ্জ্বল এক জীবনগাথা, মর্মবাণী।